মহাজাতি গঠন পথে

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

(স্বর্গীয় স্যর্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত
A Nation in Making গ্রন্থের অনুবাদ)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

এম, এ, এম, এল, পুরাণরত্ন, কর্ত্তৃক অনূদিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী,

এম, এ, বার-এট্-ল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

উইক্‌লি নোট্‌স্ প্রেস।

কলিকাতা।

উইক্লি নোটস্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৩নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে
শ্রীহরিদাস ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৯৪৪।

সূচী পত্র।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

উপক্রমণিকা।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি বহু পূর্ব্বেই বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত ছিল। এই মহাপুরুষের অমূল্য জীবনী কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিব যদি মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করিতেন তাহা হইলে পুস্তকখানির মর্য্যাদা রক্ষা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি লাভ হইত। আমি সাহিত্যিক নহি সাহিত্যামোদী মাত্র। সেইজন্য আমার রচনায় যথেষ্ট ক্রুটী আছে এবং আমার অনুবাদ মূল পুস্তকের সহিত সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। অনুবাদে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম, তথাপি এই গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম কেন এই প্রশ্ন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে বলিব যে বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে যখন আমরা উপযুক্ত নেতার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি তখন রাষ্ট্রগুরুর জীবনস্মৃতি পাঠ বাঙ্গালার অবসাদগ্রস্ত জীবনে নূতন অনুপ্রেরণা দিতে পারে বলিয়াই আমার ন্যায় অক্ষম লেখককে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ যে কত বড় রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ছিলেন তাহা আমার মনে হয় বাঙ্গালাদেশ এখনও সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যদি এই অনুবাদ পাঠে বাঙ্গালার তরুণেরা রাষ্ট্রগুরুর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধে সচেতন হইতে সচেষ্ট হন তাহা হইলেই আমি আমার শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব। এই অনুবাদ কার্য্যে শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্বারা ও আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য না করিলে আমি এই অনুবাদ সম্পন্ন করিতে পারিতাম না।

কাটোয়া সিভিল কোর্ট,
কাটোয়া
জেলা বর্দ্ধমান,
২৮-৯-৪৩।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়,
পুরাণরত্ন, এম্, এ, এম্, এল্,
আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট ও বর্ত্তমানে
বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস
(বিচার বিভাগ)।

মহাজাতি গঠনপথে—

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ভারতে একটী নবযুগের উদ্বোধন করেন। তাঁর পূর্ব্বে দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেহই এক মহাজাতিতে পরিণত করবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন নি। সে চেষ্টায় তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেকটা সাফল্য লাভ করেছিলেন যদিও পরে তার যে অন্তরায় ঘটে তার জন্য তিনি দায়ী নন। তথাপি তিনি ইহাতে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন নি। বরং বল্‌তেন যে সব মহাজাতির ইতিহাসে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটে। জাতি গঠনের যে কার্য্যধারা তিনি আরম্ভ করেছিলেন তাঁর বিশ্বাস ছিল পরিণামে তাহা সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও মহাজাতি গঠন পথে তাঁর জীবন একটি দৈব বিধান বলে বোধ হয়। বাল্যকাল হ'তেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী, উদ্যমশীল, সুস্থ, সবল, সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর আত্মীয়, স্বজন, শিক্ষক ও বিশেষতঃ তাঁর স্বনামধন্য পিতৃদেব তাঁর এই মধ্যম পুত্রের যে একটী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে তা' বুঝতে পেরেছিলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রোগ নির্ণয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা ও চিকিৎসাসাফল্য সম্বন্ধে গল্প বাংলাদেশের ঘরে ঘরে রূপকথার মত প্রচলিত আছে। তিনি তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর এই পুত্রের একটি গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, তবে তা যে কি তিনি ধারণা করতে পারেন নি। তখন ভারতবর্ষের সব উচ্চপদই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের আয়ত্তাধীন ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত গিয়ে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হ'য়ে

দেশে ফেরেন ও বোম্বাই অঞ্চলে জেলা জজের পদ অধিকার করেন। সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজ শিক্ষকের অনুরোধে তাঁর পিতা তাঁকে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাতে পাঠান। তিনি ভেবেছিলেন যে কালে সুরেন্দ্রনাথ হয়ত খ্যাতনামা জজ্ কি কমিশনার হবেন। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। তিনি সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য্য হলেও যে কারণে তাঁহার নাম কৃতবিদ্য ছাত্রদিগের তালিকা থেকে অপসৃত হয় তা তাঁহার জীবনকাহিনীতে বর্ণিত আছে। তবে সে সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র লক্ষ্য করবার বিষয় যে ২১ বৎসর বয়সে সুদূর বিদেশে ভারতের রাজসচিব ও তাঁর সদস্যদের যে ভাবে তিনি এই দ্বন্দে পরাস্ত করেছিলেন সেটা এদেশের কেন, বিলাতের যুবকদের পক্ষেও অসাধ্য সাধন। এমন কি তাঁর প্রবীণ শিক্ষক হেনরি মরলিও (Prof Henry Morley) বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি একটী অসাধারণ যুবক ও ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় তাঁকে তখন বলেন যে এই যুদ্ধে জয় লাভের জন্য তোমার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত। সুরেন্দ্রনাথ জীবনের কোন অবস্থায় কখনও রণে ভঙ্গ দেন নি। এই কারণে এক সময় সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব পদ লাভ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। এবং পরাজিত হলেও তিনি কখনও ভগ্নোৎসাহ হতেন না, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন তার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষদের পরাস্ত করে কাজ নিয়ে দেশে ফিরলেন বটে কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের তিনি মন যোগাতে পারলেন না। তিনি ও তাঁর সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন ও ইংরাজদের সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে চল্‌তেন। ভারতবাসী বলে সামাজিক কোন বিষয় তারতম্য হ'লে নিজেদের মান বজায় রেখে চলতেন। ইহা ব্যতীত সুরেন্দ্রনাথ কাজে যোগ দেবার অল্পদিন মধ্যে বিভাগীয় পরীক্ষায় যশের সহিত কৃতকার্য্য হ'য়ে বেতন ও ক্ষমতা বৃদ্ধির অধিকার পেলেন। তাঁর ঊর্দ্ধতম ইংরাজ হাকিম পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হলেন। এতেও ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধি

পেল। এসব কারণে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সুরেন্দ্রনাথের উপর এত কাজের চাপ দিলেন যে তাঁর পক্ষে সব সময়মত সম্পন্ন করা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। সকলেই জানেন যে হাকিমদের পেসকারেরা মামলা মুলতুবি করতে হ'লে 'আসামী ফেরার' ঐরূপ কোন অছিলা করে দিন ফেলে দেন। এইরূপ কারণে একটি মামলার হুকুমের যে গলদ হয় তাহা সুরেন্দ্রনাথ পরে সংশোধন করেন। কিন্তু এইরূপ একটি সামান্য ত্রুটির দরুণ ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিযোগে একটি কমিশন বসিয়ে তাঁকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। পরে সুরেন্দ্রনাথ নিজগুণে যখন জননায়ক স্বরূপে সাধারণের নিকট অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন তখন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলেন যে সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত করা অত্যন্ত ভুল হয়েছিল। এমন কি, হাইকোর্টের জজ ও উক্ত কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিন্সেপ্ সাহেব ঐরূপ ক্ষোভপ্রকাশ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এইরূপ অযথা কর্ম্মচ্যুতির জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তবে এই ঘটনার অবিচার ও কলঙ্কের প্রতীকারের জন্য বিলাত গিয়ে ভারত সচিবের নিকট পর্য্যন্ত কোন সুবিচার পান নাই। তাঁর ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরবারও অভিপ্রায় ছিল। বিলাতে সুবিচার ত পেলেনই না, উপরন্তু ইনস্ অব্ কোর্ট (Inns of Court) যে টারম্ (Term) রেখেছিলেন ও ব্যারিষ্টার হবার যে তাঁর অধিকার ছিল তাতেও কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা বঞ্চিত হলেন। এতেও তিনি দমলেন না। তিনি দেশ সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন, পূর্ব্ব হতেই অন্তরে এ সঙ্কল্প পোষণ করছিলেন। ভারত সচিবের নিকট কর্ম্ম্যচুতি সম্বন্ধে আপিল করতে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করেন নি। তিনি যে ক' মাস বিলেত ছিলেন সে সময়টা সে দেশের ও ইউরোপের শাসন প্রণালীর ইতিহাস ও রাজনৈতিক জীবনের উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করেন। অবিচারের প্রতীকারে বিফল হ'য়ে তিনি দেশে ফিরলে একমাত্র তাঁর সহধর্ম্মিণী তাঁরই ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত

হন নি কিন্তু তাঁর অন্যান্য বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এমন কি দেশের গন্য মান্য সকলেই তাঁকে বলেন যে এ দেশে তাঁর আর ভবিষ্যৎ কিছু নেই। একটি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁকে উপদেশ দেন যে তিনি এ দেশ ত্যাগ করে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া গিয়ে যদি অন্য নামে কর্ম্মের চেষ্টা করেন তাহা হ'লে কোনরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব হ'তে পারে। এক সময় সিভিল সার্ভিস পাশ করে যখন তিনি দেশে ফেরেন তখন যাঁরা তাঁকে সমারোহ করে অভ্যর্থনা করেন তাঁরাই ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তাঁর উপর বিরূপ হয়েছেন বলে তাঁর সংসর্গে আসতে শঙ্কিত হ'তে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ দেশের লোকের এইরূপ মনোভাব দেখে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন যে দেশের লোকের এই দাসোচিত মনোভাব দূর করতে হবে। সরকারী কাজ হ'তে বরখাস্ত হ'য়ে ও আইন ব্যবসার পথ রোধ হবার পরও তাঁর মনে নৈরাশ্যের ভাব স্থান পায় নি। বরং তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাধীনতার অপার আনন্দ তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তিনি যখন বিলেত ছিলেন তখন ম্যাটসিনির (Mazzine) স্বদেশের পরাধীনতা মোচন প্রচার তাঁকে বিমুগ্ধ করে। তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করতেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার বেদীতে কিরূপে উন্নীত করা যেতে পারে। তিনি চিন্তা করে স্থির করেছিলেন যে ভারতে নানাজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সংবর্দ্ধন করাই তার প্রধান সোপান। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনেছি যে তিনি যখন সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে দেখা করতে যেতেন তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বলতেন, আমি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখি যে আসাম থেকে করাচি পর্য্যন্ত ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও খৃষ্টান সমগ্র ভারতবাসী একদিন এক মহাজাতিতে পরিণত হবে এবং আমি এই মহাসাধনায় জীবন উৎসর্গ করব বলে যেন অন্য কর্ম্মক্ষেত্র আমার পক্ষে রুদ্ধ হয়েছে। তিনি এই আদর্শ নিয়ে দেশ-সেবায় জীবন আরম্ভ করেন। তাঁর অর্থ উপার্জ্জনের তাদৃশ আকাঙ্খা ছিল না। যখন দেশের সব গণ্য মান্য ব্যক্তি মনে করেছিলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ

অন্ধকার, তখন তাঁর পিতার পরম বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর কলেজে ইংরাজি অধ্যাপকের পদে তাঁকে নিযুক্ত করেন। তিনি দু'শত টাকা মাত্র বেতন পেতেন, তাতেই তাঁর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হত। একটি রাজ দরবার হতে অধিক বেতনের পদ পাবার প্রস্তাব পেয়েও তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তাঁর সমস্ত অবসর সময় দেশ সেবার কার্য্যে উৎসর্গ করেন ও জনসাধারণের বিশেষতঃ যুবকমণ্ডলীর মনে দেশ সেবা ও স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপন করবার জন্য সভা সমিতি আহ্বান ক'রে কি উপায়ে পৃথিবীর অন্যান্য মহাজাতি স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে সে বিষয় বক্তৃতা দিতেন। ম্যাটসিনি (Mazzine) ইটালিয়ান-দের মধ্যে একতা সাধন করে মাতৃভূমির দাসত্ব দূর করেন—সে বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আদর্শ নিয়েই তিনি জীবনের কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সম্বর্দ্ধন করা বিশেষ আবশ্যক। তিনি যুবক সম্প্রদায় ও জনসাধারণের নিকট এই বাণী আজীবন প্রচার করে এসেছিলেন।

যখন ভারতীয় যুবক যাতে সিভিলসার্ভিসে সহজে প্রবেশ করতে না পারে এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষা দেবার বয়স কমান হয় তখন তার প্রতিবাদ উপলক্ষ ক'রে, বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশ ও সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক বিষয়ে একতা ও সঙ্ঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সফরে বহির্গত হন্ তখন তিনি আলিগড় গিয়ে তদানীন্তন মুসলমান সম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা স্যার সৈয়দ আহম্মদের সহিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের সহযোগিতা পাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন ও এ বিষয়ে তাঁর সহানুভূতি পান। তিনি তদবধি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁদের বুঝিয়ে সরকারের বাধাদান সত্ত্বেও অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত মুসলমান ভদ্র সন্তানের সহানুভূতি পান। ঐ আন্দোলনে

তাঁরা বিশেষ সহায়তা, সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতা করেন। লক্ষ্ণৌ চুক্তি পত্রের (Lucknow Pact) দ্বারাও তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের বিশেষ চেষ্টা করেন।

ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষতঃ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন এবং সেই মৈত্রীর ভিত্তিতে এক স্বাধীন মহা-ভারতের সৌধ নির্ম্মান ছিল তাঁর জীবনের পরম ব্রত। তিনি মনে করতেন, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভারতের শক্তি-সঞ্চয়ের পথে প্রধান অন্তরায় এবং দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। তিনি যে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সেই অপবিধান রহিত করবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে সমগ্র দেশকে ক্ষুব্ধ, সচকিত এবং আত্মরক্ষার কঠিন সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক'রে তোলেন, তার অন্যতম কারণ এই যে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে লর্ড কার্জ্জন সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করবার জন্যই দেশে ভেদ-নীতির প্রবর্ত্তন করচেন। তাই তাঁর নিজের জীবনের স্বপ্ন ও দেশের বৃহত্তর ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট হ'য়ে যাচ্চে সেই অপব্যবস্থাকে যে ভাবেই হোক্, প্রতিরোধ করতে হবে, এই হ'ল তার কঠোর পণ। বঙ্গবিভাগ চরম সিদ্ধান্ত (Settled fact) ও কখনই পরিবর্ত্তিত হতে পারে না, রাজপুরুষেরা এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলাতেও তিনি তাদের উক্তি অগ্রাহ্য করে তা রদ করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হলেন। ফল কি হয়েছিল তা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কীর্ত্তিত আছে। রাজপুরুষদের বাধা বিপত্তি ও অত্যাচার উপেক্ষা ক"রে জনসাধারণকে বিশেষতঃ যুবকবৃন্দকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে তাদের সহায়তায় দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্ত্তন ক'রে রাষ্ট্রগুরু রাজপুরুষদের স্থির সিদ্ধান্ত ত্যাগ করাতে বাধ্য করেন।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে কেবল বঙ্গীয় যুবক ও জনসাধারণ নবজীবন প্রাপ্ত হয়েছিল তা নয়, ভারতবাসী মাত্রেই প্রবুদ্ধ ও জাগ্রত হয়েছিল। গোখ্‌লে তখন তাই বলেছিলেন যে "বাঙ্গালা আজ যা চিন্তা করে, কাল তাই হয় সমগ্র ভারতের

ধ্যান।" মহাজাতি গঠন পথে রাষ্ট্রগুরুর অক্লান্ত পরিশ্রম এ ভাবেই তখন অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেছিল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে তাঁর মহাজাতি গঠনের পথে বিশেষ অন্তরায় ঘটে। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেসন্ সম্বন্ধে স্বরাজ বিধান যখন বিধিবদ্ধ করেন তখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা যাতে পরিহার করা হয় তার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তা পরে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অতি দুঃখের বিষয় যে মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না যিনি কংগ্রেসে রাষ্ট্রগুরুর সহকর্ম্মী ছিলেন তিনি পাকিস্থান প্রস্তাব সমর্থন করাতে রাষ্ট্রগুরুর মহাজাতি গঠনের পথে একটি গুরুতর বাধা সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পরম হিতৈষী রাষ্ট্রগুরু আজ জীবিত থাকলে জিন্না সাহেব ও তাঁর অনুচরবর্গকেও বুঝাতে চেষ্টা করতেন, যে এতে ভারতবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন উন্নতি সাধন হবে না, পক্ষান্তরে ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতা লাভ অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে উঠবে। তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর জীবন-স্মৃতির বঙ্গানুবাদ এই আশায় প্রকাশ করছি যে ভারতের এই নিরপেক্ষ নেতার সমস্ত ভারতবাসীকে একটি স্বাধীন মহাজাতিতে পরিণত করবার আদর্শ সমগ্র ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর সেটা নিরপেক্ষভাবে আমাদের বাঙ্গলার মুসলমান ভ্রাতারা বিচার করে দেখুন্। পাকিস্থান প্রস্তাবে তাঁরা ভারতবর্ষকে যেভাবে খণ্ড খণ্ড করতে চাচ্ছেন তাতে লর্ড কর্জ্জন বাংলা দেশকে বিভক্ত ক'রে যে অনিষ্ট সাধন করতে চেয়েছিলেন সে অনিষ্ট যে ভারতব্যাপী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রগুরুর জীবন-স্মৃতি তাঁর কর্ম্মবহুল শেষ বয়সে লেখা। যাতে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থ শেষ করতে পারেন সে জন্য যত সংক্ষেপে পারেন জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আমি বঙ্গ ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর সহকর্ম্মী ছিলাম সুতরাং এই

জীবন-স্মৃতি প্রকাশ করবার সম্পাদকীয় ভার আমি গ্রহণ করি। আমি এই পুস্তকের বঙ্গ ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছি তা হ'তে পাঠকগণ তার সার্থকতা কতকটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

পার্টিশান যখন বহাল রাখতে রাজপুরুষেরা কৃতসঙ্কল্প হন ও রদ হতে পারেনা ব'লে সজোরে ঘোষণা করেন তখন রাষ্ট্রগুরু রণে ভঙ্গ দিবেন না অনুরূপ জোরের সহিত ঘোষণা করেন। তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য স্বাদেশিকতার মহান অস্ত্র ব্যবহার করেন। আমাদের ন্যায় নিরস্ত্র জাতির অন্য অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভবপর ছিল না। স্বদেশী আন্দোলন যে আইন বিরুদ্ধ ইহাও কেহ বলতে পারতেন না। কারণ তার মূল মন্ত্র "ঘরের খাব ঘরের পরব" কখনও বে-আইনী হতে পারে না। স্বদেশী গ্রহণ বললেই বিদেশী বর্জ্জন বোঝায়। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিলাতি জিনিসের কাটতি অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। এদেশে ও বিলাতে রাজপুরুষদের তাতে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল। দমন নীতির দ্বারায় দেশব্যাপী অশান্তি হ্রাস না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিপ্লবপন্থী দলের অভ্যুদয় হয়েছিল। শান্তি স্থাপনের আশায় অবশেষে বঙ্গ ভঙ্গের Settled fact (চরম সিদ্ধান্ত) সম্রাটের ঘোষণার দ্বারায় Unsettle (রদ) করতে হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তা ছিল ভারতবাসী সব সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান কল্যাণকর। হিন্দু, মুসলমান ইহাতে সমান ভাবে উপকৃত হয়েছিল। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বীকার করা হয়েছিল যে পাবনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে জোলারা (মুসলমান তন্তুবায়) যাদের চালে খড় ছিল না তারা করগেট লোহার চাদরের চাল দিয়ে গৃহ নির্ম্মান করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনে জনসাধারণের বহুবিধ উপকার হয়েছিল। রাষ্ট্রগুরু স্বদেশীকে Nationalism এর নামান্তর মাত্র ব'লে জ্ঞান করতেন ও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সেই কল্পনা ও কর্ম্মপন্থা বজায়

থেকে দেশ ব্যাপী হয়ে ভারতের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সাধন করবে। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হবার পর স্বদেশী আন্দোলন শিথিল হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতেন। তবে তিনি আশা করতেন যে বর্ত্তমান অশান্তির উপশম হলে স্বদেশী ভাব আবার দেশের লোকের মনে বলবৎ হবে ও দেশের একতা সংবর্দ্ধন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে।

বাঙ্গালার বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারত সচিব ভারতবাসীকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে ঘোষণা করেন। এই কারণে রাষ্ট্রগুরুর জীবনের কার্য্যের মধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সুতরাং এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রগুরুর জীবন স্মৃতিকে কতক পরিমাণে আমার সম্পাদকীয় মন্তব্যে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছি।

আংশিক ভারত শাসন সংস্কার অসন্তোষজনক হলেও রাষ্ট্রগুরু যে তার বিধান অনুযায়ী মন্ত্রিত্ব পদ কেন গ্রহণ করেছিলেন তা বোঝা কঠিন নয়। তিনি দায়িত্ব-মূলক স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেন। যখন তাঁরই আন্দোলনের ফলে তা কিয়ৎ মাত্রায় দেওয়া হল তখন তিনি যদি তাহা অগ্রাহ্য বলে ত্যাগ করেন তা হলে পূর্ণ দায়িত্ব মূলক শাসন প্রণালী পাওয়াতে আরও বিলম্ব হতে পারে ব'লে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। তিনি ও বালগঙ্গাধর তিলক বলতেন স্বায়ত্ত্ব শাসন সম্বন্ধে যতটা অধিকার পাওয়া যায় তাহা ত্যাগ না ক'রে, গ্রহণ ক'রে তার দ্বারায় এমন ভাবে জনমতের চাপ দিতে থাকবেন যে শাসন কর্ত্তারা স্বায়ত্ত্ব শাসনের পরিধি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবেন। তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির শাসন ব্যবস্থা যাহা ছোট লাট ম্যাকেনজি কর্ত্তৃক সরকার বাহাদুরের করকবলে আনা হয়েছিল তা রাষ্ট্রগুরু পরিবর্ত্তন ক'রে কলিকাতা মহানগরীতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যখন এই সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ও বহুল বিধানগুলি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কাগজ পত্র না দেখে তার সংস্কৃত ধারা গুলি স্মৃতি শক্তির সহায়তায় ব্যাখ্যা করেন তখন শ্রোতৃবর্গ স্তম্ভিত হন। শেষ বয়সে তাঁর দুইচক্ষে দৃষ্টি হ্রাস হওয়ায়

অতিকষ্টে ছাপার অক্ষর পড়তে পারতেন। পাঠ করবার কষ্ট লাঘব করবার জন্য অন্যকে পাঠ করতে বলতেন। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। যা কাণে প্রবেশ করত তা তাঁর মস্তিস্কে চিরস্থায়ী হয়ে থাকত। তিনি এই ক্ষমতার বলে কংগ্রেসের সভাপতি স্বরূপে, অথবা ব্যবস্থাপক সভায় যখন বক্তৃতা করতেন তখন কোনরূপ কাগজ পত্র দেখতেন না তবু তাঁর কোনরূপ ছন্দ পতন অথবা অর্থভ্রংশ হত না। সভা সমিতি, কংগ্রেস বা ব্যবস্থাপক সভায় শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। তিনি যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রিত্ব করেন তখন স্যর জন কার ও বাঙ্গলার অর্থসচিব মার সাহেব প্রভৃতি শাসন বিভাগের মেম্বারেরা বলতেন যে ইনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের সমকক্ষ লোক।

রাষ্ট্রগুরু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রে দেশের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট সাধন করেন নি। এই প্রসঙ্গে সাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানের পদে তিনিই প্রথমে এদেশের যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করে নিযুক্ত করেন। এই পদ পেতে ইতিপূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেম্বার ব্যতীত কেহই অধিকারী ছিলেন না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে নির্ব্বাচন করার সময় সিভিল সার্ভিসের মেম্বরেরা, বাঙ্গলার গভর্ণরের দ্বারায় এবং পরে ভারত গবর্ণমেণ্টের দ্বারায় মল্লিক মহাশয়ের পরিবর্ত্তে একজন সিভিল সার্ভিসের মেম্বারকে দেবার জন্য রাষ্ট্রগুরুর উপর বিশেষ চাপ দেন এবং তাঁরা বলেন সিভিল সার্ভিসের মেম্বার ব্যতীত আর কাউকে এ পদ দেওয়া যেতে পারে না। তার উত্তরে রাষ্ট্রগুরু বলেন যে স্বায়ত্ব শাসনবিভাগে তাঁর মন্তব্য বলবৎ থাকবে ; ইহার কোনরূপ অন্যথা হলে তিনি মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করবেন। সুতরাং তাঁর নির্ব্বাচন অগ্রাহ্য করতে বাঙ্গালা বা ভারতগভর্ণমেণ্ট সাহস করলেন না ও তাঁর মন্তব্যই বলবৎ রইল। তিনি এইরূপে স্বাধীনভাবে স্বায়ত্ব শাসন বিভাগে দেশের অনেক কল্যাণকর কার্য্য করেন ও স্বায়ত্ব শাসন

বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী বা গভর্ণর পর্য্যন্ত তাঁর মত বা মন্তব্য অগ্রাহ্য করতে সাহস করতেন না।

রাষ্ট্রগুরু অসহযোগিতার বিরোধী ছিলেন না। মেকেঞ্জি বিধান (Mackenzie Act) দ্বারা যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের উপর সরকারী প্রভুত্ব স্থাপন করা হয় তখন তিনি ও তাঁর নেতৃত্বে ২৭ জন কমিশনার-পদ ত্যাগ করেন ও বহুবৎসরের পর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে সেই মেকেঞ্জি বিধান রহিত ক'রে কলিকাতা কর্পোরেশনকে স্বরাজ প্রদান করেন।

তিনি অহিংস অসহযোগিতারও জন্মদাতা। বরিশালে তিনি এইরূপ অসহযোগিতা যে ভাবে প্রবর্ত্তন ও সাফল্যের সহিত পরিচালনা করেন তাহা এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বর্ণিত আছে। তবে কেবল যে অসহযোগিতার দ্বারা ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে তা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

মন্ত্রিত্বগ্রহণ করা সত্বেও তিনি ভারত পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার পাবার উপযুক্ত এই মত পোষণ করতেন। ভারত সচিব মণ্টেগু সাহেব তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন যে পূর্ণ স্বরাজ ব্যতীত অন্য কিছু এই প্রবীণ নেতা গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। ক্যানেডা ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় স্বায়ত্ব শাসন যাতে ভারত পেতে পারে তিনি সেই পথ আজীবন অনুসরণ করেন। স্বরাজ দল ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর পুনঃ নির্ব্বাচনের সময় তাকে পরাস্ত করেন। স্বরাজ দলের সহিত তাঁরা মৌলিক মতভেদ ছিল তা বলা যেতে পারে না। কারণ স্বরাজ দলের নেতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গিয়েছেন যে ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় স্বায়ত্ব শাসন পাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর। নির্ব্বাচনের দ্বন্দের সময় নিন্দাবাদ ও অখ্যাতি রটনা ধর্ত্তব্য নয়। স্বরাজদলের সহিত রাষ্ট্রগুরুর আদর্শের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। দাস মহাশয়ের নাতিদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অবসান-

কালে ও মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে রাষ্ট্রগুরু যে পথ অনুসরণ করেছিলেন সেই পথই যে প্রশস্ত তা স্বীকার করে যান। এমন কি তিনি বলেন যে ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় স্বায়ত্তশাসন পাওয়া পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রগুরুর মতে ঐরূপ স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য নাম মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এই সম্বন্ধ দু'টী স্বাধীন দেশের মধ্যে মিত্রতার সম্বন্ধের ন্যায়।

রাষ্ট্রগুরুর সহিত গান্ধিজীর অনেক বিষয় মতভেদ থাকা সত্বেও তিনি ভারতে এই নবযুগের জন্মদাতা বলে তাঁকে মহাত্মা বিশেষ সম্মান করতেন। রাষ্ট্রগুরুর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে যখন মহাত্মা তাঁর ব্যারাকপুরের বাটীতে দেখা করতে যান তখন রাষ্ট্রগুরুর জীবন স্মৃতির স্বহস্তে লিখিত পুস্তিকাগুলি পেলে তাঁর আশ্রমে সযত্নে রাখবার ব্যাবস্থা করবেন বলেছিলেন। রাষ্ট্রগুরু বলেন যে, সেগুলি তিনি "রিপণ কলেজের" পুস্তকাগারে দান করেছেন ও সেখানে সেগুলি রক্ষিত হবে।

রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ যে বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে Nationalismএর জন্মদাতা, ভারতবাসীকে ধর্ম্মজাতিনির্ব্বিশেষে এক মহাজাতিতে পরিণত করবার অগ্রণী বলে তিনি যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং তাঁর জীবন-স্মৃতি যে বর্ত্তমান ভারতের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে পরিগণিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার দুর্ব্বল শরীরে ও এই অধিক বয়সে যে সম্পাদকীয় ভার লয়েছিলাম তা সম্যকরূপে সমাধা করতে পারলাম না সে জন্য পাঠকগণ আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন। গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করবার অনুমতি যখন পাই তখন আমার বয়স প্রায় অশীতি বৎসর। সে অবস্থায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এল্ মহাশয়ের সহযোগিতা লাভ করাতেই সম্পাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে সাহসী হই। পরে আমার শরীর আরও অপটু হ'য়ে পড়ে এবং অমরেন্দ্র বাবুও মুন্সেফী পদ পেয়ে কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়াতে শেষ কটি অধ্যায়ের অনুবাদ সংক্ষেপে

সমাধা করেন। রাষ্ট্রগুরুর দীর্ঘ কর্ম্মবহুল দেশ ও জনহিতকর জীবনের সম্যক চিত্র দিতে পারলাম না বলে অন্তরে অত্যন্ত আক্ষেপ রয়ে গেল।

৬ই আগষ্ট ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরুর উদ্যান প্রান্তে ভাগীরথী তীরে তাঁর সৎকার সমাধা করে কলিকাতা ফিরতে রাত্র দ্বিপ্রহর অতীত হ'ল। তার পর ২০ বৎসর পূর্ব্বের ৭ই আগষ্ট স্বদেশী বয়কট ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ সংক্রান্ত অপূর্ব্ব জাতীয় জাগরণের স্মৃতি অন্তরে জেগে উঠে নিদ্রা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। তখন ঐ গভীর নিশীথে কলম কাগজ নিয়ে বসে অনির্ব্বচনীয় একটি প্রেরণায় রাষ্ট্রগুরুর দীর্ঘজীবনের যে একটি ক্ষুদ্র চিত্র দিতে সক্ষম হয়েছিলাম তা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে দিলাম। তাঁর প্রস্তর মূর্ত্তি উদ্‌ঘাটনের সময় তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যা বলেছিলেন তাও পরিশিষ্টে দিলাম।

রাষ্ট্রগুরু মাঞ্চেষ্টার টাউন হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় বৈঠকে নিমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করেন ও সে সম্বন্ধে সেই হলের তত্ত্বাবধায়ক বলেন যে ওরূপ বক্তৃতা ঐ হলের প্রতিষ্ঠান হওয়া অবধি কেউ কখন শোনে নি। সেটিও পরিশিষ্টে দিলাম। কারণ রাষ্ট্রগুরু Nation in Makingএ সেটি মুদ্রিত করেছেন ব'লে লিখে গিয়েছেন কিন্তু মুদ্রিত হয় নি। ঐ প্রেস কন্‌ফারেন্সে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার সম্পাদকরা তাঁকে বলেন যে আপনার ন্যায় যদি ১০০ লোক ভারতে থাকে তাহা হলে পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসন ভারতকে অবিলম্বে দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রগুরু তদুত্তরে বলেন যে আমার ন্যায় শত শত লোক ভারতে আছে। রাষ্ট্রগুরু কখনও নিজের বড়াই করতেন না। খ্যাতি অর্জ্জন করবার জন্য বিদেশে যেতেন না। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েও তিনি যান নি। তিনি বাড়ী ফিরে এসেছিলেন ও সর্ব্বদা বলতেন দেশের বাড়ীর মত স্থান জগতে নেই।

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদকের অনুরোধে ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের ন্যাশান্যাল জুবিলি বৎসরে রাষ্ট্রগুরু যে কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সে সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখি, গেজেটের জুবিলি সংখ্যা প্রকাশ না হওয়ায় সেটি প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং সেটি আমি এই পুস্তকের পরিশিষ্টে দিলাম। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক সম্বন্ধে তাঁহার জীবন স্মৃতিতে একটি প্রবন্ধ লিখি সেটিও পরিশিষ্টে দিলাম। তাতে একই কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যে আদর্শের পার্থক্য ছিল তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি।

রাষ্ট্রগুরু নিজের জীবন কথা লিখতে গিয়ে গ্রন্থের নামকরণ করেছেন **'A Nation in Making'**। আমরা যারা তাঁর শিষ্য, সহকর্ম্মী অথবা সহচর ছিলাম এবং দেখেছিলাম কিভাবে তাঁর জীবনব্যাপী প্রয়াসের মধ্য দিয়ে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতের এক অখণ্ড রূপ ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করল, তাদের কাছে এ নামের সার্থকতা সুস্পষ্ট। কিন্তু যাদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের ব্যবধান অনেক, যারা তাঁকে দেখেন নি অথবা দেখেচেন তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে—ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিবেশের পটভূমিকায়—তাঁদের কাছে এই নামের একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হ'তে পারে। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আজ যে ভারতে সকল ভাষা ভাষী, সকল ধর্ম্মাবলম্বী, সকল জাতির সমন্বয়ে সংগঠিত এক মহাজাতির অন্ততঃ ছায়ামূর্ত্তি তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, তার স্রষ্টা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন তাঁর কর্ম্মজীবনের আরম্ভ, তখন শাসনকর্ত্তাদের চক্ষে ভারতসাম্রাজ্য ব'লে একটা বস্তু ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয়দের উপলব্ধির মধ্যে সমগ্র ভারত ব'লে কোন সত্তার অস্তিত্ব ছিলনা। ভারত ছিল নানা প্রদেশ, নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি এবং নানা ভাষায় বহুধা বিভক্ত। এই সকল ব্যবধান অতিক্রম অথবা অপসরণ ক'রে সমগ্র ভারতবাসীকে এক মহাজাতিতে পরিণত করবার মহাস্বপ্ন সুরেন্দ্রনাথই প্রথম দেখেন এবং তার পর তিনি তার সুদীর্ঘ জীবন এবং

অনুপম কর্ম্মশক্তি সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার কঠিন প্রয়াসে প্রযুক্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনের কর্ম্মশালা হয়েছিল ভারতের ঐক্য ও মুক্তিসাধনার যজ্ঞশালা। এই মহাদেশের সেই প্রথম জাগরণ যারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন অথবা যারা সে সময়কার ইতিহাসের সহিত পরিচিত, তারা জানেন যে অকস্মাৎ এই বিরাট পুরুষ রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হ'য়ে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের একজাতিত্বের বাণী ঘোষণা করলেন, জগতের জাতিসমাজে এক মহাজাতিরূপে নিজের প্রকৃত আসন অধিকার করবার জন্য তাঁর আহ্বান শুনে ভারত এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি আরো শোনালেন যে নিজের শাসনব্যবস্থা নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার সকল জাতির মত ভারতেরও বিধিদত্ত অধিকার—সকল বাধা বিপত্তি দুঃখ দুর্য্যোগ অতিক্রম ক'রে সেই পরম অধিকার তাকে অর্জ্জন করতেই হবে। তাঁর কাছ থেকে এই উভয়মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে ভারতের জাতীয় মন যেন রাজনীতির ঊর্দ্ধলোকে একটা নূতন লক্ষ্যের সন্ধান পেল। তার সকল কর্ম্মচেষ্টায় সঞ্চারিত হ'ল এক নূতন আত্মশক্তিবোধের উদ্দীপনা এবং সংহতির প্রয়াস। তার পর যে মন্ত্র তিনি ভারতকে দান করেছিলেন, স্বয়ং সে মন্ত্রের সাধনই হ'ল সুরেন্দ্রনাথের তপস্যা, দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল অনন্যকর্ম্মা এবং অনন্যলক্ষ্য হ'য়ে তিনি একদিকে ভারতীয়দের মধ্যে সংহতিবৃদ্ধির চেষ্টায় এবং অন্যদিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য সংগ্রামে নিজে ক ব্যাপৃত রাখলেন। তাঁর প্রেরণায় এবং তাঁর নেতৃত্বে এই উভয় লক্ষ্য অনুসরণ করার মধ্যে দিয়েই ভারতের জাতীয় জীবন ক্রমশঃ এক অপূর্ব্ব নবকলেবর লাভ করল। তাঁর জীবন সংগ্রাম তাই ভারতের জাতীয় সংগ্রাম, তাঁর জীবন কথা ভারতের মহাজাতিত্ব লাভের প্রয়াসের ইতিকথা।

পরিণত বয়সে এই গ্রন্থরচনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রগুরু যখন তাঁর বিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন—তখন তিনি এই মানদণ্ড দিয়েই তাঁর পার্থিব জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল

যে যদি তাঁর জীবনে নিজেও স্মরণ করবার মত কোন ঘটনা থাকে, তা কেবল- মাত্র সেই সব ঘটনা যার সঙ্গে ভারতের মহাজাতিত্ব অথবা রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা লাভের প্রয়াস জড়িত; নিজের পারিবারিক অথবা সাংসারিক জীবনের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কোন ঘটনা তাঁর মনে স্থান পায় নি এবং গ্রন্থেও তার বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যাবে না। এই গ্রন্থে যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, গ্রন্থকে মানুষ সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ইতিহাস ধরলে তার মধ্যে পারম্পর্য্যের অভাব লক্ষিত হবে, অনেক স্থানে সম্পূর্ণতার অভাব চোখে পড়বে এবং গ্রন্থপাঠের শেষে হয়ত মনে জাগবে একটা অতৃপ্তি। কিন্তু কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সুরেন্দ্রনাথ নিজের জীবনকে দেখতে বসেছিলেন এবং কোন অর্থবাচক ঘটনাগুলি তিনি মনোনীত করেছিলেন, তা মনে রেখে পড়লে বর্ণিত বিবিধ ঘটনার মধ্যকার গভীর সঙ্গতি এবং তাদের ক্রমবিকাশের ধারা পরিস্ফুট হবে। এই গ্রন্থের প্রত্যেক ঘটনাই বাহ্যতঃ সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা হ'লেও তার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে সেটা ভারতের মহাজাতিত্ব কিংবা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের প্রচেষ্টার অথবা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞাপনের একটা অধ্যায়—যে সূত্র এই সব ঘটনাকে পরস্পর গ্রথিত করেচে তা ভারতের জাতীয় সিদ্ধিলাভের জন্য অশ্রান্ত এবং বর্দ্ধমান প্রয়াস। আমার পরিণত বয়সে এবং অপটু শরীরে সেই ঘটনা-পরম্পরার নিগূঢ় অর্থ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখাই, এমন ক্ষমতা আজ আর নেই। পাঠক সমসাময়িক ইতিহাস এবং সুরেন্দ্রনাথের জীবনের সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে এই গ্রন্থ পড়লে নিজেই তা বুঝতে পারবেন। আমি কেবল সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মত গ্রন্থে বর্ণিত রাষ্ট্রগুরুর বিচিত্র জীবনের বিবিধ ঘটনার মূল যোগসূত্রটি দেখিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম।

ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্যকাল ও কৈশোর।

সে আজ বহুদিনের কথা যে দিন রাজা বল্লালসেন বাঙ্গালা দেশে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। সেই সুদূর অতীত হইতে আজ পর্য্যন্ত স্বীয় পবিত্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দ্বারা যে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশ অর্থলোভ ও সহজ জীবন যাত্রার প্রলোভন এড়াইয়া আপন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন সেই বংশে আমার জন্ম। এই প্রাচীন বংশ সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার যে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ স্থাপন করেন তাহা অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না।

আমার পিতামহ প্রাচীন পদ্ধতির অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নিয়মানুগত জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যগুলি বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান এরূপ সময়মত দৈনন্দিন সাধিত হইত যে তৎকালেও ইহা বিরল ছিল এবং গত শতাব্দির ষষ্ঠ শতকে তাঁহার সেই শান্তি ও সন্তোষময় সংসার একটী সনাতন হিন্দু গৃহের মনোমুগ্ধকর জাজ্বল্যমান চিত্র বলিয়া মনে হইত। আমার পিতামহ তথাপি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—আমার পিতাকে—তখনকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

আমার পিতা হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। কলেজে তিনি তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা দেশে ইংরাজি শিক্ষার অন্যতম অগ্রদূত ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। দুই পুরুষ পরে অদ্যাপি হেয়ার সাহেবের স্মৃতি সম্মানিত হইতেছে। তাঁহার যে ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভটী গির্জ্জার পূতভূমিতে স্থাপন করিতে গোঁড়া ক্রিশ্চানরা বাধা দেন প্রতি বৎসর ১লা জুন তাহাই পুষ্পামাল্যে ভূষিত করা হয়। যে সকল ব্যক্তি কৃতজ্ঞহৃদয়ে এই মহামানবের স্মৃতিপূজা করেন প্রতি বৎসর তাঁহারাই এই আয়োজন

করিয়া থাকেন। ঘড়ি নির্ম্মাতারূপে ভারতবর্ষে আসিয়া শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিকরূপে তিনি এই জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। হিন্দুর তিনি আপন জন ছিলেন। শুনিয়াছি যখন আমার পিতা কোনও অহিন্দুচিত কার্য্যের জন্য আমার পিতামহের রোষ পরিহার কল্পে গৃহ হইতে পলাইয়াছিলেন তখন আমার পিতামহীকে সান্ত্বনা দিতে হেয়ার সাহেব আমাদের গৃহে আসেন।

উত্তর কালে আমার পিতা মেডিকেল কলেজে যোগ দেন এবং তৎকালীন চিকিৎসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি পারিবারিক আবেষ্টনজাত গোঁড়ামি দূর করে। ডিরোজিও সাহেবের নিকট শিক্ষালাভের সৌভাগ্য সে যুগে অনেকেরই হইয়াছিল। নবদীক্ষিতের ন্যায় তখন তাঁহাদের প্রায় সকলেই পৈতৃক ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হন। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার লিখিত ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিতে বলিয়াছেন যে হিন্দুকলেজের ঐ ছাত্রেরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া স্পর্দ্ধার সহিত প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্ম্মানুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করিতেন। নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণান্তর সেই খাদ্যাংশ সনাতনপন্থী প্রতিবেশীগণের গৃহে নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিতেন না। এই নূতন ভাব আমার পিতাকে প্রভাবান্বিত করে। এইরূপে আমাদের গৃহে তখনকার দুইটী বিভিন্ন ভাবধারা মিশিয়াছিল কিন্তু সেখানে দ্বন্দ্ব ছিল না। পিতামহের অনুসৃত প্রাচীন ভাবধারাই প্রাধান্য লাভ করে, কারণ পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তির শাসন অলঙ্ঘনীয় ছিল; ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম হইতন।

কিন্তু বাদানুবাদের ঐ আবেষ্টনে অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাইত। ঐ প্রতিকূল ভাবধারার মধ্যে আমি শৈশব অতিবাহিত করি। বাঙ্গালার প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুগৃহে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে যে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছিল তাহারই নিদর্শন ছিল আমাদের গৃহের এই বিরুদ্ধ

ভাবধারা। কিন্তু সহিষ্ণুতা হিন্দুর বৈশিষ্ট্য এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের শান্তি নষ্ট করিতে পারে নাই। আর একটী কারণ এই যে সেকালে যতক্ষণ কেহ স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মানুচরণে ব্যাঘাত প্রাপ্ত না হইতেন ততক্ষণ অপরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভিমত বা কার্য্য গ্রাহ্য করিতেন না; আত্মীয় হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। বর্ত্তমান অসহিষ্ণুতা ও বিরোধের মনোভাব বিরল ছিল এবং জ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান হিন্দুগৃহের তখন একটী বৈশিষ্ট্য ছিল।

আমার মনে আছে পাঁচ বৎসর বয়সে আমি পাঠশালে যাই। ব্রাহ্মণ বলিয়া ও পিতার প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুমহাশয় আমার প্রতি মনোযোগ দিতেন। কিন্তু তিনি সেকালের গুরুমহাশয়দের মতন শাসনপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে "বামুনের মেড়া" বলেন। সেইদিন হইতে আমি পাঠশালে যাইতে অস্বীকার করি এবং আমার জিদের নিকট পিতাকে হার মানিতে হয়। তখন বাঙ্গালা শিক্ষা শেষ করিবার জন্য তিনি আমাকে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। সেখানে দুই বৎসর পড়িবার পরে আমার পিতা যে বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিখিয়াছিলেন সেইখানে ভর্ত্তি হই। এইখানেই আমার যথার্থ ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ ক্যাপ্‌টেন্ ডভ্‌টনের দানেই এই বিদ্যালয়টী গড়িয়া উঠে।* বিশেষভাবে এংলো-ইণ্ডিয়ান্ বালকেরাই এই বিদ্যালয়টীতে বিদ্যালাভ করিত। এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার সময় আমি ইংরাজির কিছুই জানিতাম না। সবে বর্ণমালা শেষ করিয়া আমি তখন ইংরাজি বর্ণপরিচয় আরম্ভ করিয়াছি। এই শিক্ষা লইয়া যাহারা ইংরাজি ভাষা ব্যতীত কথা কহিত না এরূপ ছাত্রদের সহিত পড়িতে আসিলাম। তখন বিপদ বুঝিয়া কোন প্রকারে চালাইবার

---

* বিদ্যালয়ের নাম (Doveton College) ডভটন্ কলেজ ছিল। পার্ক ষ্ট্রীট ও ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের মোড়ে এখন যে বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইখানে খোলা জমির উপর একটি সুন্দর বাড়ীতে এই কলেজটি অবস্থিত ছিল।—সম্পাদক।

চেষ্টায় ইংরাজি ব্যাকরণ না জানিয়াও অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজিতে কথা কহিতে শিখি। অবশ্য একথা সত্য যে আমি শুদ্ধভাবে সব সময়ে কথা কহিতে পারিতাম না।

ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্য ব্যতীত কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই যে একটী ভাষা শিক্ষা করা যায় তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে বেশ বোঝা যায়। বস্তুতঃ আজকালকার ছাত্রদের ন্যায় আমি কখনও ইংরাজি ব্যাকরণ শিখি নাই। যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই তখন আমার ব্যাকরণের জ্ঞান লেনির ছোট পুস্তকটীতে সীমাবদ্ধ ছিল। আজকাল টিউটোরিয়াল প্রথায় শিক্ষা ও ছাত্রদের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগদান বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বিদ্যালয়ে বা কলেজে পাঠকালে আমি কিন্তু কোনও টিউটরের সাহায্য পাই নাই। ইংরাজি ও লাটিনের ন্যায় দুইটি ভাষা শিক্ষা করিতে আমি সম্পূর্ণরূপে নিজের উপর নির্ভর করি। সময়ে সময়ে যখন কিছুই বুঝিতে পারিতাম না তখন পিতার নিকট যাইতাম। কঠিন হইলেও ইহাতে আমি স্বাবলম্বন শিক্ষা করি। এই স্বাবলম্বী স্বভাব আমার জীবনে বহু উপকারে লাগিয়াছে। স্কুলে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কৃতী ছাত্র ছিলাম। প্রত্যেক বৎসরে পারি-তোষিক লাভ করিতাম। প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারিলেও প্রত্যেক বারই প্রথমের কাছাকাছি হইতাম। প্রথমে যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করিত অবশেষে তাহাদের সকলকেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। পাঠ্যাবস্থার সেই সকল প্রতিযোগীদের জীবন-সংগ্রামেও অতিক্রম করিয়াছি। মনে হয়, দৃঢ়সঙ্কল্পই জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ।

এংলো-ইণ্ডিয়ান্ ও ইংরাজ শিক্ষকগণ সর্ব্বদাই আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। আমার সহিত ব্যবহারে কেহ কখনও জাতীয় বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। যেখানে আমার জীবনের

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়েকটী বৎসর অতিবাহিত হয় সেই শিক্ষামন্দিরে আমি কোনও দিন জাতিগত বা ধর্ম্ম সম্প্রাদায়গত বিদ্বেষ বা বাদানুবাদের ক্ষীণ আভাষও পাই নাই। জ্ঞানের মিলনসাধনশক্তির প্রভাব বাল্যকাল হইতেই আমি এইরূপে অনুভব করি। ইহা আমার শিক্ষার অঙ্গরূপে গণ্য হয়। যখন বি, এ, উপাধিলাভের পরে আমি কলেজ ছাড়ি তখন অধ্যক্ষ জন্ সিমী সাহেব ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আমাকে বিলাতে পাঠাইতে পিতাকে অনুরোধ করেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ রাজী হন। বরাবরই তিনি আমাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাইয়া আসিয়াছেন। তিনি শুধু বড় চিকিৎসকই ছিলেন না, মনুষ্য চরিত্রের তিনি একজন অভিজ্ঞ বিচারক ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন আমি মাত্র পাঁচ বৎসরের তখন তিনি একখানি উইল করেন। এই উইলে তিনি আমার বিলাতে উচ্চ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেন। এই উইলখানি পরে আমার হাতে আসে। আমার বাল্যকাল হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বিলাতের উচ্চ শিক্ষা আমার জীবনে উপকারে লাগিবে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত আমি বিলাত যাত্রা করি।

বিদ্যালয় ও কলেজ জীবন সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতির এই অংশ শেষ করিবার পূর্ব্বে যে বিশেষ শিক্ষাটী তখন আমি শিখি এবং সমস্ত জীবন অভ্যাস করিয়া উপকৃত হই সেই শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাল্যকালেই নিয়মমত শরীরচর্চ্চার কি গুণ তাহা আমি শিখি। আমার পিতা এই বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন, কারণ নিজে চিকিৎসক বলিয়া তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে স্বাস্থ্যই জীবনের সমস্ত উন্নতির মূল। আমাদের বাটীতে একটী আখড়া ছিল। এই আখড়াতে একজন পালোয়ান আমাদের বিভিন্ন ভারতীয় কুস্তী শিখাইতেন। প্রত্যহ যেরূপ বিদ্যালয়ে নিয়মিত

যাইতাম সেইরূপ আখড়াতেও যাইতাম। আমার একজন ভাই ক্যাপ্টেন জীতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি আগ্রহের সহিত শরীর চর্চ্চা করিয়া উত্তরকালে বহু ব্যায়ামবীরকে পরাস্ত করেন এবং বাঙ্গালার অন্যতম বলিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে গণ্য হন। আমি অনেক সময় তাহার অপূর্ব্ব শারীরিক শক্তির বিষয় ভাবিয়াছি এবং আমার মনে হয় ইহার মূল উৎস শুধু শরীরচর্চ্চা নয় পরন্তু জন্ম হইতেই শারীরিক শক্তির প্রাচুর্য্য।

তিনপুরুষ ধরিয়া বাল্যবিবাহ আমাদের বংশে অপ্রচলিত ছিল। আমার পূর্ব্বপুরুষরা সংস্কারক ছিলেন না; তাঁহারা প্রাচীনপন্থী ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহার ফলেই আমাদের পরিবারে বাল্যবিবাহ সম্ভব হয় নাই। শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশীয় বলিয়া বিবাহযোগ্যা কন্যাদের জন্য উপযুক্ত বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন পাত্র পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ হইত কারণ সমমর্য্যাদাসম্পন্ন বর অল্পই পাওয়া যাইত। বয়স্থা কন্যাদেরই সেইজন্য বিবাহ হইত। আমার মাতা ও পিতামহীর যখন বিবাহ হয় তখন উভয়েই বয়স্থা। আমার মনে হয় আমার প্রপিতামহীর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আমার প্রপিতামহীকে আমি বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম তখন তিনি শতাধিক বর্ষীয়া। আমার বংশের ইতিহাসেই আমি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি পাই। সর্ব্বদাই আমি এই ব্যাপারের উল্লেখ করিতাম। আমার বংশের সকলেই প্রচুর স্বাস্থ্যের অধিকারী। পুরুষানুক্রমে বাল্যবিবাহের অপ্রচলন ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। বহুপূর্ব্বে লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত সাক্ষাৎকালে আমি ঐকথাই বলিয়াছিলাম। তিনি আমার শারীরিক তৎপরতায় বিস্ময় প্রকাশ করেন কারণ তাঁহার মতে ঐ বয়সে কোনও ভারতীয়ের পক্ষে ঐরূপ তৎপরতা দুর্লভ। সামান্য তথ্য বহু অনুমানের তুল্য মূল্যবান্। জীবনের একটী অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমার দেশবাসীর

বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবান্বিত করিবে বলিয়া আমি এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি। কারণ স্বাস্থ্য ও শক্তিই জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান।

তরুণ বয়সে জন সাধারণের কার্য্যে অল্পই যোগ দিই। সংবাদপত্র তখনও এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং জন সাধারণের নিকট বক্তৃতা তখনও প্রচলিত হয় নাই। মনীষী রামগোপাল ঘোষ যে সকল সভায় বক্তৃতা করিতেন অল্পসংখ্যক লোকই সেখানে যোগদান করিতেন।

কেশবচন্দ্র সেন প্রথম সাধারণের নিকট বক্তৃতা প্রচলিত করেন। মনের উপর বক্তৃতাশক্তির প্রভাব তিনিই প্রথম প্রদর্শন করেন। গতশতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিপত্তি এত অধিক হয় যে পরোক্ষভাবে সনাতন হিন্দুসমাজের উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম্মান্তরগ্রহণের যে প্রবল স্পৃহা তখন যুবকগণের মধ্যে দেখা দেয় তাহা ব্রাহ্মসমাজই রোধ করে। যাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মে তৃপ্তি পাইতেছিলেন না তাঁহারা এই ব্রাহ্ম নেতার বাগ্মি-তায় মুগ্ধ হইয়া নূতন ধর্ম্মের উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং এই নূতন ধর্ম্মের শিক্ষায় সান্ত্বনা ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রথমতঃ দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অনুগামী ছিলেন কিন্তু পরে তিনি মহর্ষির মতবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলি তরুণ মনের উপর তখন যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। বহু শ্রোতা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক নূতন চেতনা তখন দেখা দেয়। সুমিষ্ট স্বর, মনোহর বাক্যবিন্যাস এবং আকর্ষিণী সন্নিধি তাঁহার বক্তৃতাকে অপরূপ করিয়া তুলিত। তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস বিরাজিত ছিল তাহাই তাঁহার বক্তৃতাকে হৃদয়গ্রাহী করিতে সমর্থ হয়। গভীর বিস্ময় সহকারে রুদ্ধশ্বাসে আমি প্রায় তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতাম।

প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার কেশবচন্দ্রের উপযুক্ত সহকর্ম্মী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা ভিন্ন ধরণের ছিল। তাঁহার বক্তৃতা কল্পনাবহুল, চিত্রবৎসুস্পষ্ট ও হাস্যরসপূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু কেশবচন্দ্রের তুলনায় ইহা হৃদয়কে বা অনুভূতি সমূহকে তত অভিভূত করিতে পারিত না।

কেশবচন্দ্রের গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। আজন্মনেতা কেশবচন্দ্রের মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। হিন্দু বৈষ্ণবের তপশ্চর্য্যা তিনি পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্য হইতে লাভ করেন, কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্মশিক্ষক না হইলে একজন সুযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞের সম্মান তিনি লাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মধ্যে সাধারণ জন মনোমত সঙ্গী ও মহানুভব নেতার সন্ধান পাইতেন। তাঁহার শিক্ষার পরোক্ষ ফলও কম নয়। এই শিক্ষা যে কেবল সামাজিক বিষয়ে ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনকে উদার করিয়া ছিল তাহা নহে পরন্তু ইহা প্রাচীন পন্থীদের প্রাচীন ধারার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করে। তাঁহারা ভীত হইয়া সঙ্কীর্ণ ও অপ্রচলিত পূর্ব্ব সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া ফেলেন। আধুনিকতা ও উদারতার দ্বারা সত্বর সংস্কার সাধন করিতে গেলে সাধারণতঃ সন্দেহ ও ভয়ের উদ্ভব হয় এবং অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

ঐ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের সহিত প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে মদ্যপান নিবারিণী সভারও কার্য্য চলিতে থাকে। প্যারীচরণ সরকারের নিকট শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই। তিনি বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। সে সময়ে যুবকদিগের রক্ষার্থ এইরূপ একটী সভার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সে সময়ে দেশের কয়েকজন মনীষী পর্য্যন্ত পানাসক্ত হইয়া পড়েন, কারণ ইংরাজি সভ্যতার ইহা একটী অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। কেহ মদ্যপান না করিলে তাঁহাকে শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হইত না।

মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন যে একদিন অপরাহ্নে তিনি রামগোপাল ঘোষের বাটীতে কতিপয় বন্ধুর সাক্ষাৎ পান এবং গৃহকর্ত্তার অনুপস্থিতিতে ভৃত্য দ্বারা মদ্য আনাইয়া সকলে পান করেন ; রামগোপাল ঘোষ অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকলকেই মত্তাবস্থায় ভূপাতিত দেখিলেন। বাঙ্গালার যুবকদের এই পাপ হইতে রক্ষা করিয়া শিক্ষিত সমাজের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।

তরুণের প্রিয় শিক্ষক ও সর্ব্বত্র সম্মানিত প্যারীচরণ সরকার এই কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ও বাহ্য আচরণ দেখিলে তাঁহাকে নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত বোধ হইত না। তাঁহার মৃদু, শান্ত ও কোমল স্বভাবে নেতার কঠোরতা ছিল না বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাঁহার কুসুম কোমল হৃদয়ে বজ্রের কঠোরতা প্রচ্ছন্ন ছিল। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের শান্ত হেড মাষ্টারের চরিত্রে দুইটী [illegible] ভাবের সমাবেশ হয়—একদিকে শিশুসুলভ সারল্য এবং অপর দিকে নেতৃসুলভ কঠোরতা।

মদ্যপান নিবারিণী সভা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। আমরা সকলেই ইহাতে যোগ দিয়া উৎসাহ সহকারে সভা আহ্বানকরতঃ বক্তৃতা করিতাম। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পাদ্রী ডল্ সাহেব ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেন। এই সভা স্থায়ীভাবে সমাজের মনে রেখাপাত করে এবং ক্রমবর্দ্ধমান অমিতাচারের স্রোত রোধ করে।

বিধবা বিবাহ প্রচার আমার ছাত্রাবস্থায় একটী বিশেষ আন্দোলন বলিয়া গণ্য হয়। মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র ইহার সূত্রপাত করেন। তিনি চিরকাল বাঙ্গালা দেশে পূজিত হইবেন এবং মনে হয় এ দেশের ইতিহাসে রামমোহনের পরই তাঁহার স্থান নির্দ্ধারিত হইবে। তাঁহাকে আমি ভালরূপে জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়সংকল্প, মতের উদারতা এবং অসহায় ও

দরিদ্রের প্রতি গভীর সহানুভূতি আমাকে মুগ্ধ করিত। শেষোক্ত গুণটী তাঁহাকে হিন্দুবিধবার স্বার্থরক্ষায় প্রবুদ্ধ করে। সেই সময়ে গভর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকায় হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত করাইতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

সনাতন হিন্দুসমাজে ইহাতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহা আমার বেশ মনে আছে। এই আন্দোলনে আমার উৎসাহ ছিল। প্রতিবেশী একটী ব্রাহ্মণ কন্যার বৈধব্য আমার মনে কি গভীর রেখাপাত করিয়া ছিল তাহার স্মৃতি আজও মনে আছে। পুনরায় তাহার বিবাহ হওয়া আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তাহার বাটীর পাশ দিয়া যাইবার সময় আমার মনে গভীর করুণার সঞ্চার হইত। কিন্তু সমাজের মনে এই আন্দোলন তখন কিছু মাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই। আমার পিতামহ ইহার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু পিতা স্বপক্ষে ছিলেন। দেশাচারেরই তখন জয় হয়। হিন্দু বিধবার দুর্গতি মোচনার্থে যে মহাত্মার প্রাণ কাঁদিয়াছিল তাঁহাকে নিরাশ হৃদয়ে ইহধাম ত্যাগ করিতে হয়। স্বীয় সময়ের অগ্রবর্ত্তী মনস্বীদের ভাগ্যে ঐরূপ ঘটে। ভবিষ্যবংশের হস্তে অসমাপ্ত কার্য্য-ভার প্রদান করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ইহধাম ত্যাগ করেন। অতীব দুঃখের বিষয় তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এই আন্দোলন অতি অল্প অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার পর কেহই তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য হিন্দু বিধবার অবস্থা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। বৈধব্য দশা হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের অশ্রু মুছাইতে কেহই অগ্রসর হন নাই। মৌখিক সহানুভূতি বোধ হয় বৃদ্ধি পাইয়াছে; বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিক দিবসে সভায় চীৎকার শুনিলে তাহাই বোধ হয় কিন্তু তাঁহার কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। যৌবনে ভাবিতাম কবে সেই মহাপুরুষের বাণী সার্থক হইবে; আজ জীবন সায়াহ্নেও সেই কথাই ভাবিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম বিলাতগমন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত আমি বিলাত যাত্রা করি। আমরা তিনজনই তরুণ, তা ছাড়া বিলাত গমন এখন অপেক্ষা আরও কঠিন ছিল। কেবল যে প্রিয়জন হইতে বিচ্ছেদ ও বিদেশগমনজনিত কষ্টই চিন্তার বিষয় ছিল তাহা নহে—পরন্তু সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে ভয় আর নাই। আমরা তিনজনে গুপ্তভাবে আয়োজন করিতে লাগিলাম—যেন কোনও অন্যায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলাম। পিতা আমাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন কিন্তু মাকে কিছুই জানিতে দেওয়া হয় নাই। যাত্রার অব্যবহতি পূর্ব্বে যখন মাকে জানান হইল তখন তিনি এই দুঃসংবাদে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন।

মনোমোহন ঘোষ তখন সবেমাত্র বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাই। তাঁহার ন্যায় উদার ও মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তি অল্পই দেখিয়াছি। সত্যই তিনি দেশ-প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার দেশবাসীরা অধিক সংখ্যায় বিলাত যায় ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং তিনি সাধ্যানুযায়ী উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেন। তাঁহার এই উৎসাহদানের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার নাম রাখেন 'য়ুরোপ যাত্রি ভারতবাসীদের রক্ষক'। যাত্রার পূর্ব্বরাত্রে আমরা তাঁহার কাশিপুরস্থ বাসভবনে অবস্থান করি এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চাঁদপাল ঘাট অভিমুখে যাত্রা করি।

প্রত্যুষে আমার পিতা আসিলেন। ইহাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। কারণ আমার বিলাতে অবস্থানকালে তিনি মারা যান। তাঁহার

গাড়ি পর্য্যন্ত আমি অনুগমন করি। সাদা ধুতি ও চাদর পরিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। আমার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া জাহাজের সোপান দিয়া অবতরণ করিতে করিতে তিনি 'বিদায়' শব্দটী উচ্চারণ করিবার পরই পিছন ফেরেন কিন্তু তখনও তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত ছিল এবং তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছিল। ইহাই তাঁহার আমার সহিত শেষ কথা। বোধ হয় হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কোনও বাণীর অজ্ঞাত অনুপ্রেরণায় ও জ্ঞানীসুলভ পূর্ব্বদৃষ্টি-বশতঃ তিনি ঐ কথাটী উচ্চারণ করেন। পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে—অদ্যাপি ঐ ঘটনা বহুমূল্য নিধির ন্যায় আমার হৃদয়ে সংরক্ষিত আছে। পিতা পুত্রে চিরতরে বিদায় সম্ভাষণ হইল—আমি আমার দীর্ঘ, দুর্গম ও বহু বিচিত্র বাধাসঙ্কুল পথে চলিলাম, আর আমার পিতা মাতাকে সান্ত্বনা দিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। আমাকে মানুষ করিবার জন্য পিতা বহু ত্যাগ স্বীকার করেন; তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আজীবন আমি সন্তানোচিত ভক্তি ও প্রীতির সহিত পূজা করিয়াছি। তাঁহার নিঃস্বার্থ ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, নীচতার প্রতি ঘৃণা আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে এবং হিন্দুর অত্যাবশ্যক গুণ সন্তানোচিত ভক্তিকে সুদৃঢ় করিয়াছে। বিদেশী পাঠকের নিকট ইহা ভাবাবেগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিন্তু হিন্দুর নিকট ইহা অন্তরের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস।

সে সময় এ দেশের লোকেরা উত্তর মেরুতে অভিযান অপেক্ষাও বিলাত যাত্রা বিপজ্জনক মনে করিত। রামমোহন রায়ের সময় ব্যাপার আরও গুরুতর ছিল। তাঁহার জীবন-চরিত লেখক বলিয়াছেন—যে যখন তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহ হইতে যাত্রা করেন তখন তাঁহাকে শেষ দর্শনের জন্য বিরাট জনতা সমাগম হয়।

সমুদ্রযাত্রা আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করি। জাহাজের আন্দোলনে কাহারও বমনোদ্বেগ হয় নাই। যে সব বন্দরে জাহাজ

থামিয়া ছিল সর্ব্বত্রই বহু দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল। পাঁচ সপ্তাহ পরে আমরা সাউদাম্‌টনে পৌঁছাই। মনোমোহন ঘোষের অনুরোধক্রমে উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (**Mr. W. C. Bonnerjee**) তথা হইতে আমাদের লণ্ডনে লইয়া যান। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের নিকট বার্ণাড্‌ ষ্ট্রীটস্থ একটী আবাসে তিনি আমাদের ভর্ত্তি করিয়া দেন। অল্পদিন সেখানে থাকিবার পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উঠিয়া যাই এবং নিজেদের কার্য্যে মনোযোগ দিই। হামষ্টেড্‌ হীথের নিকট লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলিজিয়েট্‌ স্কুলের লাটিন ভাষার 'শিক্ষক টালফোর্ড ঈলি (**Mr Talfourd Ely**) সাহেবের গৃহে আমি ছাত্ররূপে বাস করিতাম। তাঁহার গৃহে বাস করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার হয়। ঈলি সাহেব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সংসারটীও ছিল সুখের। সেখানকার পরিচ্ছন্ন, সুব্যবস্থিত ও নিয়মানুগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই জীবন আমাকে মুগ্ধ করিত। সমস্ত পরিবারের মধ্যে শাসন ও সুশৃঙ্খলার একটী ভাব ব্যাপ্ত ছিল। আমি পরিবারস্থ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতাম। সেইজন্য আঠার মাস পরে যখন আমি তাঁহার গৃহ হইতে অন্য বাসায় যাই তখন উভয়তঃ কষ্টানুভব করি। আমি কঠোর পরিশ্রম সহকারে পাঠ করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে আমার নাম প্রকাশিত হইবার পর হইতেই আমার বিপত্তি আরম্ভ হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই তখন আমার বয়স ষোল বৎসর লিখিয়াছিলাম। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার তদানীন্তন নিয়মানুযায়ী আমার বয়স ১৯শের অধিক কিন্তু একুশের কম হওয়া আবশ্যক ছিল। ১৮৬৩ সালে আমার বয়স ষোল হইলে ১৮৬৯ সালে একুশের অধিক হয় এবং ইহা আমার সাফল্যের অন্তরায় হয়। কিন্তু যথার্থ ঘটনা ছিল অন্যরূপ। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে আমি জন্মগ্রহণ করি। অতএব আমি যখন

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই তখন আমার বয়স পনর। কিন্তু বয়স গণনার ভারতীয় রীতি অনুসারে আমি আমার বয়স ষোল বৎসর লিখিয়াছিলাম। ভারতীয়রা জন্ম সময় হইতে বয়স গণনা করেন না; মাতৃগর্ভে অবস্থান হইতেই তাঁহারা বয়স গণনা করিয়া থাকেন।

বিদ্যালয়ের কাগজ পত্র হইতেও ঐ তথ্য প্রমানিত হইল। যাহা হউক এই আপাতপ্রতীয়মান বৈসাদৃশ্যের কারণ সেখানকার ভারতীয় বন্ধুগণ জানিতেন বলিয়া কেহ ভাবেন নাই যে ইহা আমার সাফল্যের অন্তরায় হইবে। পরীক্ষার ফল ঘোষণা হইবার কয়েক সপ্তাহ পরে সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে একপঞ্চাশত্তম পরীক্ষার্থী (অকৃতকার্য্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম) যদি প্রদত্ত ঠিকানায় ব্যক্তিবিশেষের সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহা হইলে তাঁহার উপকার হইবে। লণ্ডনস্থ ভারতীয় মহলে সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে কে এই বিজ্ঞাপনের প্রকাশক।

সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের দৃষ্টি এই অনৈক্যের প্রতি আকর্ষণ করা হয়। আরও দুইজন কৃতকার্য্য ভারতীয় পরীক্ষার্থী—বিহারী লাল গুপ্ত ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুরের ক্ষেত্রেও ঐরূপ বৈসাদৃশ্য ঘটে এবং সকলেই একপ্রকার কৈফিয়ৎ দিই। বয়সগণনার ইংরাজি ও ভারতীয় পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্যই এই বৈসাদৃশ্য ঘটে তাহা অমেরা জানাই কিন্তু ইহা কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষজনক হয় নাই। আমার ও শ্রীপদ বাবাজীর নাম উত্তীর্ণব্যক্তিদের নামের তালিকা হইতে অপসারিত করা হয়। বিহারীলালের নাম তালিকাভুক্ত রাখা হইল কারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় ইংরাজি মতে তাঁহার বয়স ষোল হইলেও তিনি তখন প্রয়োজনীয় বয়স অতিক্রম করেন নাই।

এই সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে আমি রাজী হই নাই। অধিকন্তু এই ব্যাপারে ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা

যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র এবং রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অমোর বর্ণিত বয়সগণনার ভারতীয় রীতিই যে ঠিক তাহা হলফ-নামা দ্বারা স্বীকার করেন।

ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ বহু প্রবন্ধ সে সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্যার এডওয়ার্ড রায়ান **(Sir Edward Ryan)** কমিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বহুকাল বাঙ্গালা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি বয়সগণনার ভারতীয় রীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন কিংবা তাহা জানিয়াও আমাদের ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিতেছিলেন।

সিভিলসার্ভিস কমিশনারদের উপর পরোয়ানা জারি করিবার জন্য কুইনস্‌বেঞ্চ কোর্টে আবেদন করিতে মনস্থ করি। বিলাতের বন্ধুরা সকলেই আদালতে আবেদনই একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। এই ব্যাপারে দুই ব্যক্তির নাম আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি—জন্‌ ডি বেল সাহেব **(Mr. John D. Bell)** ও স্যার তারক নাথ পালিত। তারক নাথ তখন সবে ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। তাঁহারা আগ্রহসহকারে বিষয়টী গ্রহণ করিলেন। বেল সাহেব বহুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়া তখন প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিষ্টারি করিতেছিলেন। তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন কারণ প্রথমতঃ তিনি আমার প্রতিবাদ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি বহুকাল ভারতের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ সমর্থনের জন্য আমাদের সাফল্য লাভ হয়। যাঁহারা তারকনাথ পালিতকে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে জানিবার সৌভাগ্যলাভ করেন তাঁহারা তাঁহার উদার অন্তঃকরণ, গভীর বন্ধুপ্রীতি ও কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার

পরিচয় লাভ করেন। এই সমস্ত গুণ তখন হইতেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া উত্তরকালে তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট নাগরিক ও প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব হইতে সাহায্য করে।

শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর কিন্তু এই ব্যাপারে কিছুই করেন নাই। সাংসারিক চাতুর্য্য ছিল তাঁহার যথেষ্ট। সেইজন্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আমি জিতিলে তাঁহারও জয়লাভ হইবে কারণ উভয়ের ব্যাপারই এক। পরবর্ত্তীকালে যিনি লর্ডজাষ্টিস্ অব্ আপীল হন সেই মেলিস্ সাহেবকে (**Mr. Mellish**) আমি আমার পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করি এবং জন্ ডি বেল তাঁহার সহকারীরূপে থাকেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন মেলিস সাহেব আমার নাম কেন সিভিল সার্ভিস তালিকার অন্তর্ভূত করা হইবে না তাহা দেখাইবার জন্য সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের উপর হুকুমনামা জারির প্রার্থনা করিয়া কুইনস্‌বেঞ্চ কোর্টে আবেদন করেন।

যেখানে আমার আবেদন গৃহীত হয় সেখানে তখন বিলাতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিচারপতি কার্য্য করিতেছিলেন। স্যার আলেকজাণ্ডার কোবার্ণ (**Sir Alexander Cockburn**) ছিলেন প্রধান বিচারপতি। নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে বিচারপতিদের অভিমত পরিস্ফুট হইবে।

মেলিস্ সাহেব বলিলেন যে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতীয়ের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। এই সামান্য কারণে তাঁহাকে ব্যর্থ হইতে হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বহু বিঘ্নের মধ্যে এখানে আগমনকরতঃ ইনি ইংরাজ পরীক্ষার্থীদের সহিত ইংরাজি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিয়া সফল হইয়াছেন—এইরূপ অসঙ্গত কারণের জন্য তাঁহাকে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইয়াছে ইহা ভারতীয়গণ জানিলে সত্যই দুঃখের বিষয় হইবে।

তাঁহার বয়স যে অধিক নয় তাহা বুঝাইয়া তিনি যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহার উত্তরে কমিশনারগণ লিখিয়াছেন যে তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি ন্যায্য বয়স অতিক্রম করিয়াছেন (হাস্য) অথচ এই সম্বন্ধে কোনরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে তাঁহারা রাজী নহেন।

প্রধান বিচারপতি ঃ—অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চান যে যত সাক্ষ্য আপনি আনয়ন করুন তাঁহারা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

বিচারপতি মেলর ঃ—তাঁহারা বলিতে চান যে কলিকাতায় যাহা লিখিয়াছিলে তাহার দ্বারা তুমি আবদ্ধ কিন্তু ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহা বর্ত্তমান বিবৃতির সহিত সঙ্গত।

বিচারপতি ব্ল্যাকবার্ণ ঃ—তাঁহারা এই ব্যক্তির বিবৃতি ভুল বুঝিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে ঐ ব্যাখ্যানুযায়ী আবেদনকারী উত্তীর্ণ হইবার অযোগ্য।

বিচারপতি হেনেন্ ঃ—তাঁহারা বোধ হয় বলিতে চান যে বয়স গণনার ভারতীয় রীতিই তাঁহাদের ধরা উচিত।

প্রধান বিচারপতি ঃ—আমাদের অধিকারভুক্ত হইলে এই ব্যাপারে আমাদের অধিকার প্রয়োগ করিব।

মেলিস্ সাহেব প্রমাণ করিলেন যে ইহা তাঁহাদের অধিকারভুক্ত বিষয়। রাজকীয় বিধি অনুসারে প্রত্যেক ভারতীয় প্রজা কয়েকটী সর্ত্তে পরীক্ষা দিতে পারিতেন। এই সমস্ত সর্ত্তগুলি আবেদনকারী যথাযথভাবে পালন করিলেও কমিশনারগণ একটী অসঙ্গত কারণে তাঁহাকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন অথচ সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেছেন না যদিও যে কোনও বিচারকের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আবেদনকারী কমিশনারদের উপর পরোয়ানা জারি করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন যাহাতে তাঁহারা সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করেন ও ঐ সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া বিষয়টী বিচার করেন।

আদালত পরোয়ানা জারি করে কিন্তু সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণ মামলা চালাইতে সাহস করিলেন না। তাঁহাদের প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হয় নাই। সেইজন্য মামলা শুনিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা শ্রীপদ বাবাজি ঠাকুর ও আমাকে পুনরায় মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।

আমি জয়লাভ করিলাম বটে কিন্তু পিতা এই সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি আমার পিতা মারা যান। তখন আমি কেণ্টিস্ টাউনে মিষ্টার কে, এম, চ্যাটার্জ্জির সহিত বাস করিতে ছিলাম। মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি আমি পিতার মৃত্যু সংবাদ পাই। পূর্ব্ব রাত্রে কেন জানি না অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ি। মন যেন বাটীর দিকে ধাবিত হইতে ছিল আত্মীয়স্বজন বিশেষতঃ পিতার কথা বার বার মনে পড়িতে লাগিল। গাঢ় নিদ্রায় অভ্যস্ত আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টকর রাত্রি বলিয়া বোধ হইতে ছিল। প্রাতঃকালে ভোজন ঘরে যাইবার একটু পরেই মিষ্টার চাটার্জ্জি আসিলেন। পিয়ন আসিয়া ভারতীয় ডাক বিলি করিয়া গেল। চ্যাটার্জ্জি ভারতীয় পত্রাদি পাইলেন কিন্তু আমার কোনও চিঠি পাইলাম না। ইহাতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। বন্ধু মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিজের চিঠিখানি উচ্চৈস্বরে পড়িতে লাগিলেন। মনোযোগ সহকারে আমি শুনিতে ছিলাম কিন্তু সহসা তিনি স্তব্ধ হইলেন। বিষণ্ণ মুখে স্বীয় মনোভাব দমন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমার দিকে করুণ ভাবে চাহিয়া রহিলেন। বহু বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু যে হৃদয়াবেগ তখন আমাকে অভিভূত করে তাহা এখনও বেশ মনে আছে। আমি তাঁহার আকস্মিক নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ মৌন রহিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বিষণ্ণ দেখিলাম। দুর্ভাগ্যের আভাস পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। কোনও অজ্ঞাত শক্তির পরিচালনায় বন্ধুকে

প্রশ্ন করিলাম—"পড়িতেছেন না কেন? কেহ কি পীড়িত?" তথাপি কোনও জবাব পাইলাম না। অকপট ও আলাপপ্রিয় বন্ধু সহসা নির্ব্বাক হইলেন কেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া বারংবার প্রশ্ন করিতে লাগিলাম কারণ অন্তরে কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলাম না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার পিতা কি পীড়িত? তথাপি কোন উত্তর নাই। বন্ধু প্রতিমূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দ। অবশেষে অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, 'আমার পিতা জীবিত আছেন ত'? চ্যাটার্জ্জি চিঠিখানি আমার হাতে দিয়া যে আসনে বসিয়াছিলাম তথায় উঠিয়া আসিলেন ও আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অভিভূত ও সংজ্ঞাহীনের ন্যায় আমি পড়িয়া রহিলাম। লালমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, উমেশ চন্দ্র মজুমদার, কেশব চন্দ্র সেন এবং অন্যান্য বন্ধুরা শীঘ্রই আমাকে দেখিতে আসিলেন। রাত্রিতে আমাকে একাকী থাকিতে দিতে বন্ধুরা অনিচ্ছুক বলিয়া উমেশ চন্দ্র মজুমদার সে রাত্রে আমার নিকট ছিলেন। সে দিনের ঘটনা ভুলিবার নয়। যে সমস্ত স্বর্গগত বন্ধুরা সেই দুঃখের দিনে আমাকে সান্ত্বনা দান করেন তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি ঐ ঘটনার সহিত বিজড়িত রহিয়াছে।

মামলার গোলমালে প্রায় এক বৎসর নষ্ট হয় বলিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের দলের সহিত কিম্বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহাদের সহিত শেষ পরীক্ষা দিবার অধিকার আমাদের দুজনকে দেওয়া হয়। আমি প্রথম দলের সহিত পরীক্ষা দিতে মনস্থ করি কিন্তু শ্রীপদ বাবাজী দ্বিতীয় দলের সহিত পরীক্ষা দেন।

শ্রীপদবাবাজির সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সর্ব্বদিকেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনও ভাষা আয়ত্ত করিবার শক্তিও ছিল তাঁর অসাধারণ। কঠোর পরিশ্রম করিবার

শক্তি তাঁহার অধিক না থাকিলেও স্বভাবদত্ত ক্ষমতা এই ত্রুটীপূরণ করে।

এই সূত্রে একটী ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। ভাগ্য মানব-জীবনে সময়ে সময়ে কত কাজ করে তাহা এই ব্যাপারটী হইতে বোঝা যায়। পরীক্ষার পূর্ব্বরাত্রে আমরা সকলেই ব্যস্ত ছিলাম কিন্তু শ্রীপদ বাবাজিকে মোটেই সেরূপ দেখা যায় নাই। দাবাবড়ে খেলিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দাবায় তিনি এত দক্ষ ছিলেন যে পাশের ঘর হইতে দাবার চাল চালিতে পারিতেন। নির্দ্দিষ্ট অভ্যাসানুযায়ী একবার খেলিবার পর বোধহয় স্বীয় বিবেক তাঁহাকে পরীক্ষার কথা মনে করাইয়া দিল। তখন নিকটে ওয়েবষ্টার অভিধান দেখিয়া অভিধানের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে যাহা লেখা ছিল তাহা পড়িতে লাগিলেন। স্মৃতিশক্তি প্রখর বলিয়া ঐ অধ্যায়ের প্রত্যেকটী ভাব তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল। ভাগ্যক্রমে ইংরাজি রচনার প্রশ্নপত্রে ঐ বিষয় প্রশ্ন ছিল এবং স্বভাবতঃই শ্রীপদ বাবাজি ভাল ভাবে এই প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিতে পারেন।

শ্রীপদ বাবাজি কেবল মেধাবী ছিলেন না, পরন্তু তাঁহার ন্যায় অমায়িক লোক কম ছিল। স্যার তারকনাথ পালিত তাঁহার চালক, শিক্ষক ও বন্ধু ছিলেন। যখন প্রথম' বিলাত আসেন ঠাকুর নিরামিষাশী ছিলেন এবং দেশীয় রীতিতে কেশবিন্যাস করিতেন। স্যার তারকনাথ শীঘ্রই তাঁহাকে মাংসাশী করিয়া তুলেন এবং বিলাতি কায়দায় কেশ সংস্কার করিতে অভ্যস্ত করেন। এই নূতন অভ্যাস ঠাকুর আনন্দচিত্তে পালন করেন। আমরা ইহা লইয়া বিদ্রূপ করিলে তিনি যে উচ্চ হাস্য করিতেন তাহা আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিত। অদ্যাপি তাঁহার সেই হাস্যের প্রতিধ্বনি যেন আমার কাণে বাজিতেছে।

১৮৬৯ সালে যাঁহারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করেন

তাঁহাদের মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞের তিরোধান হয়। আমি আনন্দরাম বড়ুয়ার কথা বলিতেছি। তিনি আসামের লোক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে কৃতিত্ব দেখাইয়া সরকারি বৃত্তি লইয়া তিনি বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করেন এবং ১৮৭০ সালে মনোনীত হন। রাজকার্য্যের সহিত সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি একখানি সংস্কৃত অভিধান প্রস্তুত করিতে ছিলেন কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই।

আমার বন্ধু রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং বিহারী লাল গুপ্ত সম্বন্ধে কি বলিব ? তাঁহারা ভায়ের ন্যায় ছিলেন। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন হইলেও, যাবজ্জীবন আমরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে তাঁহারাই প্রথম ভারতীয় কর্ম্মচারী। তাঁহাদের পদ বিঘ্নসঙ্কুল ছিল এবং কার্য্যের উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু পথপ্রদর্শক ও অগ্রণীর উপযুক্ত মহৎগুণসমূহ তাঁহাদের ছিল। কার্য্যক্ষেত্রে যখনই চাকরি ও দেশের স্বার্থে সংঘাত বাধিয়াছে তখনই তাঁহারা স্বদেশের স্বার্থকে বড় করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্রূপে কার্য্য করিবার সময় বিহারীলাল গুপ্ত ইহা প্রধানতঃ আরম্ভ করেন। রমেশ চন্দ্র দত্তকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইত। কিন্তু তথাপি এই বিশিষ্ট রাজ কর্ম্মচারী একটী বিভাগীয় কমিশনার অপেক্ষা উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই। বরোদার মহারাজা সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিতে দ্বিধা করেন নাই। যখন তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য তখন সকলেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব

করিতেন। সে সময় আমিও সদস্য ছিলাম বলিয়া ইহা বেশ লক্ষ্য করি। তিনি সরকারি নিয়মে চলিতেন না; ইহাতে কিন্তু সরকারি দলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইত। একবার ছোটলাট স্যর চার্লস্ ইলিয়ট্ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া কোনরূপে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলেন যে সরকারি দলে মিষ্টার দত্তের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন।

এইবার আমি বিলাতের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমরা বিলাতে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে কয়েকটী ক্লাসে যোগ দিই এবং কয়েকটী অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করি। সকলেই আমাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন। বিশেষতঃ অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার ও হেনরি মর্লি আমাদের বিশেষ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেন কারণ তাঁহারা বোধহয় প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করা কত কষ্টকর বুঝিতেন। মর্লি সাহেব আমাদের গৃহের লোক ভাবিত। ডক্টর গোল্ডষ্টাকার অবিবাহিত ছিলেন। তাঁহার গৃহে কেবল একটী কুকুর ও এক বৃদ্ধা দাসী ছিল। যখনই আমরা যাইতাম কুকুরটী চিৎকার করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিত। গোল্ডষ্টাকার সাহেব আমাদের স্নেহ করিলেও তিনি হিন্দুগুরুর ন্যায় কঠোর শাসন জানিতেন। একদিন আমি যাইতে বিলম্ব করায় তিনি বলেন "ব্যানার্জ্জি, তোমার পূর্ব্বপুরুষরা সময়ের ধার ধারিতেন না, তুমিও দেখিতেছি তাঁহাদের রীতি অবলম্বন করিতেছ। কিন্তু এ দেশে তাহা হইবে না। এখানে 'সময়' মানে 'অর্থ'। সেই অবধি আমি ঐ উপদেশ প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ডক্টর গোল্ডষ্টাকার ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রাচীন পদ্ধতির পণ্ডিতের ন্যায় ছিলেন—বজ্রাদপি কঠোর কিন্তু কুসুমাদপি মৃদু ছিল তাঁহার প্রকৃতি। সংস্কৃত চর্চ্চার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন বলিয়া তিনি ভারতীয় পণ্ডিতদের ন্যায়

ক্রোধপ্রবণ ছিলেন। একদিন চ্যারিংক্রস দিয়া হাঁটিয়া যাইবার সময় সামান্য কারণে তিনি রাগিয়া যান। অধ্যাপক মর্লি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি কাণে কাণে বলিলেন 'ব্যানার্জ্জি কিছু মনে করিও না। ওঁর একপাটি জুতার গোড়ালি ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়া উনি ঐরূপ করিতেছেন'। আমরা সকলেই হাসিতে লাগিলাম।

অধ্যাপক মর্লির সুমিষ্ট স্বভাব সংস্কৃত অধ্যাপকের রোষপ্রবণ স্বভাবের বিপরীত ছিল। জীবন তাঁহার নিকট আনন্দদায়ক সূর্য্য-কিরণের ন্যায় প্রিয় বোধ হইত। তাঁহার গৃহও আনন্দের ছিল। সর্ব্বদাই তিনি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। সিভিল সার্ভিস কমিশনার-গণের সহিত বিবাদের সময় এই সদাহাস্যবদন অধ্যাপক আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। তাঁহারই জন্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের সহানুভূতি লাভ করিতে সক্ষম হই এবং সেইজন্য ডিকেন্স তাঁহার সম্পাদিত 'গুড ওয়ার্ডস্' নামক পত্রে এই বিষয়ে একটী যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। আমার বিপদের দিনে সর্ব্বদাই তাঁহার সহানুভূতিসূচক বাক্য ও প্রফুল্ল দৃষ্টি লাভ করিয়াছি। একদিন তিনি বলেন 'ব্যানার্জ্জি, তুমি কমিশনারদের যেরূপ তীব্র ভাবে প্রতিবাদ করিতেছ সেজন্য লোকেরা তোমার একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে'। পদও প্রতিপত্তি নির্ব্বিবশেষে প্রত্যেক ইংরাজ সংগ্রামশীল ব্যক্তিকে মনে মনে সহানুভূতি করে এবং তাহাদের এই গুণ স্বদেশ হইতে বহু দূরে বাস করিলেও দেখা যায়।

আজকাল বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ শুনা যায়, কিন্তু আমাদের সময়ে এরূপ ছিল না। আমরা সর্ব্বত্র অভ্যর্থনা ও সদয় ব্যবহার লাভ করি। এ কথা সত্য যে আমরা অল্পসংখ্যক ছিলাম বলিয়া সর্ব্বক্ষণ ইংরাজদের সহিত থাকিতে বাধ্য হইতাম। ইহাতে পরস্পরকে জানিবার সুযোগ লাভ হয় এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয় কারণ মনে হয় অন্ধ সংস্কার অজ্ঞতা প্রসূত।

ঘনিষ্ঠ পরিচয় অনৈক্য ও বিরোধ দূর করিয়া প্রায় মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। এক সময়ে একজন ইংরাজ প্রকাশ্যে বলেন যে আমি আন্তরিক ইংরাজভাবাপন্ন। যে সমস্ত মহৎ প্রতিষ্ঠান ও প্রচলিত বিধি ইংরাজের জীবন ও স্বাধীন শাসনতন্ত্র গঠনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের আমি সত্য প্রশংসা করি।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজকার্য্য ১৮৭১—১৮৭৪।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষা দিই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই বৎসরের পাঠ্য আমাকে এক বৎসরে সমাপ্ত করিতে হয়। ভারতীয় ও ইংরাজি আইন, অর্থনীতি এবং ভারতীয় ভাষা পরীক্ষার বিষয় ছিল। কঠোর পরিশ্রমের ব্যাপার হইলেও ইহাতে ক্ষুব্ধ হই নাই। কমিশনারদের সহিত বিরোধে আমার জয় উৎসাহ বৃদ্ধি করে; তা ছাড়া পিতার মৃত্যু হওয়ায় শীঘ্র গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হই। পঞ্চান্ন বৎসর অতীত হইয়াছে; ইতিমধ্যে আমার জীবনে ও দেশের ইতিহাসে বহু বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে কিন্তু সেই পরিশ্রমবহুল দিনগুলির স্মৃতি হৃদয়ে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। সে সময় পরীক্ষা ও পুস্তক ভিন্ন কিছুই ভাবিতে পারিতাম না। এমন কি পড়িতে পড়িতে রাত্রি কাটিয়া যাইত—প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি দেখা দিত কিন্তু প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিতে পারিতাম না। পরীক্ষার সময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে আমার কোনও বিশেষ কষ্ট হয় নাই, কারণ মানসিক শক্তি দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমরা য়ুরোপের কয়েকটী দেশ ভ্রমণের সংকল্প করি এবং নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে উহা সম্পন্ন করি। প্যারি সহর দেখিয়া আমরা রাইন অভিমুখে গমন করি ও সেণ্ট গথার্ড আরোহণ করিবার পর সুইজারল্যাণ্ডের মনোরম পর্ব্বতশ্রেণি ও হ্রদ পরিদর্শন করি। সেখান হইতে ইটালি ভ্রমণ করিয়া ভেনিস্ সহরে কয়েক দিন থাকিবার পর পি এণ্ড ও জাহাজে ব্রিণ্ডিসি অভিমুখে যাত্রা করি।

কলিকাতা অপেক্ষা উন্নত স্থানেও পুলিস সময়ে সময়ে কত নির্ব্বোধভাবে কাজ করে তাহা ভার্সেলিসে ঘটিত একটী ব্যাপার হইতে বেশ বোঝা যায়। প্যারি হইতে আমরা বুরবণদের প্রাচীন রাজধানী ভার্সেলিসে একদিনের জন্য যাত্রা করি। সন্ধ্যায় ফিরিবার উদ্দেশে প্যারিগামী রেল ধরিবার জন্য তিনজনে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। য়ুরোপের অনেক সহর অপেক্ষা প্যারিতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সমাগম অধিক হয় কিন্তু ভার্সেলিসের পুলিস বোধ হয় পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় দেশীয় পোষাক পরিহিত ভারতীয় দেখে নাই। সেইজন্য আমাদের অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া তাহারা আমাদের প্রাসিয়ার গুপ্তচর মনে করে। ফরাসীরা সে সময় অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ছিল কারণ মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে ফ্রাঙ্কো প্রাসিয়ান যুদ্ধ শেষ হয়। প্যারির সাম্যবাদ বিদ্রোহে অভিযুক্ত বহু ব্যক্তির তখন বিচার হইতেছিল। প্লাট্‌ফরমে যখন বেড়াইতে ছিলাম একজন ফরাসী পুলিস কর্ম্মচারী তাহার সহিত আমাদের থানায় যাইতে বলিল। প্রথমে আপত্তি করিলেও সুবিবেচনা সাহসের অঙ্গ বিশেষ স্মরণ করিয়া তাহার অনুগমন করি। যে কক্ষে আমাদের লইয়া যাওয়া হয় সেখানে একজন কর্ম্মচারী নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনি উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমাদের দিকে দেখিলেন ও আমাদের বিদেশ পর্য্যটনের নিদেশ পত্র দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহা দেখিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না কারণ আমরাই যে নির্দ্দেশ পত্রে লিখিত ব্যক্তি তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। আমার নিকট একখানি চিঠি ছিল, সেই চিঠির নামের সহিত নিদেশ পত্রে লিখিত নাম মিলিলেও তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। যে লোকটী আমাদের গ্রেপ্তার করে তিনি ফরাসী ভাষায় তাঁহার সহিত কথা বলিলেন বটে কিন্তু আমরা কিছু বুঝিলাম না। পূর্ব্ব ব্যক্তির ন্যায় তিনিও ঠিক করিলেন যে আমরা প্রাসিয়ান গুপ্তচর।

আমরা পরস্পরের কথা বুঝি নাই বলিয়াই প্রধানতঃ এরূপ ঘটে।

আমরা যেমন ফরাসী ভাষা বুঝি নাই সেখানকার পুলিস কর্ম্মচারী ইংরাজি বুঝিতে পারেন নাই। আমার বন্ধুরা সামান্য ফরাসী ভাষা জানিতেন বলিয়া দু'একটী কথা বলিতে চেষ্টা করিলে পুলিস কর্ম্মচারীর সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তার পর আমাদের হাজতে লইয়া যাওয়া হয়। যে কয়েদ ঘরে আমাদের রাখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয় সেখানে একটী মাতালকে রাখা হইয়াছিল। তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারী আমাদের ঘরে তালা বন্ধ করিয়া দিল।

সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিন জনের পক্ষে অপ্রতুল একটী কাষ্ঠশয্যায় রাত্রি ১০টা হইতে সকাল ৯টা পর্য্যন্ত আমরা রুদ্ধ ছিলাম। কাঁটাচ্ছন্ন ঐ শয্যায় কষ্ট হইতেছিল বলিয়া বন্ধুদ্বয় কথাবার্ত্তায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দেন কিন্তু আমি নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া কোন কষ্ট অনুভব করি নাই। গভীর নিদ্রা আমাকে জাগাইবার তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে।

পূর্ব্বরাত্রে যে থানায় আমাদের পরীক্ষা করা হয় পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের সেখানে উপস্থিত করা হইলে আমরা একজন ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার জিদ ধরি। তদনুসারে ঐরূপ একজন কর্ম্মচারী আসিয়াই ব্যাপারটী বুঝিতে পারিলেন এবং আমাদের অবমান ও কষ্টের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি আমাদের পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট লইয়া গেলেন। ইনি একজন শিক্ষিত ফরাসী এবং ভাল ইংরাজি জানিতেন। তিনিও অনেকবার ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। সাম্যবাদ বিদ্রোহে অভিযুক্ত বন্দীদের বিচার দেখিবার জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে তখন লোক আসিতেছিল। প্রধান কর্ম্মচারী মহোদয় বিচার দেখিবার জন্য আমাদের আদালতে প্রবেশের অনুমতি পত্র দিতে চাহিলে আমরা ধন্যবাদসহকারে তাহা প্রত্যাখ্যান করি কারণ ফ্রান্সে থাকিবার আমাদের আর ইচ্ছা ছিল না। আমরা

ফ্রান্সের অপেক্ষা কোনও আতিথ্যপরায়ণ দেশের উদ্দেশে রেলে করিয়া যাত্রা করি। য়ুরোপিয়ান সভ্যতার লীলাভূমিতেও পুলিসের মনে কত অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহা এই ঘটনা হইতে বোঝা যায়।

য়ুরোপে আমাদের ভ্রমণ খুব দ্রুতভাবে সম্পন্ন করা হয়। বহুদিন গৃহ হইতে দূরে ছিলাম বলিয়া আমাদের জাতীয় মহোৎসব দুর্গাপূজার সময় যাহাতে কলিকাতায় আসিতে পারি সে জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম। ভেনিসের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঐতিহ্য আমাকে আকৃষ্ট করে। রাজপথগুলি সমুদ্রের দ্বারস্বরূপ এবং প্রাসাদগুলি তাহাদের প্রতি ভ্রূকুটি-কুটীল চক্ষে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। আমি যখন ডোজের (Doge) প্রাসাদ, বন্দীশালা ও ব্রীজ অব্ সাই নামক বিখ্যাত সেতু দর্শন করি তখন মনে ঐতিহাসিক স্মৃতিগুলি আসিতে লাগিল। যে বন্দী গৃহটী নেপোলিয়ান ভস্মীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সহিত পুরাকালের বহুস্মৃতি ও বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের বহু করুণ কাহিনী জড়িত ছিল। ভেনিস হইতে আমরা ব্রিণ্ডিসি যাত্রা করি এবং তথা হইতে একখানি ইটালিয়ান জাহাজে বোম্বে আসি। বোম্বে হইতে সোজা কলিকাতা আসি। এলাহাবাদে একবার নামিতে হয়, কারণ বাবু নীলকমল মিত্র আমাদের অভিনন্দন প্রদান করেন ও সেই উপলক্ষে আমি প্রথম বক্তৃতা করি। হাওড়া ষ্টেশনে কেশবচন্দ্র এবং অন্যান্য বন্ধুরা অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসেন।

গৃহে আসিয়া প্রথমে যখন মাতাকে দেখিলাম তাঁহার শরীর ও মনের উপর হিন্দু বিধবার ক্লেশজনিত শ্রান্তি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।

আমরা তিন বন্ধুই স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিতেছিলাম। কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' পত্রে লেখা হয় যে সমাজে আমরা পুনরায় স্থান লাভ করিয়াছি। মা ও ভ্রাতারা সামাজিক ভাবে আমাকে গ্রহণ করিয়া সাহসের পরিচয় দেন। পিতা যদিও সনাতনপন্থী ছিলেন না ও বহু প্রাচীন প্রথার বিরোধিতা করিয়াছিলেন তথাপি

তিনি বিলাত গমন করেন নাই বলিয়া তাঁহার অসঙ্কোচে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ ও পানাহার প্রভৃতি পিতামহকে ক্ষুব্ধ করিলেও হিন্দু সমাজ ক্ষমা করিয়াছিল।

বিলাতগমনজনিত দোষ আরও গুরুতর বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দুসমাজ তখনও ইহাতে অভ্যস্ত হয় নাই এবং বিলাত প্রত্যাগত অনেকে সম্পূর্ণ বিলাতিভাবাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া সনাতনপন্থীদের ভয় বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য অনেকে আমার পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সাহসের প্রশংসা করেন কিন্তু সমাজের সাধারণ ব্যক্তিরা আমাদের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। মর্য্যাদাসম্পন্ন কুলীন বলিয়া আমাদের খ্যাতি ছিল; যাঁহারা আমাদের সহিত আহারাদি করিতেন তাঁহারা সব ত্যাগ করিলেন। পিতার কৃতিত্ব ও আমার সাফল্যের জন্য যাঁহারা ঈর্ষা করিতেন তাঁহারা এক্ষণে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইলেন। প্রায় দেখা যায় যে দলগত ও জাতিগত বিরোধ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার উত্তম সুযোগ আনয়ন করে এবং আমি গত দু' এক বৎসরের মধ্যে এরূপ কতকগুলি ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি যেখানে ধর্ম্মবোধ আহত মনে করিবার যথার্থ কারণ হইয়াছে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সমাজের অবস্থা এইরূপ ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এক বিরাট পরিবর্ত্তন নীরবে ঘটিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা কিংবা য়ুরোপগমন এখন আর কাহাকেও জাতিভ্রষ্ট করে না। গ্রামে ব্রাহ্মণেরা এখনও এ বিষয়ে হয়ত দ্বিধা করেন কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির যে কেহ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে গিয়াও সামাজিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। কালে ব্রাহ্মণগণ যে এরূপ ভাবাপন্ন হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকে হিন্দুসমাজকে অচল ও সনাতন বলিয়া নিন্দা করেন কিন্তু এ কথা সত্য নয়। ইহা মৃদু অথচ নিয়মিত গতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং বিশ্ব শক্তির আহ্বানে সাড়া দিতেছে। অগ্রগতির রথ যত অগ্রসর হয় তত স্বীয় বিশিষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। এইরূপে এক

সময় সেই সঞ্চিত শক্তিসহযোগে ইহা অত্যন্ত দ্রুতবেগে জয়যাত্রায় অগ্রসর হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আমি কলিকাতা পৌঁছাই। কলিকাতার জনসাধারণ সাতপুকুর বাগানে আমাদের অভিনন্দন প্রদান করেন। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কিশোরী চাঁদ মিত্র এই সভার আয়োজন করেন। সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রথম সিভিলিয়ান, আমরা দ্বিতীয় দল। সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বে প্রদেশে নিযুক্ত হন কিন্তু আমরা বাঙ্গালা দেশে নিযুক্ত হই ও একই বৎসরে তিনজনে সাফল্যলাভ করি বলিয়া সাধারণের মনে ইহা গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কলিকাতার জনসাধারণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাতপুকুর ও বেলগেছিয়া বাগানে তখনকার দিনে সাধারণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। মল্লিকরা ও পাইকপাড়ার রাজারা এই বাগানের মালিক ছিলেন। তাঁহারা বিশিষ্ট ধনী ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এক্ষণে অপর ব্যক্তিরা তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়াছেন; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা দেশের কর্ম্ম ও চিন্তাধারা গঠনে তাঁহাদের যোগ্যস্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় প্রায় একমাস থাকিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২২শে নভেম্বর আমি শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কর্ম্মে যোগদান করি। শ্রীহট্ট তখন বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৪ সালে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই বাঙ্গালা ভাষাভাষী জিলাটীকে নবগঠিত আসাম প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করা হয়। আমার পৌঁছিতে চারি দিন লাগে। আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড সাহেব এংলো ইণ্ডিয়ান ছিলেন। শীঘ্রই বুঝিলাম যে তিনি জনপ্রিয় নহেন। আমাকে যথেষ্ট কার্য্যের চাপ দিয়া মুরব্বীজনোচিত আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে তিনি ভাল বাসিতেন।

শীঘ্রই বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের

ক্ষমতা লাভ করিলাম কিন্তু আমার এই সাফল্যই আমার ক্ষতিসাধন করে। আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের পুরাতন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পসফোর্ড সাহেব (**Mr. Posford**) ও আমি উভয়ে বিভাগীয় পরীক্ষা দিই কিন্তু কেবল আমি উত্তীর্ণ হই। শ্রীহট্টের ন্যায় ক্ষুদ্র জায়গায় আমার সাফল্য ও তাঁহার বিফলতার সংবাদ কাহারও অগোচর রহিল না। এংলো ইণ্ডিয়ান হইলেও সাদারল্যাণ্ড সাহেব জাতিবিদ্বেষপূর্ণ ছিলেন এবং সেইজন্য আমার সাফল্য তিনি সুনজরে দেখেন নাই পরন্তু শাসক-সম্প্রদায়ের মর্য্যাদাহানিকর মনে করেন। বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তখন পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইত বলিয়া আমার বেতন বৃদ্ধি হয় ও প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা পাই। সাদারল্যাণ্ড সাহেবের অনুরোধে পস্‌ফোর্ড সাহেব বিভাগীয় পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

এই সময় এণ্ডারসন সাহেব শ্রীহট্টের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হন। আমরা উভয়ে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হই। এণ্ডারসন সাহেবের সহিত সাদারল্যাণ্ড সাহেবের বনিত না। এই সমস্ত ক্ষুদ্র হিংসা ও বিবাদের সহিত পরিচয় না থাকায় আমি সরলভাবে এণ্ডারসন পরিবারের সহিত বন্ধুত্ব করি। ইহা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত আমার বিচ্ছেদ আরও ঘনীভূত করিয়া অসুখের সূত্রপাত করে। প্রতিদিন কোন না কোন ব্যাপারে জবাবদিহি করিবার জন্য আমাকে ডাকা হইত কারণ উপরিস্থ কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলে অধস্তন কর্ম্মচারীকে বহু প্রকারে উত্যক্ত করিতে পারে। এই অপ্রিয় মনোভাবের সৃষ্টি অবধি আমার অবস্থা কষ্টকর হইয়া উঠে।

অবশেষে নৌকা চুরি অভিযোগে অভিযুক্ত যুধিষ্ঠির নামক এক ব্যক্তির মোকদ্দমায় ব্যাপারটী চরমে উঠে। প্রথমে মামলা পস্‌ফোর্ড সাহেবের এজলাসে যায়; পরে ইহা আমার নিকট আসে। আমার কার্য্যের ভীড় অত্যন্ত থাকায় কিছুদিন ইহা মুলতবি রাখা হয়। ১৮৭২

খৃষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আমার স্বাক্ষরযুক্ত একটী আদেশ এই মর্ম্মে প্রকাশিত হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফেরারী বলিয়া ঘোষণা করা হউক। বস্তুতঃ ঐ ব্যক্তি ফেরার হয় নাই। মোকদ্দমাটীর বহুদিন মুলতবির কারণ না দেখাইবার জন্য ঐ আদেশ প্রকাশিত হয়। আদালতস্থ কর্ম্মচারীরা তিরস্কার এড়াইবার জন্য এই কৌশল সময়ে সময়ে অবলম্বন করিত। সাধারণতঃ কর্ত্তৃপক্ষ আমার ন্যায় নূতন কর্ম্মচারীর মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব পেস্কারের দোষ বলিয়া গণ্য করেন কারণ ইহা পেস্কারেরই কার্য্য। বহু দলীলপত্রাদির সহিত আমি ঐ আদেশযুক্ত কাগজটীও স্বাক্ষর করি। অন্য একটী বিষয়ের বিবৃতি দিবার সময় আমি উক্ত মোকদ্দমার মুলতবি রাখার হেতু প্রদর্শন করি। জ্ঞাতসারে ফেরারী ঘোষণা স্বাক্ষর করিলে ঐরূপ ভুল কিছুতেই হইত না কারণ তাহা হইলে আমি স্মরণ করিতাম যে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ফেরার রূপে প্রকাশিত হওয়ায় আর কোনও জবাবদিহির প্রয়োজন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ঐ সংক্রান্ত নথীপত্র চাহিয়া আমাকে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিতে বলিলেন। আমি বিবৃতি প্রদান করিলে তিনি জেলা জজকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। জেলা জজ হাইকোর্টে লিখিলেন এবং গভর্ণমেণ্টকে সমস্ত ব্যাপার জানান হইল। ঘটনাটী অনুসন্ধানের জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত হয়।

তিনজন য়ুরোপীয় রাজপুরুষ লইয়া এই কমিশন গঠিত হয়। আমার বিরুদ্ধে চৌদ্দ দফা অপরাধ আনা হয়; পরে এই চৌদ্দটী দুইটীতে ঠেকে। প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির পলাতক নয় জানিয়াও আমি অন্যায় ভাবে তাহার নাম ফেরারি দলে দিবার আদেশ দিই এবং দ্বিতীয়তঃ জবাবদিহি করিবার সময় মিথ্যাপূর্ব্বক নিজে কিছুই জানি না বলি। আমার বিরুদ্ধে আর একটী অভিযোগ করা হয় যে জবাবদিহি এড়াইবার জন্য যুধিষ্ঠিরের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করি এবং তাহাকে মুক্তি দিই। *

* ইহা সকলেই জানেন যে মোকর্দ্দমা মুলতুবী করিতে হইলে হাকিমদের সাধারণতঃ পেস্কারের উপর নির্ভর করিতে হয়। পেস্কার যদি বলেন যে আসামী

এই বিষয়টী কলিকাতায় শুনানির জন্য এবং আমার পক্ষে আইনজীব নিযুক্ত করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখি। উভয় প্রার্থনা ব্যর্থ হয়। কমিশনারগণ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতা আসিয়া কমিশনের বিবরণী পাই এবং পরে জানিতে পারি যে গভর্ণমেণ্ট মাসিক ৫০৲ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন।

ভারতীয় সমাজে এই ব্যাপার যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। দেশের সকলেই মনে করেন যে ভারতীয় না হইলে এইরূপ ঘটিত না কারণ ভারতীয় হইয়া সিভিল সার্ভিসে প্রবেশই আমার প্রধান অপরাধ। বহুবৎসর পরে একজন ছোটলাট ইহার নিন্দা করেন। আমার পরিচিত আর একজন ছোটলাট স্যর এড্ওয়ার্ড বেকার (Sir Edward Baker) মহামতি গোখেলের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "সুরেন্দ্রনাথ আমার হৃদয়ে একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আমরা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অন্যায় করিয়াছি কিন্তু তথাপি তিনি বিদ্বেষ পোষণ করেন নাই।" ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা হিউম (Mr Hume) সাহেব ১৮৯৩ সালে 'ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকায় ঐরূপ মন্তব্য করেন।

কর্ম্মচ্যুতির আট বৎসর পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমাকে কলিকাতায় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জাষ্টিস্ অব দি পীস্ করা হয় এবং প্রথম শ্রেণীর

ফেরার তাহা হইলে হাকিমের মোকর্দ্দমা মুলতুবি করার হুকুম দেওয়া অসঙ্গত নহে। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড সাহেব তিলকে তাল করিয়া সুরেন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে জেলা জজও হাইকোর্টে অভিযোগ করেন এবং তাহার ফলে একটী কমিশন বসিয়া সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। কিন্তু ইহার যথার্থ কারণ যে সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন ও সাদারল্যাণ্ড সাহেব যে আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধীনের কর্ম্মচারীদের মত সুরেন্দ্র নাথও তাঁহার তোষামোদ করিবেন তাহা তিনি করিতেন না। এ বিষয়ে অধ্যায়ের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পিত হয়। * আমার এই সম্মান প্রদানকারীগণ তখন ভাবিয়াছিলেন যে হয় আমি সিভিল সার্ভিস হইতে অপসারিত হইবার সময় যে অপরাধে অভিযুক্ত হই তাহা আমি করি নাই অথবা আট বৎসরে আমার পূর্ব্ব স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন সিদ্ধান্তটী যুক্তিযুক্ত তাহা বিচার্য্য বিষয়।

পরবর্ত্তী ঘটনা হইলেও এখানে বলা যাইতে পারে যে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের নিয়মানুসারে কর্ম্মচ্যুতির জন্য আমি নির্ব্বাচনের অযোগ্য হই। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদপ্রার্থী হইলে প্রথমে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ও পরে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই প্রতিবন্ধক অপসারিত করেন।

---

* সুরেন্দ্রনাথকে কলিকাতার অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ করিবার সময় লেডি ব্যানার্জ্জি ঘোর আপত্তি করেন, বলেন যে সরকারী কার্য্য হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহাই আবার গ্রহণ করিবে? তাঁহাকে কলিকাতা হইতে অনেক বন্ধুবান্ধব ব্যারাকপুর গিয়া বুঝান যে, ইহাতে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দোষ স্বীকারকরিতেছেন ও তাঁহার এই পদগ্রহণে সুরেন্দ্রনাথের জয় ও গভর্ণমেণ্টের পরাজয় স্বীকৃত হইতেছে—সম্পাদক।

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচ্যুতি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সুরেন্দ্র নাথ ও তাহার সহধর্ম্মিনী উভয়েই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ সাধারণতঃ ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিতেন না। ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত নিজেদের মান রাখিয়া সমান ভাবে চলিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাদারল্যাণ্ড সাহেব খাঁটি ইংরাজ ছিলেন না। তিনি ইহাদের উপর মুরব্বিয়ানা করিতেন ও তাঁহাদের সমকক্ষতা পচ্ছন্দ করিতেন না। বিভাগীয় পরীক্ষায় যখন সুরেন্দ্র নাথ প্রশংসার সহিত অল্প সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া বেতন বৃদ্ধি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেন এবং তদুপরিস্থ সহকারী ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া নিম্নপদে রহিলেন, ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব পর্য্যন্ত অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন ও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল। এণ্ডারসন নামে ঐ জেলার যে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তিনি খাঁটি ইংরাজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁহাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করা বা দল পাকান পছন্দ করিতেন না ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল ও তাঁহার স্ত্রীকেও তিনি যথোচিত সম্মান করিতেন। স্বনামধন্য বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ঐ সময় শ্রীহট্ট হাই স্কুলে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে ঘোড়দৌড়ের বৈঠকে (Race meeting এ) লেডি ব্যানার্জ্জিকে উচ্চ পদের ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মেমদের মধ্যে আসন না দিয়া স্থানান্তরে আসন দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ব্রাহ্মণ কন্যা ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। তিনি ইহাতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আসন গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যান। মুখে মুখে এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ইহাতে অপমানিত হইয়াছেন মনে করেন। এইরূপ সব কারণে সাদারল্যাণ্ড সাহেব সুরেন্দ্রনাথের উপর অধিকতর বিদ্বেষপ্রবণ হইয়া তাঁহার সরকারি কাজের ভুল ভ্রান্তির ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করিয়া ভগবানের কৃপায় ভারত মাতাকে পুনর্জীবিত ও তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিবার জন্যই যেন তিনি সুরেন্দ্রনাথকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করেন। বাহ্যিক অমঙ্গলের অভ্যন্তরে যে অনেক সময় মহামঙ্গল প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে তাহা এই ঘটনা একটি জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ।

/এই প্রসঙ্গে স্বদেশী যুগের একটি ঘটনা বিবৃতি করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে উপরোক্ত ইংরাজি তথ্যটি (Out of evil cometh good) কতটা সত্য ও সারবান। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আমি তখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ ও স্বদেশীগ্রহণ ও বিদেশীবর্জ্জন সম্বন্ধে প্রচার ও আন্দোলন করিয়া বেড়াই। দেশ নায়ক সুরেন্দ্রনাথের তখন অখণ্ডপ্রতাপ। গোখলে যে বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গলা যা আজ ভাবে, সমগ্র ভারত কাল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয় সে এই সময়ে। সমগ্র ভারত তখন ঐ আন্দোলনে তোলপাড় হইতেছে। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন, রাজকর্ম্মচারীরাও সর্ব্বদা শশঙ্কিত, কখন কি হয়। এইরূপ সময় হাইকোর্টের জজ প্রিনসেপ্ সাহেব (Sir Henry Thoby Prinsep) ডান সাহেব (Mr. A M. Dunne) ব্যারিষ্টারের দ্বারায় আমাকে জজ সাহেবের খাস কামরায় দেখা করিবার জন্য বলিয়া পাঠান। আমি গিয়া দেখা করিলে জজসাহেব ফৌজদারি আদালতের কার্য্যবিধির সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী সম্বন্ধে কথা পাড়েন ও বলেন, তুমি কি জান যে সুরেন্দ্র নাথকে কর্ম্মচ্যুত করার জন্য আমি অনেকটা দায়ী, কারণ যে কমিশন বসে তাহার আমি মুখপাত্র ছিলাম। তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছি। কাজে থাকিলে এতদিন হয় ত তিনি হাইকোর্টের জজ কি কমিশনার হইতেন ও ভারতে এরূপ অনর্থ ঘটিত না। আমি বলিলাম, অনর্থ কেন, আপনার এই ভুলে এদেশের সবিশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে ও সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মফলে ভারত পুনর্জীবিত হইয়া একটি মহাজাতিতে পরিণত হইবে। বর্ত্তমান ভারত ইতিহাসে এই মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে আপনি উপযুক্ত স্থান পাইবেন। তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট না হইয়া উচ্চহাস্যপূর্ব্বক আমার করমর্দ্দন করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। বহুদিন পরে আজ সেই প্রতিশ্রুতি আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি। যো. চৌ./

চতুর্থ অধ্যায়।

১৮৭৫—১৮৮২।

আমার বিচারের জন্য নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাই এবং আমাকে জানান হয় যে আমার কর্ম্মচ্যুতির জন্য তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন। পুনরায় বিলাত গিয়া ইণ্ডিয়া অফিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিচারের আবেদন করিতে মনস্থ করি। তদনুসারে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এপ্রিলের মধ্যভাগে লণ্ডনে পেঁ†ছাই। সেখানে পেঁ†ছিয়াই ইণ্ডিয়া অফিসের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করি। কয়েকজনের ব্যবহার অত্যন্ত উদাসীন ও সহানুভূতিশূন্য দেখিয়া বুঝিলাম যে তাঁহারা কমিশনের রিপোর্টের বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক। পেঁ†ছিবার কয়েক সপ্তাহ পরে আমাকে সরকারিভাবে জানান হইল যে আমি সিভিলসার্ভিস হইতে অপসারিত হইয়াছি।

জীবনের একটী অধ্যায় সমাপ্ত হইল। সংগ্রাম করিয়া পরাজিত হইলাম এবং উচ্চ রাজকর্ম্মের আশা বিলুপ্ত হইল। তখনকার স্মৃতি আজও স্পষ্ট আছে। বোধ হইল যেন ইহা শান্তির জন্যই হইয়াছে। কঠোর আঘাত পাইলেও এক দুর্ব্বহ দৈহিক ও মানসিক কষ্ট হইতে যেন অব্যাহতি পাইলাম। আমি আমার ভাগ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম এবং যেন ইহাই আশা করিতেছিলাম। মিষ্টার বি মুখার্জ্জির বাটীতে একটী সান্ধ্যভোজ হইতে কেণ্টিস্ টাউনে আমার বাসায় ফিরিয়া গিয়া গ্যাসের স্তিমিত আলোকে যখন আমি আমার কর্ম্মচ্যুতির সরকারি পত্রখানি পড়িলাম তখন যেন আপনা হইতেই বলিয়া উঠিলাম 'মৃত্যুর তিক্ততা আজ হইতে তিরোহিত হইল'। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলে। প্রথমে সাদারল্যাণ্ড সাহেবের সহিত এবং পরে গভর্ণমেণ্টের সহিত এই

বিরোধ চলে ; যখন সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিল তখন্ যেন সত্যই শান্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

জীবনের সেই ঘোর সঙ্কটকালে আমি একবারও নিরাশ হই নাই। দূরে অবস্থান করিয়াও যে আমার এই আঘাতের অংশ গ্রহণ করিতেছিল অথচ ইহার চাপে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই আমার সেই সহধর্ম্মিণীর কথা সময়ে সময়ে মনে পড়িত। অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলাম এবং যথাসম্ভব উজ্জ্বল করিয়া ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করিলাম। পূর্ব্বেই মিড্‌ল্ টেম্পেলে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেখানকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া ব্যারিষ্টার হইতে মনস্থ করিলাম। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমার এ আশাও ফলবতী হইবে না।

ক্রমে ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হইবার সময় হইল। তখন ১৮৭৫ সালের এপ্রিল অথবা মে মাস। আমার নাম প্রস্তাব করা হইলে কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক এক আপত্তি উত্থাপিত হয়। সিভিল সার্ভিস হইতে আমার অপসারণ একটী বিশেষ আপত্তি বলিয়া গণ্য হয় এবং তজ্জন্য আমাকে ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন। প্রবীন ব্যারিষ্টার কর্কেন সাহেব আমার ব্যাপারে সবিশেষ মনোযোগ দেন। এক সময়ে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান ব্যারিষ্টার ছিলেন। বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িত হইলেও যুবকের উৎসাহ লইয়া তিনি আমার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁহার ধরণের লোকের সংখ্যা দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সিভিল সার্ভিসের ন্যায় ব্যারিষ্টারির আশাও নির্ম্মূল হইল। এইরূপে উচ্চ আশাপূরণের সমস্ত পথ বন্ধ হইল।*

---

* সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যবহারজীবের পথ বন্ধ হওয়াও ভগবানের নির্দ্দেশ বলিয়া মনে হয়—সম্পাদক।

জীবনের পরিধি তখন সত্যই তমসাচ্ছন্ন। বন্ধুরা সকলে আমার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন। এমন কি হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল ঐরূপ মত পোষণ করেন। অধুনা স্বর্গত আমার এক বন্ধু—যিনি এক সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন—অষ্ট্রেলিয়ায় নাম ভাঁড়াইয়া কোনও কার্য্য যোগাড় করিয়া লইবার আমাকে উপদেশ দেন। ধৈর্য্যের সহিত বন্ধুদের সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করি কিন্তু আমি নিরাশ হই নাই কিম্বা আমার যৌবনোচিত প্রফুল্লতা জীবনের পুঞ্জীভূত মেঘের অন্তরালে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় নাই। বিনাশের দ্বারে দাঁড়াইয়া আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মের পূর্ব্বাভাষ পাইলাম। বুঝিলাম ভারতীয় বলিয়াই আমাকে এই দুঃখভোগ করিতে হইল। আমার জাতি বিচ্ছিন্ন শাসন কার্য্যে মতপ্রকাশের কোনও অধিকার নাই বলিয়াই ত দুরবস্থা ঘটিল। যৌবনের উত্তপ্ত ভাবাবেগ দিয়া বো... স্বদেশে আমরা ক্রীতদাসের জীবনযাপন করিতেছি। ... যে ব্যক্তিগত অন্যায় আচরণ করা হইল তাহা আমার জাতী... পরিচায়ক বলিয়া বুঝিলাম। ভবিষ্যতে আমার ন্যায় অ... করিবে। যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্বীয় স্বার্থ রক্ষা... ততক্ষণ এই ব্যবহার ভবিষ্যতেও করা হইবে। অ... ভ্রূকুটিকুটিল দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমি আমার অসহায়... ভাবে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি তাহাই ভাবিতে...

১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে পরবর্ত্তী বৎস... আমি বিলাতে ছিলাম। এই তের মাস কাল হ্যামটন... মোল্‌সি (East Mclesey) গ্রামে আমার বাসায়... সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করি। প্রাতরাশের প... রাত্রি ৮টায় সান্ধ্যভোজের সময় পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কা... ভবিষ্যৎ কার্য্যে উৎসাহ ও সাহায্য দিতে পারে এই...

করিতাম ও বিস্তৃত গ্রন্থ সকলের সারাংশ লিখিয়া লইতাম। এখনও ঐগুলি আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। মাঝে মাঝে কেবল ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইতিকর্ত্তব্যতা ঠিক করিতে লণ্ডনে বন্ধুদের নিকট যাইতাম। কিন্তু পুস্তকেই আমি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম এবং স্বর্গগত মহামানবদের সাহচর্য্যে অশেষ তৃপ্তি পাইতাম।

শ্রমবহুল এই একটী বৎসর আমার জীবনে অশেষ মূল্যবান, কারণ তখনই আমি নিজেকে গঠন করি। বিষাদ কাটিয়া যাইতে লাগিল—আমি তখন এক নূতন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। পতিত ও দুর্ভাগ্য মাতৃভূমির সেবায় নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগের উজ্জ্বল চিত্র সম্মুখে দেখিলাম। ক অদৃশ্য উৎসাহের তাড়নায় তখন আমি কঠোর পরিশ্রম করিতে ই। নূতন আশায় আমার প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল। মনে এখনও আমার কার্য করিবার যথেষ্ট পথ আছে—সম্ভবতঃ উচ্চতর কার্য্যক্ষেত্র আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। জীবনের অভ্যুদয়—উন্নততর জীবন ও পুনরুত্থান মৃত্যুর আমার জীবনে তাহাই ঘটিল।

লে জুন মাসে আমি গৃহে প্রত্যাগমন করি। আমার ীত সকলেই আমাকে বিনষ্ট ভাবিয়াছিলেন। আমার ামাকে আনন্দোজ্জ্বলমুখে অভ্যর্থনা করেন। আমার পত্নীর স্মৃতির প্রতি এইখানে আমি আমার শ্রদ্ধা ধুনা তাঁহার অবস্থার রমণীরা যেরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ না পাইয়াও প্রখর বুদ্ধি, সহানুভূতি ও সাহসের । আমার এই বিপদে তিনি স্থিরভাবে আমার বারও তিনি ভাবেন নাই যে আমাদের সর্ব্বনাশ র প্রতি একবারও খেদসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ না ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস ছিল।

১৮৭৫ সালে জুন মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া কি ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিব, কিরূপেই বা স্বদেশের উপকার সাধন করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। সমস্ত পথ তখন বন্ধ। আমি জনসাধারণের ব্যাপারে যোগ দিতে আরম্ভ করিলাম। আমার কলিকাতা প্রত্যা-গমনের পরেই মেডিকেল কলেজে মাদকনিবারণী সভার এক অধিবেশন হয়। ঐ সভায় বিরাট জনসমাগম হয়। সে সময় মিতাচারের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। প্যারীচরণের পরিশ্রমের ফলে অমিতাচারের বিষময় পরিণাম হইতে ভবিষ্যবংশকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেশবাসী অনুভব করেন। সেইজন্য ঐ সভায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। আমাকে সেই সভায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা কলিকাতায় কোনও বিরাট জনসভায় ইহাই আমার প্রথম আমার বক্তৃতা এত হৃদয়গ্রাহী হয় যে পরদিন প্রাতঃক আমাকে বলেন যে আমার বক্তৃতা আমাকে দেশের বিদ্বান সমপর্য্যায়ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শীঘ্রই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে মে কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেন। আম পূর্ব্বেই আমাকে ছাত্রদের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পদটী লাভ করা সহজ হয়। বেতন মাত্র দুইশত টা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে যাহা পাইতেছিলাম, তাহার অর্দ্ধেকেরও কিন্তু কার্য্য পাইয়া আনন্দিত হইলাম এবং যুবকদের কল্যাণকর বীর্য্য ও দেশাত্মবোধ জন্মাইয়া দিতে সর্ব্ব হইলাম। পাঠ্যপুস্তকের অধ্যাপনা অপেক্ষা এব অধ্যাপনার সময় আমার মনে জাগরূক থাকিত। গঠিত হইয়াছিল; আমি ইহার একজন বিশিষ্ট প্রত্যেক কলেজে ইহার শাখা স্থাপন করিতে করিতে লাগিলাম।

কলিকাতার ছাত্রসমাজে সত্বর এক নূতন স্পন্দন আনয়নে আমি সাহায্য করি। কলিকাতা, খিদিরপুর, উত্তরপাড়া ও অন্যান্যস্থানে আমি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিই। ভারতীয় একতা, ইতিহাস অধ্যয়ন, ম্যাট্‌সিনির জীবন, (Mazzini) শ্রীচৈতন্য, উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করি। বক্তৃতা করিবার জন্য সকলেই আমাকে আমন্ত্রণ করিতেন এবং আমিও সম্ভব হইলে সর্ব্বত্র যাইতাম। এইরূপে ছাত্রসমাজও আমার মধ্যে এক অতি প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—ইহা আমার জীবনের এক পরম সম্পদ। বি চক্রবর্ত্তী, স্বামী বিবেকানন্দ, নন্দকিশোর বসু, এস কে আগস্তি প্রমুখ ব্যক্তিরা তখন নিয়মিতভাবে সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিটি কলেজ স্থাপিত হয়। কুচবিহারের [illegible]রাজার সহিত কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহের ফলে ব্রাহ্মসমাজে [illegible]তভেদ ঘটে। এই মতভেদের ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও [illegible] প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, [illegible] দাস এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতারা এই বিরোধীদলের প্রাণস্বরূপ [illegible] সিটি কলেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই আমাকে সিটি স্কুলে [illegible]রিতে অনুরোধ করা হয় এবং আমি সানন্দে যোগ দিই [illegible] শুধু যে আমার আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু [illegible] মিশিবার অধিক সুযোগ লাভ হইল।

[illegible] কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত—প্রত্যহ চারি ঘণ্টাকাল [illegible] ছাত্রদের মধ্যে প্রচারকার্য্য ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান [illegible] কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু এই পরিশ্রমের জন্য [illegible] করি নাই। কার্য্যের উন্মাদনা আমার জীবনের [illegible] ইহাই আমাকে নৈরাশ্য, অসাফল্য ও দুঃখের গ্লানি [illegible]থয়াছে। এখনও পঁচাত্তর বৎসর বয়সে কর্ম্মের [illegible]ধিক অভিভূত করে যে কেবল স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে [illegible] বাধ্য হই।

ত্রিপুরা রাজের অধীনে মাসিক সাতশত টাকা বেতনে সেক্রেটারি পদ প্রাপ্তির প্রস্তাব এই সময়ে আসে। এই পদ গ্রহণ করিলে আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্নদিকে যাইত। তখন আমি মাত্র তিনশত টাকা বেতন পাইতেছিলাম ; তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির আশা অল্পই ছিল। তথাপি আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করি নাই। আমি প্রস্তাবটী এই ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম যে ভাল কিংবা মন্দ যে জন্যই হউক একবার যখন জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে তখন কোনও দ্বিধা অনাবশ্যক।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে আমি মেট্রপলিটন্ কলেজে অধ্যাপনা ত্যাগ করি। আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে সিটি কলেজের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া পদত্যাগ করি।

একমাস পরে ফ্রি চার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ রবার্টসন সাহেব ইংরাজী অধ্যাপকের পদগ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ কলেজে অধ্যাপনা করার পর পদত্যাগ করিতে বাধ্য হই কারণ তখন আমার নিজের প্রতিষ্ঠিত কলেজে অধিক সময় দিবার প্রয়োজন হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিডেন্সি ইনষ্টিটিউসন নামে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করি এবং ইহাই রিপণ কলেজের বীজস্বর আমি যখন বিদ্যালয়টীর ভার গ্রহণ করি তখন মাত্র দুইশত ছ অধ্যয়ন করিত। বিদ্যালয়টীকে আমি সম্পূর্ণরূপে পুন এবং কালে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ইণ্টার-মিডিয়েট, f ও বি-এল পড়াইবার অনুমতি লাভ করে। লর্ড পূর্ব্বে তাঁহার অনুমতিক্রমে এই বিদ্যামন্দিরের

রাখা হয়। এক্ষণে ইহা একটী প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট কলেজরূপে গণ্য হইতেছে। ইহার সংলগ্ন একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় বর্ত্তমান। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৫০০ শত ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রতিষ্ঠানটীর একটী নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি ইহার উপর কোনও স্বত্ব রাখি নাই এবং একটী ট্রাষ্টী দল নিয়োগ করিয়া জনসাধারণের উপর ইহার ভার ন্যস্ত করিয়াছি।

১৮৭৫ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলাম। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আমাকে প্রায় কলিকাতা ও দিল্লী যাইতে হইত বলিয়া আমাকে অধ্যাপনাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত আমি শিক্ষকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করি কারণ ছাত্রদের আমি স্নেহ করিতাম ও তাহাদের সাহচর্য্যে আনন্দ লাভ করিতাম। স্বদেশী আন্দোলনের সময় একবার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম "ছাত্রজীবন গঠনে আমি যদি সাহায্য করিয়া থাকি ছাত্রগণও আমার জীবন গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। আমি যদি তাহাদের আত্মোৎসর্গ করিতে উৎসাহিত করিয়া থাকি তাহারাও আমাকে যৌবনোচিত শক্তিদ্বারা পূর্ণ করিয়াছে"। আমি তাহাদের সাহচর্য্যে তারুণ্য লাভ করিয়াছি এবং তাহাদের দৈনন্দিন সংস্পর্শে বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের গুণলাভ করিয়াছি। অক্সফোর্ড মিশনের স্মিথ্ সাহেব ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যখন জেলে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন তখন তিনি ছাত্রসমাজের উপর আমার প্রভাবের প্রশংসা করেন। আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলাম যে আমি তাহাদের ভালবাসি, তাহাদের আনন্দে আনন্দিত ও দুঃখে দুঃখিত হই, তাহারা আমাকে আপনার ভাবে।

এক পূতবৃত্তিরূপে গ্রহণ করি। বিভিন্নকার্য্যে

মনোনিবেশ করিলেও অধ্যাপনা কার্য্য আমি বিশেষ পছন্দ করিতাম। সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইয়া কখনও ক্লাসে যাইতাম না। কখনও এরূপ হইত যে যাহা গৃহে বুঝিতে পারি নাই ক্লাসের মধ্যে ছাত্রদের সাহচর্য্যে আসিয়া পড়াইতে পড়াইতে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটী আকর্ষণী শক্তি আছে। যে সমস্ত শিক্ষক স্বীয় কার্য্যে অনুরাগী তাঁহারাই এই আকর্ষণী শক্তি অনুভব করেন। একদা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম "রাজনৈতিক কার্য্য শিক্ষাকার্য্যের ন্যায় প্রয়োজনীয় হইলেও ইহার তুলনায় ক্ষণস্থায়ী। শিক্ষকগণ যে ভবিষ্যৎ রাজ্যের কর্ণধারক ও নায়ক তাহা চিরস্থায়ী। ইহা এক স্বর্গীয় ও পবিত্র বৃত্তি—আমি ইহার অপেক্ষা মহত্তর কার্য্যের কথা জানি না। কিন্তু খুব অল্প শিক্ষকই তাঁহাদের দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য করেন। ভবিষ্যত নাগরিকগণই কেবল বর্ত্তমানের কার্য্যাবলি রক্ষা করিতে সমর্থ। ক্রীশ্চান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছিলেন "শিশুদের আমার নিকট আসিতে দাও।" তিনি কঠোর প্রাণ ব্যক্তিদের অনুরোধ করেন নাই ; জীবনের দুঃখকষ্ট যাহাদের কঠোর করে নাই, এরূপ কোমলপ্রাণ মানবদের তিনি উল্লেখ করেন।

আমার নিকট অধ্যাপনা ও রাজনৈতিক কার্য্য সংশ্লিষ্ট বলিয়া বোধ হইত। জাতীয় কার্য্যে যুবকদের আগ্রহ জন্মাইতে পারিলেই দেশের রাজনৈতিক জীবন অগ্রগতি লাভ করিতে পারে। ১৮৭৫ সালে বাঙ্গালা দেশে ছাত্রেরা রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। একদিকে সেই ঔদাসীন্য হইতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার ও অপর দিকে উৎকট মতবাদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলাম। এক নূতন প্রেরণা ছাত্রদের মধ্যে আনিবার মনস্থ করিয়াই ছাত্র সংসদ গঠনে সাহায্য করি।

এই গঠনকার্য্যে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় আমার সহিত মিলিত হন। কয়েক মাস পূর্ব্বে বসু মহাশয় বিলাত হইতে প্রত্যাগমন

করেন এবং কলিকাতায় ছাত্র সংসদ গঠন করেন। তিনি এই সংসদের সভাপতি হন। বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানকার জেলা বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ইণ্টারমিডিয়েট্, বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর কেম্ব্রিজে গিয়া প্রথম ভারতীয় রাংলার হন এবং অষ্টাদশ স্থান অধিকার করেন। তিনি নিপুণ বাগ্মী ছিলেন। বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসানের এক সভায় তিনি এরূপ বাগ্মিতা প্রকাশ করেন যে ইহা শুনিয়া ফসেট সাহেব (Mr. Fawcett) বলেন যে এমন কি পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্সেও তাঁহার ন্যায় বক্তা অধিক নাই। এরূপ কৃতী ব্যক্তির নিকট দেশবাসী অনেক প্রত্যাশা করিতেছিল। আনন্দমোহন বসু দেশবাসীর সে আশা পূর্ণ করেন। হাইকোর্টে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি হইতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়াছিল স্বদেশের সেবায়। ব্যবসায়ের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমি যখন ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছিলাম ও তাহাদের মধ্যে এক নূতন জীবনের স্পন্দন জাগাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম সেই সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিমূলক একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া দেশের কার্য্যে তাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হই। অবশ্য মনস্বী কৃষ্ণদাস পালের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান নামক একটী প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান ছিল কিন্তু ইহা প্রধানতঃ জমিদারগণের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল। কোন রাজনৈতিক আন্দোলন কিম্বা জনমত গঠন ইহার কর্ম্মসূচির অন্তর্ভূত ছিল না। সেইজন্য গণপ্রতিনিধিত্ব দাবী করিবার উপযুক্ত আর একটী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের নেতারাও ইহার প্রয়োজনয়তা স্বীকার করেন এবং মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ নেতারা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক সভায় উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এখানে আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠানটীর সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসানের সম্বন্ধ চিরকাল মধুর ছিল। বাঙ্গালার তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণদাস পালের দৃষ্টান্ত ও প্রভাবের জন্য ইহা সম্ভব হয়। আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই প্রতিষ্ঠান গঠনে আমার স[illegible] সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠান গঠনে আর একজন অনুরাগী কর্ম্মী আমা[illegible] সাহা[illegible] করেন। তিনি তখন জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন ন[illegible] এবং [illegible] হয় এখনও তাঁহার স্মৃতি সাধারণের মন হইতে মুছিয়া গি[illegible] দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ করেন এবং তরু[illegible]

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্ম সমাজে যে মতবিরোধ ঘটে তাহাতে তিনি বিরোধী দলের সহিত যোগ দিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। সেইজন্য যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, মনে প্রাণে তাহাতে আত্মনিয়োগ করিতেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান গঠনে তিনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং যতদিন স্বাস্থ্য ও শক্তি ছিল ততদিন আন্তরিক অনুরাগের সহিত প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতিকল্পে কার্য্য করেন। সেইজন্য আজও তাঁহার বন্ধুরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার স্মৃতিপূজা করে।

এক বৎসর আয়োজনের পর ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান স্থাপিত হয়। অনেক আলোচনার পর এই নাম স্থির হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্রস্বরূপ এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন সাধারণের সমর্থনের অভাবে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা ঐ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটীর নাম 'বেঙ্গল এসোসিয়েসান' রাখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। আমরা ভাবিলাম এই নাম আমাদের কার্য্যকে সঙ্কুচিত করিবে, কারণ আমরা সমগ্র ভারতের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটী গড়িতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দ তখন (Mazzini) ম্যাট্‌সিনির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এক সঙ্ঘবদ্ধ ভারতের ছবি দেখিতেছিলেন। সেইজন্য এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটীর নাম ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান রাখা হয়।

উদ্বোধন সভায় একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন [illegible]পাধ্যায়ের পর তদানীন্তন ভারতীয় ক্রিশ্চানদের নেতা বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান স্থাপনে বাধা দেন, [illegible]ক মাস পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান লীগ্ নামে অনুরূপ একটী প্রতিষ্ঠান হয়[illegible] তাঁহার যুক্তিগুলির উত্তর দিলে পর ঐ সভায় ইণ্ডিয়ান [illegible]সান স্থাপনের প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

ইণ্ডিয়ান্ লীগ বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার বাবু শিশির কুমার ঘোষ, ডাক্তার শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু মতিলাল ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রাণ ছিলেন। এক্ষণে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানে যোগ দিয়াছেন।

এক তীব্র বিয়োগ ব্যথা সহ্য করিয়া ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের প্রথম সভায় যোগদান করি কারণ সেইদিন প্রাতঃকালে আমার পুত্র ইহলোক ত্যাগ করে। পূর্ব্বেই জানিতাম যে সভায় এসোসিয়েসান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে অনেকে বিরোধিতা করিবেন এবং সেইজন্য পুত্রশোক সত্বেও আমি আমার স্ত্রীর সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে ঐ সভায় যাই। সভায় কেহই আমার শোকের বিষয় জানেন নাই; অবশ্য পরদিন প্রাতঃকালেই এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল। অনুরূপ শোকের সময় আর একবার দেশের কার্য্য করিতে হয়। ১৯১১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আমার প্রিয়পত্নী পরলোক গমন করিবার দুইদিন পরে জাতীয় মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদানকরতঃ পণ্ডিত বিষণ নারায়নকে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব আমি উত্থাপন করি, কারণ যাঁহার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান বহু দিনের এক অভাব পূর্ণ করে। আনন্দ মোহন বসু ইহার সম্পাদক এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার সরকার সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কোন পদ গ্রহণ না করিয়াও আমি ইহার বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলাম। সরকারী কর্ম্ম হইতে অপসারণ জন্য নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া আমি সাগ্রহে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিতাম ও তখন হইতে যে সকল আদর্শ আমার মনে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছিল তাহা এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কার্য্যে পরিণত করিবার মানস করি। দেশে সুদৃঢ় গণমত, স্থাপন তুল্য

রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় বিভিন্ন জাতির মিলন সাধন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং জনহিতকর আন্দোলনের সহিত সাধারণের যোগসূত্র স্থাপন—এইগুলি আমাদের রাষ্ট্রিয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। এই আদর্শগুলিকে ফলপ্রসূ করিতে আমি ও অন্যান্য অনেকে আজীবন চেষ্টা করিয়াছি কারণ ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করে বলিয়া প্রত্যেক দেশহিতৈষী তখন ইহাদের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী গণআন্দোলনের পর ঐ আদর্শগুলি প্রায় ফলবতী হইতে চলিয়াছে।

ম্যাট্‌সিনির (Mazzini) রচনাবলি আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাঁহার পবিত্র দেশপ্রেম, উচ্চ আদর্শ, এবং হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী মানবপ্রীতি আমার মনকে অত্যন্ত অভিভূত করিত। তাঁহার বিপ্লবাত্মক শিক্ষা শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির পরিপন্থী ও এ দেশের অবস্থার অনুকূল নয় বলিয়া আমি গ্রহণ করি নাই বটে, কিন্তু স্বদেশের হিতার্থে উৎসর্গীকৃত উন্নত জীবনের শিক্ষাবলি, স্বদেশপ্রীতি, স্বার্থবিসর্জ্জন ও মানবের কল্যাণে আত্মত্যাগ আমাকে মুগ্ধ করিত। সেইজন্য আমি বাঙ্গালার যুবকবৃন্দের নিকট ইটালির একতার অগ্রদূত, মানবজাতির বন্ধু এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে উচ্চ নৈতিক শক্তির অবতার স্বরূপ ম্যাট্‌সিনির আদর্শ স্থাপন করি। ম্যাট্‌সিনির ন্যায় আমরাও দেশের ঐক্য কামনা করিতেছিলাম, বাঙ্গালার যুবকেরা যাহাতে দেশের স্বাধীনতা আনিতে সমর্থ হয় সেই জন্য আমরাও ম্যাট্‌সিনির ন্যায় যুবকদের সহযোগিতা চাহিতেছিলাম, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহারা সাহায্য করে ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য তাঁহার বিপ্লবাত্মক শিক্ষা পরিহার করিয়া দেশপ্রীতি ও আত্মোৎসর্গ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে যুবকগণকে উদ্বুদ্ধ করি। ইংরাজি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ ও রজনী কান্ত গুপ্তকে ম্যাট্‌সিনির জীবনী ও

রচনা বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে উৎসাহ দিই। এইরূপে শীঘ্র বাঙ্গালার যুবক সমাজে ম্যাট্‌সিনির আদর্শ পরিচিত হইলেও বিপ্লবের কারণ সকল দেশে বিদ্যমান না থাকায় সেরূপ কিছু ঘটে নাই। যে শাসক সম্প্রদায় সময়োচিত ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদের অদূরদর্শিতার ফলেই বিপ্লবের অভ্যুদয়, নচেৎ দেশের কল্যাণকামী সেবক দেশের দুঃখ লাঘব করিতেই চান; বিপ্লবের দ্বারা দেশের দুঃখ বৃদ্ধি করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান প্রতিষ্ঠার একবৎসরের মধ্যে ইহার কয়েকটী আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ আসে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণ প্রায় গণ-আন্দোলনের কারণ হন। যতই অস্বীকার করুন না কেন তাঁহারা যে বীজ বপন করেন, সেই বীজ কালে গণচেতনাকে জাগরিত করিয়া আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে। তদানীন্তন ভারত সচিব মার্কুইস অব্ সলিস্‌বারি (M.rquis of Salisbury) সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স যখন একুশ হইতে কমাইয়া ঊনিশ বৎসর ঠিক করিলেন তখন সমগ্র ভারতে এক বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। সকলেই বুঝিলেন যে ভারতীয় প্রতিযোগীদের আশা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এই সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তখন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান একটী জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করিতে মনস্থ করে। ১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ্চ টাউন হলে মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটী বিরাট সভা আহূত হয়। কলিকাতার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জিলা হইতে বহু প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। রাজনীতি সংক্রান্ত কোন সভায় জীবনে বক্তৃতা না করিলেও কেশবচন্দ্র সেন উক্ত সভায় সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সম্মত হন।

কলিকাতা মহানগরীতে এরূপ বিরাট জনসভা বোধ হয় পূর্ব্বে আর হয় নাই; উক্ত সভা ভারতবর্ষে অনুরূপ কিম্বা তদপেক্ষা জনাকীর্ণ

সভার সূত্রপাত করে। আমাদের উপায় ছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার নির্দ্দিষ্ট বয়স বৃদ্ধির ও যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা কিন্তু দেশে এক আন্দোলন সৃষ্টিদ্বারা সমগ্র ভারতকে একতাবদ্ধ করাই যথার্থ উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেইজন্য নিখিল ভারতে একই আবেদন প্রচারিত করিয়া বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে সমসূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা হয়।

বিভিন্নপ্রদেশে প্রচারকার্য্যের জন্য আমাকে বিশেষ প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। এ কল্পনা আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া আমি স্ব ইচ্ছায় ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করি। উৎসাহের সহিত চাঁদা সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত হই এবং ১৮৭৭ সালের ২৬শে মে কলেজের গ্রীষ্মাবকাশে প্রসিদ্ধ বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জির সহিত উত্তর ভারতাভিমুখে যাত্রা করি। এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয় ঐ দারুণ গ্রীষ্মের সময় আমাদের যাইতে নিষেধ করেন কিন্তু বিপদের কোন কথাই আমাদের সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। প্রথমে আমরা আগ্রা যাই। তখন সেখানে আমার অধুনা স্বর্গত বন্ধু বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাবজজ ছিলেন।

আগ্রায় সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় অভিযোগের বিবরণটী উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত করিয়া মুদ্রিত করা হয়। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে আমাদের প্রথম জনসভা আহ্বান করা স্থির হয়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সকলেই আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাদের সাদর আপ্যায়নে আমার নিকট এই রহস্য প্রতিভাত হয় যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি একইরূপ শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের দ্বারা এরূপভাবে গঠিত হইয়াছে যে জাতীয় রাজনৈতিক আদর্শের জন্য এক্ষণে একতাবদ্ধভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। লাহোরে এক জনাকীর্ণ সভায় কলিকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি ও সিভিল সার্ভিস

সম্বন্ধীয় বিবরণটী অনুমোদন লাভ করে। আর একটী জনসভায় আমি ভারতীয় একতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করি এবং কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের আদর্শে লাহোর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান নামে একটী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথায় স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবে এই প্রতিষ্ঠানটী বোধহয় বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রথম মিলনক্ষেত্ররূপে বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে।

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পাঞ্জাবে আমার পরিচয় হয়। স্বর্গত সেই বন্ধুদের স্মৃতি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। সর্দ্দার দয়াল সিংহের সহিত সেইখানেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং শীঘ্রই ঐ পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আভিজাত্যের গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে নিজেকে আবৃত রাখিতেন বলিয়া এই সত্যনিষ্ঠ ও মহান চেতাঃ পুরুষের সত্য রূপ এবং অন্তরের অমূল্য সম্পদ সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। যে কার্য্যের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছিলাম সর্ব্বান্তঃকরণে তিনি তাহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। লাহোরে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে প্ররোচিত করি এবং তাঁহার 'ট্রিবিউন্' পত্রিকার জন্য আমি প্রথম কলিকাতা হইতে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করি। ট্রিবিউন্ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক নিয়োগের ভার আমার উপর ন্যস্ত করা হইলে আমি অধুনা স্বর্গত ঢাকার শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগের প্রস্তাব করি। তাঁহার সাফল্যপূর্ণ সাংবাদিকজীবন আমার মনোনয়নের ন্যায্যতা প্রমাণ করে। তাঁহার নির্ভীকতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সাংবাদিকের সর্ব্বপ্রধান গুণ উদ্দেশ্যের সাধুতা শীঘ্রই তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক করিয়া তুলিয়াছিল।

শীঘ্রই ট্রিবিউন্ পত্রিকা জনমতের মুখপাত্র হইয়া উঠে। এক্ষণে ইহা পাঞ্জাবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পত্রিকা। কিন্তু সর্দ্দার দয়াল সিংহের পাঞ্জাবে ইহাই একমাত্র দান নয়। তিনি স্বদেশের জন্য তাঁহার সমস্তই দান করেন এবং দয়াল সিংহ কলেজ পাঞ্জাবের এই কৃতী সন্তানের

চিরস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কেবল পাঞ্জাব নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ শোকসাগরে নিমগ্ন হয়।

সর্দ্দার দয়াল সিংহের সহিত যাঁহারা জনসাধারণের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন ডাক্তার সুরাজবল, পণ্ডিত রামনারায়ণ এবং বাবু কালিপ্রসন্ন রায়ের নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার সুরাজবল অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট ছিলেন; উত্তরকালে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। পণ্ডিত রামনারায়ণ একজন দক্ষ আইনজ্ঞ ছিলেন। কালিপ্রসন্ন রায় লাহোর কোর্টের একজন প্রখ্যাত-নামা ব্যবহারজীব ছিলেন। তিনি কেবল আইন ব্যবসায়ী ছিলেন না পরন্তু একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও বন্ধুবৎসল বলিয়া জনসাধারণের সমস্ত কার্য্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। এরূপ ব্যক্তির নাম বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দেশে জনহিতকর অনুষ্ঠান সহজেই দেশবাসী বিস্মৃত হয়, কারণ সদনুষ্ঠান অথবা উহার প্রশংসা অপেক্ষা সমালোচনা করিতেই লোকে অধিক অভ্যস্ত।

লাহোর ত্যাগ করিয়া আমি অমৃতসহর, মীরাট, এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড় এবং কাশী যাই। এই সমস্ত স্থানে বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয় এবং প্রত্যেক সভায় কলিকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি ও সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় বিবরণটী অনুমোদিত হয়। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য লাহোর, মীরাট, এলাহাবাদ, কানপুর, এবং লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এরূপ ভাবে স্থাপিত হয় যাহাতে ঐসব স্থানের প্রতিনিধিসদৃশব্যক্তিরা একতাবদ্ধ-ভাবে কার্য্য করিতে পারেন। পরবৎসর যখন আমি বোম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে ঐ একই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করি তখন এই আন্দোলন আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল।

উত্তর ভারতে আমার এই ভ্রমণ কেবল যে রাজনৈতিক বহু সম্ভাব্য

ফলে পূর্ণ ছিল তাহা নহে পরন্তু ইহা আমাকে ব্যক্তিগত সুখ ও শিক্ষা দেয়। এই প্রসঙ্গেই উত্তরভারতের তৎকালীন বিভিন্ন চিন্তানায়কগণের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করি। স্যর সৈয়দ আহম্মদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ, রাজা আমীর হোসেন, বাবু ঐশ্বর্য্যনারায়ণ সিংহ এবং কাশীর বাবু রামকালি চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে কোনও সমাজের গৌরবস্থল।

উত্তর ভারতে আমার সাফল্যের জন্য সহকর্ম্মীগণ পরে আমাকে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে পাঠাইতে মনস্ত করেন এবং তদনুসারে আমি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শীতকালে বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করি। বোম্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ পূর্ব্বে হইতেই আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। বিশ্বনারায়ণ মান্দলিক, কাশীনাথ তৃম্বক তেলাঙ্ এবং স্যর ফিরোজসাহ মেটা সে সময় বোম্বের নেতা ছিলেন। একটী জনসভায় সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। আমি তখন সুরাট ও গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করি। উভয় স্থানেই সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপরে বোম্বে হইয়া পুনায় যাই। তথায় মহামতি রাণাডের আতিথ্য স্বীকার করি।

রাণাডে তখন সাবজজ্ ছিলেন কিন্তু তাঁহার সরকারী কার্য্য কখনও তাঁহাকে নাগরিকের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। জাতীয় মহাসভার তিনি একজন নিয়মিত দর্শক ছিলেন এবং সর্ব্বদাই অন্তরালে থাকিয়া নেতৃবৃন্দকে উপদেশ ও উৎসাহের দ্বারা চালিত করিতেন। তাঁহার সরলতা, সহৃদয় ব্যবহার, ধীশক্তি এবং স্বদেশ-প্রীতি সকলকে মুগ্ধ করিত। পুনায় যখন আমি তাঁহার বাটীতে অতিথিরূপে বাস করিতেছিলাম তখন তিনি আমাকে তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় দেখিতেন।

পুনায় একটী জনসভায় আমাদের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে পর

আমি মাদ্রাজে যাই এবং তথায় ধনকাটু রাজুর অতিথি হই। মাদ্রাজ তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় রাজনৈতিক ব্যাপারে অগ্রগামী ছিল না এবং সেইজন্য ১৮৭৮ সালে সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র মাদ্রাজেই নিখিল ভারতের প্রয়োজনীয় সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়াও আমরা সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই নাই।

কলিকাতায় প্রয়োজন ছিল বলিয়া শীঘ্র ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া আসি। আমরা ঠিক করিয়াছিলাম যে সমগ্র ভারতের অনুমোদন লাভ করিবার পরে বিলাতে আমাদের মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া এই আন্দোলন তথায় চালান হইবে।

সমগ্র ভারতে আমার ভ্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মবিশিষ্ট এই বিশাল ভারতবর্ষে এক উদ্দেশ্য সাধনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ইংরাজ রাজত্বে ইহাই প্রথম। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে জাতিগত, ভাষাগত বা ধর্ম্মগত ভেদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের লোকেরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হইতে সমর্থ। পরবর্ত্তী ঘটনাবলি উক্ত প্রমাণকে সুদৃঢ় করে এবং জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি উহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

স্যর হেনরি কটন্ তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ঃ—

"শিক্ষিত সমাজই দেশের নায়ক। পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বাঙ্গালীরাই এক্ষণে জনমতকে পরিচালিত করেন। উত্তরপশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা শিক্ষায় ও রাজনৈতিক বোধ সম্বন্ধে বহু পশ্চাতে থাকিলেও তাঁহারা ক্রমে ক্রমে নিজেদের শিক্ষার অনুশাসনে আনিতেছেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার আভাষ পাওয়া যায় নাই। লর্ড লরেন্স, মনটগ্ মারি কিম্বা ম্যাক্লিওডের সময় পাঞ্জাবে বাঙ্গালীর কোনওরূপ প্রভাবের

কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু গত বৎসর একজন বাঙ্গালী নেতা উত্তর ভারতে যেরূপ সাফল্যের সহিত ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। বর্ত্তমানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাঙ্গালার নবীনদের মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে মুলতানেও সেইরূপ উৎসাহের সৃষ্টি করে।"

সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় নিখিল ভারতীয় প্রস্তাবটী কমন্স সভায় উত্থাপিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রস্তাবে তদানীন্তন ভারত সচিবের আদেশ পরিবর্ত্তিত করিয়া সিভিল সার্ভিসের বয়স বাইশ স্থির করিবার এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা করা হয়। আবেদন খানি পূর্ব্বের ন্যায় ডাকযোগে হাউস অব কমন্স সভায় পাঠাইতে পারা যাইত কিন্তু জনসাধারণের মনে এক নূতন ধারণার সৃষ্টি হয়। সমগ্র শিক্ষিত সমাজের সংস্পৃষ্ট এক অত্যাবশ্যক সমস্যার ভিত্তিতে নিখিল ভারতকে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং সেইজন্য এইরূপ সর্ব্বভারতীয় আন্দোলন ভারতীয় প্রতিনিধিদ্বারা ইংরাজ জাতির নিকট প্রকাশিত করিতে চাই। প্রতিনিধিরূপে বিলাতে যাইবার জন্য প্রথমে আমাকে অনুরোধ করা হয়। আমি নিজে যে কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়াছি সেই কর্ম্মেই আমার স্বদেশবাসীর অধিক নিয়োগের জন্য আমার প্রচারকার্য্য মর্য্যাদালাভ করিবে না বলিয়া আমি ঐ প্রস্তাবে অসম্মত হই। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান তখন লালমোহন ঘোষকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন। তাঁহার অসামান্য সাফল্য তাঁহার নির্ব্বাচনের যৌক্তিকতা প্রকাশ করিয়াছে। পূর্ব্বে তিনি জনসাধারণের কার্য্যে তত যোগ দিতেন না বলিয়া তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যখন তিনি এই ব্যাপারে তাঁহার বাগ্মিতা দ্বারা তৎকালীন শ্রেষ্ঠবক্তা জনব্রাইটকেও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হন তখন সকলেই চমৎকৃত হইলেন। নেপোলিয়ান যখন নিম্নপদস্থ অপরিচিত

কর্ম্মচারী তখনই কারনট্ (Carnot) তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সন্ধান পান। সেইরূপ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের নেতৃবৃন্দও এমন একজন ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন যিনি ভারতীয় হইয়াও উত্তরকালে পার্লামেণ্টের সদস্য সম্মানপ্রার্থী হইতে প্রথম প্রয়াসী হন এবং শ্রেষ্ঠ জননেতারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া নৈরাশ্যবাদী অনেক ব্যক্তিই আমাদের এই বলিয়া নিরুৎসাহ করিলেন যে উহাতে কোন ফল হইবে না এবং সমস্ত অর্থই অপব্যয় হইবে। ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস আন্দোলনে যে সাফল্য লাভ করি তাহাই আমাদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করে বলিয়া কোন ভীরুতাব্যঞ্জক প্রস্তাবে আমরা কর্ণপাত করি নাই। আমি অর্থ সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলাম এবং ছয় মাসের মধ্যে প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হই।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থলাভ করি। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে একখানি পত্র গ্রহণ করিয়া আমি আমার অক্লান্ত কর্ম্মী বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সহিত মহারাণী স্বর্ণময়ীর এষ্টেটের ম্যানেজার রায় বাহাদুর রাজীবলোচন রায়ের সহিত বহরমপুরে তাঁহার গৃহে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাদের সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করেন বটে কিন্তু প্রার্থিত অর্থের অর্দ্ধেকমাত্র দিতে সম্মত হন। আমরা ধন্যবাদ দিয়া আমাদের অধিক আশার কথা তাঁহাকে জানাই। বিদায় গ্রহণান্তর যখন তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হই তখন পুনরায় আমাদের ডাকাইয়া প্রার্থিত সমস্ত অর্থ দিতে তাঁহার সম্মতি জানান। বর্ত্তমান বংশীয়গণ তাঁহার নামের সহিত বিশেষ পরিচিত নহেন এবং শীঘ্রই হয়ত সাধারণের মন হইতে তাঁহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহা সত্য যে যদিও মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার জীবিতকালে কাশিমবাজারের দানশীলা রমণী নামে

খ্যাত ছিলেন, রাজীবলোচনই তাঁহাকে দানকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তিনিই মহারাণীর শক্তির উৎস ছিলেন। তাঁহার জন্যই কাশিমবাজার এষ্টেট্ বাজেয়াপ্ত হয় নাই এবং তিনিই মহারাণীকে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি দানকার্য্যে নিয়োজিত করিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

অর্থসংগ্রহ শেষ হইলে লালমোহন ঘোষকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের প্রতিনিধিরূপে সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত আবেদন খানি পার্লামেণ্টের নিকট পেস্ করিবার জন্য পাঠান হয়। বিলাতে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণের সম্ভাব্য ফল সম্বন্ধে লালমোহন ঘোষের কার্য্য আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। জন্ ব্রাইটের (John Bright) সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় লালমোহন ঘোষ তাঁহার বাগ্মিতা দ্বারা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন এবং সভাপতির আন্তরিক প্রশংসা লাভ করেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এই অনুষ্ঠানের ফল দেখা যায়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষ্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিসের (স্বতন্ত্র বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস) নিয়মাবলি কমন্স সভায় উপস্থিত করা হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের বিধি অনুসারে ভারত সরকার প্রতিভাসম্পন্ন দেশীয়গণকে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ করিবার অধিকার পান। সাত বৎসরেরও অধিককাল ভারত সরকার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু বিলাতের ঐ সভায় মিলিত ভারতের মনোভাব এরূপ গভীর রেখাপাত করে যে ঐ সভানুষ্ঠানের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারিটী বিধি যাহা সাত বৎসর অযথা স্থগিত রাখা হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত হইল।

ভারতের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ এইরূপে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিল এবং ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ এই নীতির সিদ্ধি ইহার উদ্ভাবকগণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও

সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর পুনরায় লালমোহন ঘোষকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান প্রতিনিধিরূপে বিলাতে পাঠান। ঐ সময় তথায় অবস্থানকালে উদারনৈতিক দলের পক্ষ হইতে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থী হন। শেষ মুহূর্ত্তে আইরিশ ভোট তাঁহার প্রতিকূল হইল বলিয়া তিনি ঐ সম্মান লাভে অসমর্থ হইলেন যাহা অবশেষে দাদাভাই নৌরজী প্রথম লাভ করেন। যাহা হউক, এ বিষয়েও তিনিই পথপ্রদর্শক ও অগ্রণী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্র এবং তাহার পরিণাম।

এই জীবনস্মৃতিতে আমার জীবনের ঘটনাবলি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করি নাই, কারণ সময়ে সময়ে একটী অধ্যায়ে আমি পূর্ব্ববতন ঘটনা উল্লেখ করা সুবিধাজনক বোধ করিয়াছি। রক্ষণশীল ভারতসচিব লর্ড সালিস্‌বারির শাসনকালেই সিভিল সার্ভিসের বয়স কমান হয়। ক্রমেই ভারতবর্ষকে দলগত রাজনীতির বাহিরে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষের ইহা দুর্ভাগ্য, কারণ আমরা জানি যে ভারতবর্ষ বিলাতের দলগত রাজনীতিতে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়াই ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ইহার নৈতিক ফল ভারতের পক্ষে শুভ হয়। কিন্তু তদবধি ঘটনার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলই ভারতবর্ষকে দলগত রাজনীতির বাহিরে বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। স্যর হেন্‌রি ফাউলার (Sir Henry Fowler) ভারত-সচিবরূপে পার্লামেণ্ট হইতে ঘোষণা করেন যে পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যই ভারতের প্রতিনিধি। এই আপাতমহৎ সিদ্ধান্ত বিলাতে সকলেই সানন্দে গ্রহণ করিলেও ভারতীয়গণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কারণ আমরা সকলেই জানি, যে কার্য্য বহুলোকের করণীয় তাহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

অবশ্য ভারতসচিবের ব্যক্তিত্বের উপর অনেক নির্ভর করে। তাঁহার দলের নীতি আংশিকভাবে প্রভাব বিস্তার করিলেও তাঁহার ব্যক্তিগত মত ও সহানুভূতির উপরই ভারতশাসননীতি নির্ভর করে। ভারতসচিব লর্ড সালিসবারির (Lord Salisbury) শাসনকাল স্পষ্টতঃ প্রতিক্রিয়ামূলক ছিল। তিনিই ভারতবর্ষে লর্ড লিটনকে বড়লাট রূপে প্রেরণ করেন। বহুবৎসর পরে প্রধান মন্ত্রীরূপে কার্য্য করিবার সময় লর্ড সালিসবারিই

লর্ড কার্জ্জনকে (Lord Curzon) ভারতবর্ষে পাঠান। পূর্ব্বেই সালিস-বারি কর্ত্তৃক সিভিল সার্ভিসের বয়স কমাইবার কথা বলিয়াছি এবং তজ্জন্য যে আন্দোলন হয় তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহারই প্রেরিত লর্ড লিটন (Lord Lytton) ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন এবং ভারতীয়গণের অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করেন। আর্মস্‌ এক্ট্‌ এবং ভার্নাকুলার প্রেস এক্ট নামে এই দুইটী আইন দেশে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এই দেশব্যাপী আন্দোলনে আমি আমার ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব সত্যই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল তখন লর্ড ক্যানিং বা তাঁহার পরামর্শদাতা-গণ কেহই ভারতীয়গণের নিরস্ত্রীকরণ আবশ্যক মনে করেন নাই। লর্ড লিটনের শাসনকালে আফগান যুদ্ধও ভারতবর্ষে উত্তেজনার সৃষ্টি করে নাই। এক্ষণে এই নিরস্ত্রীকরণ আইন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ও ক্ষতিকর হইল, কারণ ইহা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ভারতীয়-গণকে ক্ষুব্ধ ও অবমানিত করে। আমরা প্রতিবাদ করিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেবের (Mr. Gladstone) নিকট আবেদন করি। তিনি তখন আমাদের প্রতিবাদ সমর্থন করিয়া ঐ দুইটী আইনের নিন্দা করিলেন। প্রধান মন্ত্রী হইয়া তিনি কিন্তু আমাদের প্রতি আংশিক ন্যায়বিচার করেন, কারণ তিনি ভার্নাকুলার প্রেস এক্ট্‌ (সংবাদ পত্র দমন আইন) রদ করিলেও আর্মস্‌ এক্ট্‌ (নিরস্ত্রীকরণ আইন) বজায় রাখেন।

১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত সংবাদ পত্র দমন আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহাকে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় মনে করেন কিন্তু পূর্ব্বেই ইহার আভাষ আমরা পাইয়াছিলাম। ১৮৭৭ সালে দিল্লী সম্মিলনে যখন সংবাদপত্রসেবীগণ আমন্ত্রিত হন তখন আমি বিখ্যাত সাংবাদিক মনীষী কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদিত বাঙ্গালার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হিন্দু পেট্রিয়টের সংবাদদাতারূপে

তথায় যাই। সেখানে সংবাদসেবীগণ কর্ত্তৃক বড়লাট বাহাদুরকে যে অভিভাষণ দেওয়া হয় তাহা আমিই পাঠ করি এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যাহাতে সঙ্কুচিত করা না হয় তাহার অনুরোধ করি।

এই ঘটনার প্রায় পনের মাসের মধ্যে মাদ্রাজ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্যই সরকার বিরোধী মত প্রকাশ করেন নাই। শোনা যায় মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে ভোট দেন। তাঁহার এই সমর্থন যুক্তিযুক্ত না হইলেও তাঁহার বহু গুণের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। মৃত মহাত্মাগণের বিচারে দোষগুণ উভয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহা সত্য যে মহারাজার ক্ষেত্রে গুণই অধিক ছিল।

যাহা হউক, বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ ভার্ণাকুলার প্রেস্ এক্ট্ প্রবর্ত্তনে অত্যন্ত চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান ও কতিপয় নেতার ঔদাসীন্যে এই ভাব আরও প্রবল হয়। সৌভাগ্যের বিষয় যে পাঁচবৎসর পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান স্থাপিত হইয়াছিল। প্রেস এক্ট্ রহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে আমি বদ্ধপরিকর হইলাম। আমি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু একাধিক স্থানে আমি ভগ্নোৎসাহ হই।

ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেভারেণ্ড ডক্টর কে, এস, ম্যাক্ডোনাল্ড প্রমুখ খ্রীশ্চান বন্ধুদের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। প্রথম হইতেই তাঁহারা আমাদের উৎসাহ দেন ও সাহায্য করেন। জ্ঞানবৃদ্ধ কৃষ্ণমোহন পরিণত বয়সে রাজনীতিতে যোগ দেন। প্রথমে তিনি ইণ্ডিয়ান লীগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন;

পরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের সভাপতি হন। জনসাধারণের কার্য্যে একবার অবতীর্ণ হইয়া ক্রমেই তিনি গভীরভাবে ইহাতে নিমগ্ন হন। যখন কলিকাতা পৌর সভার তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন তখন তাঁহার বয়স ষষ্ঠি বৎসর হইলেও অনুরাগের তীব্রতা এবং স্পষ্ট-বাদিতার জন্য তিনি নবীনের ন্যায় ছিলেন। সত্য বলিয়া যাহা ভাবিতেন কিছুতেই তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেন না। দৃঢ়তার সহিত কমনীয়তার যে সংমিশ্রণ তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত তাহা বাস্তবিক দুর্ল্ভ।

আমার মনে হয় এরূপ চরিত্র দ্রুত বিলুপ্ত হইতেছে। প্রাচীন যুগের মধুরাচরণ তিরোহিত হইয়া পাশ্চাত্য দেশের আক্রমণশীল তীব্র মনোভাবের আবির্ভাব হইতেছে। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন সর্ব্বান্তঃকরণে এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার ও রেভাঃ ডক্ট্র ম্যাকডো-নাল্ডের সহযোগিতায় এই আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন আকার ধারণ করে।

টাউনহলে একটী জনসভার ব্যবস্থা করা হইল। সভানুষ্ঠানের নির্দ্ধারিত দিবসে কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া যায় যে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা হেতু তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেলি (Disraeli) মাণ্টায় ছয় হাজার ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুদ্ধ সত্য বাধে নাই কিন্তু এই ঘোষণা কলিকাতায় এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আনন্দমোহন বসুকে তাঁহার বন্ধুরা সভা বন্ধ করিয়া দিতে পরামর্শ দেন, কারণ য়ুরোপে সেই সঙ্কটে জোর করিয়া সভার অনুষ্ঠানের পরিণাম তাঁহারা অশুভ মনে করেন। অপরাহ্ন তিনটার সময় ব্যস্তভাবে আনন্দমোহন বসু আমার গৃহে আসেন। সভানুষ্ঠানের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল পাঁচটায়। উভয়ে ব্যাপারটী আলোচনা করিয়া আমি বলিলাম যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের এবং বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত সম্প্র-দায়ের ইহাই প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন সেইজন্য

একবার স্থগিত রাখা হইলে আর কখনও ইহার অনুষ্ঠান হইবে না। জনসাধারণ তাহা হইলে বিশ্বাস হারাইবে এবং আরম্ভেই ইহার অবসান ঘটিবে। সেইজন্য অবশেষে সভার অধিবেশন সম্পন্ন করাই স্থির করিয়া পরিণামের সম্মুখীন হইতে সম্মত হইলাম।

এই সভার অধিবেশন সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে। ভার্ণাকুলার প্রেস এক্টের সমাধি রচনা করিয়া ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রম-বর্দ্ধমান প্রভাব ঘোষণা করে। যে প্রভাব ও শক্তিবলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধনিক শ্রেণীর ঔদাসীন্য ও সরকারি বাধা সত্ত্বেও স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য কার্য্য করিতে সক্ষম হয় তাহারই স্পষ্ট সূচনা হয় এই সভার অধিবেশনে। যে শিক্ষা বাঙ্গালার মধ্যবিত্তশ্রেণী সেদিন লাভ করে উত্তরকালে তাহা তাঁহাদের বহু উপকারে লাগিয়াছিল। জাতীয় ক্রমোন্নতির ইতিহাসে ইহা একটী বিশিষ্ট অধ্যায়।

লর্ড রিপনের শাসনকালের প্রথমেই ভার্ণাকুলার প্রেস এক্ট্ রহিত হয়। তাঁহার আগমনে ভারতীয় জনসাধারণ স্বস্তি পায়। লর্ড লিটনের (Lytton) প্রতিক্রিয়াশীল শাসননীতি ঔদাসীন্য দূর করিয়া গণচেতনাকে জাগ্রত করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রিয় উন্নতির পরিপোষকতা করেন। যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অন্যায় ও অত্যাচার দূরীভূত করিয়া দেশের সুপ্ত গণচেতনা প্রবুদ্ধ করে তাহা মন্দ শাসকগণের শাসননীতিরই অপরিহার্য্য পরিণতি। লর্ড লিটন এবং লর্ড কার্জ্জন সেই হিসাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে এ দেশের উপকার করিয়াছেন।

লর্ড রিপন শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই দেশের পৌর প্রতিষ্ঠান-গুলির সংস্কারের উল্লেখ করেন কারণ তিনি বলেন যে ইহাই প্রথম রাজনৈতিক শিক্ষালাভের স্থান। প্রকাশ্যভাবে এই নীতি প্রচারিত হইলে আমরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের মুখপাত্র হিসাবে তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ করি। মফঃস্বলে বিভিন্ন সহরের করদাতারা পৌর-

প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ব্বাচন প্রথায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে যাহাতে সরকারের নিকট আবেদন করেন তাহার জন্য আমরা সর্ব্বত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে লাগিলাম। এই প্রসঙ্গে আমি ভাগলপুর, মুঙ্গের, রাজসাহী, বগুড়া এবং পাবনা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করি এবং সর্ব্বত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মফঃস্বলে রাজনৈতিক আন্দোলন তখন নূতন ব্যাপার ছিল। সেইজন্য এই প্রদেশের সুদূর অভ্যন্তরে রাজনৈতিক উন্নতি লাভের যে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সঞ্চার করিতে আমরা তখন সমর্থ হই তাহা আমার জীবনস্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে। সর্ব্বত্র উকীল সভাগুলি আমাদের সাহায্য করে এবং জমিদারগণও আমাদের সাহায্য দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিয়া আমরা টাউনহলে একটী সভার আয়োজন করি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী ঐ সভায় নিম্নলিখিত ভাষায় উত্থাপন করি :—

"এই দেশবাসীকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনরূপ যে অমূল্যদানের প্রস্তাব বড়লাটবাহাদুর সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য এই সভা তাঁহরে নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে এবং যাহাতে তিনি তাঁহার এই প্রস্তাবটী সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করিতে পারেন সেই আশা পোষণ করিতেছে। এই সভা ঐ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আবেদন সবিনয়ে বড়লাটবাহাদুরের নিকট স্থাপন করিতেছে :— (১) লোক্যাল (স্থানীয়) বোর্ড ও পৌর সভার নির্ব্বাচন প্রথায় পুনর্গঠন (২) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টরকে এই সব সভার সভাপতিত্ব পদ দেওয়া রহিত করা এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সভাপতি পদ কোনও নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে প্রদান (৩) প্রস্তাবিত লোক্যাল বোর্ডগুলির সহিত মিলনের উদ্দেশে বর্ত্তমান সমিতিগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি।"

লর্ড রিপন স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের যে ব্যবস্থা করেন তাহা উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির অনুরূপ। উল্লিখিত সভাটী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই

ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হয়। জনমতের সহিত শাসক সম্প্রদায়ের ঐক্যের ইহা একটী বিশিষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটী একটী বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গমাত্র ছিল। এই সমস্যা সমাধানের পূর্ব্বেই বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রপ্রতিষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান এ সম্বন্ধে একটী সমিতি গঠন করিয়াছিলেন।

এই সূত্রে জাতীয় আশা আকাঙ্খার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গত শতাব্দীর ষষ্ঠশতকে নেতৃবৃন্দের চেষ্টা কেবল সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকারেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারাণীর ঘোষণা তাঁহাদের আশা এইদিকে প্রবুদ্ধ করে এবং সেইজন্য প্রায় তাঁহারা মহারাণীর ঐ ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতেন। পশ্চিম ভারতে নৌরজী ফারদুনজি এবং দাদাভাই নৌরজী এই আন্দোলন পরিচালিত করেন। বাঙ্গালাদেশে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান এবং কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে নেতৃত্ব করেন। কিন্তু এক্ষণে সে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছিল। শিক্ষিত ভারতীয়গণ আর এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সন্ধান পাইলেন। গণআন্দোলনেও ক্রমবিবর্ত্তনবাদ কার্য্যকর হয়। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টা আমাদের মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব চেতনা সঞ্চার করিয়া নূতন আশা ও উদ্যম আনিয়া দেয়। আমরা কেবল দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকারই যথেষ্ট মনে করিতে পারিলাম না, পরন্তু প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের আকাঙ্খা করিতে লাগিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

সংবাদপত্রসেবা।

গত শতাব্দীর সপ্তশতকে ভারতবর্ষে সংবাদপত্র এখনকার ন্যায় শক্তিশালী না হইলেও প্রচার কার্য্যের ইহা এক বিশিষ্ট উপায় ছিল। রাজনৈতিক কার্য্যের সহায়তার জন্য আমাদের একখানি নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজন হয়। কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদকতায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' তখন বাঙ্গালার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশীয় পত্রিকারূপে পরিগণিত হইয়া দেশের ও গভর্ণমেণ্টের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। চিরকাল পুরাতনের উপর ভিত্তি করিয়া কার্য্য করাই আমার স্বভাব বলিয়া নূতন সংবাদপত্র প্রকাশ না করিয়া কোনও পুরাতন পত্রিকা চালাইতে মনস্থ করি।

কতকগুলি ঘটনা পরম্পরায় আমি 'বেঙ্গলী' পত্রিকাখানি হাতে পাই। তখন 'বেঙ্গলী' বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং তিনিই ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পত্রিকাখানির গ্রাহক সংখ্যা তখন মাত্র দুই শত। প্রসিদ্ধ এটর্ণি বাবু রমানাথ লাহার মধ্যস্থতায় আমি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি হইতে 'বেঙ্গলীর' স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হই।

ব্যবসায় হিসাবে আমি সংবাদপত্রখানি গ্রহণ করি নাই। যে জনসেবাকে আমি জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহারই অঙ্গরূপে এই পত্রিকাখানি পরিচালনার ভার লই। তখন ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইত। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ব্যতীত সমস্ত পত্রিকা তখন সাপ্তাহিক ছিল।

সাংবাদিক জীবনের প্রথমে আমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু স্বর্গীয় আশুতোষ বিশ্বাসের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করি। ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনরি বিদ্যালয়ে এক জনসভায় 'চৈতন্য' সম্বন্ধে

বক্তৃতা প্রদানকালে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই। তাঁহার সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রসঙ্গানুকূল বক্তৃতায় তাঁহার বাগ্মিতা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই। ভিতরকার মানুষটী ও কি উপাদানে তিনি প্রস্তুত তাহা তখনই বুঝিতে পারি। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করি এবং আমাদের প্রথম সাক্ষাতে যে বন্ধুত্বের আরম্ভ হয় তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি আমাকে গুরু বলিতেন; ইহা মৌখিক সম্ভাষণ নয়। সত্যই তিনি পুরাকালের আদর্শ শিষ্যের ন্যায় আমাকে অনুসরণ করিতেন।

প্রতি শনিবার প্রাতঃকালে সংবাদপত্রখানি প্রকাশিত হইত। শুক্রবার রাত্রে সেইজন্য আমাদের প্রুফ্ সংশোধন প্রভৃতি অনেক কায করিতে হইত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমার বন্ধু এই নীরস কার্য্যে আমার সহযোগী ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে তিনি 'গার্ডিয়ান' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার পরিচালনায় সাহায্য করেন। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্বর্গীয় বন্ধুর নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

ব্যবহারজীবরূপে তাঁহার উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বলিয়া সংবাদপত্রসেবায় তিনি আর তত মন দিতে অসমর্থ হইলেন। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ শেষ পর্য্যন্ত মধুর ছিল এবং যখনই কোন আইন সম্বন্ধীয় পরামর্শের প্রয়োজন হইত তখনই তাঁহার নিকট যাইতাম ও তিনি সানন্দে আমাকে সাহায্য করিতেন। রাজনীতিতে তিনি আমাদের দলভুক্ত ছিলেন এবং 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের কার্য্য ব্যপদেশে উত্তর ভারতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকেও সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়িতে হয়। তাঁহার সময়ে ফৌজদারি আইনে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সেইজন্য আলিপুর বোমার মামলায় তিনি সরকার পক্ষে ছিলেন বলিয়া অপরাধীরা তাঁহার আইন

জ্ঞানের জন্য বিশেষ ভীত হয়। অপরাধীপক্ষের এই ভীতিই যে বিয়োগান্ত ঘটনার সৃষ্টি করে তাহাতে তিনি প্রাণ হারান। অনেক পত্রে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করা হইলেও অদৃষ্টবাদী আশুতোষ ভাগ্যের নিকট মানবের ক্ষুদ্রতা স্মরণ করিয়া পুলিসের রক্ষণাবেক্ষণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যবহারজীব ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন মতের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখা যাইত। প্রত্যেক রবিবার তিনি কালিমন্দিরে গিয়া পূজা করিতেন অথচ যে কোনও আধুনিক ব্যক্তির সহিত একত্রে আহার করিতে দ্বিধা করিতেন না। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হিন্দু সমাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেকে উপযোগী করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারের সামান্য উপকার করিতে পারিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমি নিজে তাঁহার পুত্রগণকে স্যর এডওয়ার্ড বেকারের সহিত পরিচিত করিয়া দিই এবং যাহাতে তাঁহার পরিজনবর্গ উপযুক্ত অর্থানুকূল্য লাভ করে তাহার জন্য সচেষ্ট হই।

আমি আমার বন্ধু আশুতোষ বিশ্বাসের সহিত সংবাদপত্রখানি পরিচালনা করিতে লাগিলাম। লাভ না হইলেও যে বৎসর হইতে আমরা পত্রিকাখানি পরিচালনার ভার গ্রহণ করি সেই সময় হইতে কোনওরূপ অর্থক্ষতি হইত না।

মুদ্রাযন্ত্রটী ক্রয় করিবার জন্য যে সামান্য ঋণ করিয়াছিলাম তাহা শীঘ্রই শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হই। সমালোচনা, মন্তব্যপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ-পত্রের সাধারণ পন্থা অনুসরণ করিতাম; ইহা দ্বারা কেহ বা বন্ধু কেহ বা শত্রু হইতেন। আদালত অবমাননার মামলার পূর্ব্বে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনায় 'বেঙ্গলী' জড়িত হয়। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এস্‌লি ইডনের (**Sir Ashley Eden**) অবসরগ্রহণ উপলক্ষে তাঁহার বিশিষ্ট

বন্ধুরা টাউনহলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি সুদক্ষ শাসক হিসাবে যথেষ্ট নাম করিলেও জনসাধারণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। সেইজন্য টাউনহলে জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দন দিতে প্রস্তুত নহে, কেবল তাঁহার ভক্তরাই তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে ইচ্ছুক—এই মর্ম্মে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ আমি লিখি। আমাদের এই মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল এবং টাউনহলে যে সভাটী সাধারণের সভারূপে অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহা কেবল স্যর এস্‌লি ইডনের বন্ধু ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রচারিত হইল। ইহাতে আর কাহারও আপত্তির কারণ রহিল না। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মত দেশে একটী বিশিষ্ট শক্তিরূপে পরিগণিত হইতেছিল সে দিন তাহারই বিজয় ঘোষিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

আদালত অবজ্ঞার মামলা—
কারাবাস।

আদালত অবজ্ঞার মামলা আমার সাংবাদিক জীবনের পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মামলায় আমি দুইমাসের জন্য জেলে যাই। আমার সময়ে জনসেবার কার্য্যে কারাবরণের সম্মান আমিই প্রথম লাভ করি। আদালত অবজ্ঞার মামলার বিষয়টী এইরূপ। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল 'বেঙ্গলীতে' নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটী বাহির হয়।

"হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এতদিন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অবশ্য সময়বিশেষে তাঁহারা ভুল করিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু সে ভুল প্রজ্ঞা বা সৌজন্যের অভাবে ঘটে নাই। এক্ষণে কিন্তু এমন একজন বিচারক হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন যিনি জেফ্রিস্ (Juffreys) এবং স্ক্রগ্সের (Scroggs) সমতুল্য না হইলেও দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে বসিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সময়ে সময়ে আমরা বিচারপতি নরিশের বিচার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে চরম পরিণতি ঘটিয়াছে এবং আমরা আমাদের সহযোগী 'ব্রাহ্ম পব্লিক অপিনিয়ন্' নামক পত্রিকায় বর্ণিত ঘটনাটীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত 'ব্রাহ্ম পব্লিক অপিনিয়ন্' আমাদের প্রমাণ এবং ঘটনাটী তথায় নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে:— বিচারপতি নরিশের শেষ জবরদস্তির কায হইতেছে একটী শালগ্রাম শিলা বিচারালয়ে আনাইয়া পরীক্ষা করা। ভূতপূর্ব্ব সুপ্রীম কোর্টে ও বর্ত্তমান হাইকোর্টে হিন্দু দেব দেবী সংক্রান্ত বহু মামলা হইয়া গিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বে হিন্দুপরিবারের অধিষ্ঠিত দেবতাকে কখনও বিচারালয়ে টানিয়া আনা হয় নাই। ডেনিয়াল সদৃশ কলিকাতার এই বিচারক মহাশয় শালগ্রাম শিলাটীকে নিরীক্ষণ করতঃ

মন্তব্য করেন যে ইহা একশত বৎসরের পুরাতন হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে বিচারপতি নরিশ কেবল আইনেই অভিজ্ঞ নহেন পরন্তু তিনি হিন্দুর দেববিগ্রহ সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ। বাস্তবিক তিনি যে কি নহেন তাহাই বলা শক্ত। কলিকাতার সনাতন হিন্দুরা তাঁহাদের গৃহদেবতাকে বিচারালয়ে আনয়নজনিত অবমাননা সহ্য করিবেন কি না তাহা তাঁহাদেরই বিচার্য্য বিষয় কিন্তু আমাদের মনে হয় সাধারণের পক্ষ হইতে এরূপ খামখেয়ালি বন্ধ করিবার চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

শালগ্রামশিলা কেবল ব্রাহ্মণগণই পবিত্র দেহে পূজা করিতে পারেন। যে বিচারক নির্ম্মমভাবে জনমত উপেক্ষা করতঃ সেই গৃহদেবতাকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে আনাইয়া দর্শন করিতে সাহসী হন তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। ভারত সরকার কি এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না? জনসাধারণের ধর্ম্মবোধ গভর্ণমেণ্টের সযত্নে রক্ষার বিষয়।

কিন্তু এই বিচারক ন্যায় বিচারের নামে যাহা করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট দেবস্থান অপবিত্রকরণের ন্যায় বোধ হইবে। আমরা এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি এবং মনে হয় বিচারকের আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত।"

অধুনালুপ্ত 'ব্রাহ্ম পাব্লিক অপিনিয়নে' এই সংবাদটী প্রকাশিত হয়। হাইকোর্টের একজন সুপরিচিত এটর্ণী বাবু ভুবন মোহন দাসের সম্পাদকতায় পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতেছিল। এই সংবাদের কোনও প্রতিবাদ বাহির হয় নাই বলিয়া আমি ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম।

শীঘ্র হাইকোর্ট হইতে এই মর্ম্মে এক পরওয়ানা পাই যে কেন আমি আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হইব না। ২রা মে ইহা আমার উপর জারি করা হয় এবং ৫ই মে শুনানির দিন স্থির হয়।

একটী ফুলবেঞ্চ আমার বিচার করেন। যে পাঁচজন বিচারক আমার বিচার করেন তাঁহাদের মধ্যে স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র একজন। সেদিন সকালে আমি আমার বারাকপুরস্থ বাটী হইতে হাইকোর্টে আসিবার সময় কারাদণ্ডের সম্ভাবনার কথা স্ত্রীকে বলি এবং বিছানা ও কতকগুলি পুস্তক সঙ্গে লইয়া আসি।

সাড়ে দশ ঘটিকার সময় আমি বিচারালয়ে পৌছাই। বিচারালয়ের চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল এবং ছাত্রবৃন্দ দলে দলে একত্রিত হইতেছিল। বিচার শেষ হইলে যে সমস্ত ছাত্রেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাঁহাদের মধ্যে উত্তরকালে প্রথিতযশাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। বিচারালয়ের ভিতরেও তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। বেলা ১১টার পর অতি কষ্টে আমি যখন আমার ব্যারিষ্টারের সহিত বিচারকক্ষে প্রবেশ করিলাম তখনও বিচারকগণ উপস্থিত হন নাই। তাঁহারা প্রধান বিচারপতির সহিত দণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন কারণ ইংরাজ বিচারপতিগণ কারাদণ্ডের পক্ষপাতী হইলেও বিচারপতি রমেশ চন্দ্র মিত্র অর্থদণ্ডই ন্যায্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

বেলা সাড়ে ১১টার পর পাঁচজন বিচারপতি তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিলে প্রধান বিচারপতি তাঁহার অধিকাংশ সহযোগীদের অনুমোদিত রায়টী পাঠ করিয়া জানাইলেন যে তাঁহারা বিচারপতি মিত্রের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। রমেশচন্দ্র তখন তাঁহার বিরোধী রায় পাঠ করেন। বিচারপতিগণ বিচার কক্ষ ত্যাগ করিলে জনতা ধীরে ধীরে বহির্গত হয়।

পথে সহস্র সহস্র লোক তখন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বিচারালয়ের দ্বারে জেলের গাড়ি প্রস্তুত থাকিলেও জনতার ভাবগতিক দেখিয়া অন্য গাড়িতে আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলে লইয়া যাওয়া হয়। আমার কারাদণ্ডের সংবাদে কেবল কলিকাতা এবং এই প্রদেশেই নয় পরন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারাদণ্ডের দিন

কলিকাতায় ভারতীয়দের সমস্ত দোকান ও ব্যবসায় বন্ধ থাকে। কলিকাতায় এই বিক্ষোভ এত বিশাল জনতা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় যে কোনও উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় নাই বলিয়া বাজারগুলি ঐ জন্য ব্যবহৃত হয়। উন্মুক্ত স্থানে সভানুষ্ঠান ইহাই প্রথম এবং ঐ সভায় সহস্র সহস্র সাধারণ ব্যক্তি যোগ দেয় কারণ হিন্দুর দেবতাকে বিচারালয়ে আনিয়া হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করা হইযাছিল।

বাঙ্গালার একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ ভাবাবেগ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ব্যতীত আর কখনও দেখি নাই। প্রত্যেক সহরে সভা আহূত হয় এবং আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া হাইকোর্টের বিচারের প্রতিবাদ করা হয়। সকলেই এরূপ বিক্ষুব্ধ হন যে সরকারি কর্ম্মচারিবৃন্দও ইহাতে যোগ দেন। লাহোর, অমৃতসহর, আগ্রা, ফৈজাবাদ, পুনা প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট স্থান সমূহে আমার প্রতি সহানুভূতিসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে আমার কারাদণ্ড আরম্ভ হয় এবং আমেরিকার স্বাধীনতালাভের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় ৪ঠা জুলাই মুক্তিলাভ করি।

জেলে আমি প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম। আমাকে লেখাপড়া করিতে দেওয়া হইত। বেঙ্গলী পত্রিকার জন্য আমি জেল হইতে লিখিয়া পাঠাইতাম। আমার পত্রাদি পরীক্ষা না করিয়াই আমাকে দেওয়া হইত। সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। ফল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমার নিকট পাঠান হইত—তাহাতে কেহ বাধা দিত না। সন্ধ্যার সময় অন্যান্য কয়েদীগণের সহিত কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত করিতাম। বহুদিন যে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম লাভ করি নাই এক্ষণে তাহা ভোগ করি এবং সেইজন্য কারামুক্তির পর আমার ওজন কয়েক সের বৃদ্ধি হয়।

৪ঠা জুলাই প্রাতঃকালে আমি মুক্তিলাভ করি। পূর্ব্বদিন চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ষ্টীভেন্‌স্ সাহেব (**Mr. Stevens**) জেলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও আমার প্রত্যাবর্ত্তনে যাহাতে কোন বিক্ষোভ না হয় তাহার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। বারাকপুরস্থ বন্ধুগণ যেরূপ অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় যখন বারাকপুরে প্রত্যাগমন করি তখন তিনি রেল ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট আর একখানি গাড়িতে করিয়া আমার বাটী পর্য্যন্ত অনুগমন করেন। পরে জানিতে পারি যে আমার আগমনে বিশেষ বিক্ষোভের সম্ভাবনায় বারাকপুরস্থ সৈন্যনিবাসে সামরিক কর্ম্মচারিগণকে সমস্ত দিন সজ্জিত রাখা হয়। সরকারপক্ষের এইরূপ অহেতুক ব্যস্ততা আমার কারাদণ্ডের বিবরণ অধিক রাষ্ট্র করে এবং যে সমস্ত ব্যক্তি পৃথিবীর কোন সংবাদই রাখে না এমন কি তাহারাও ঘটনাটী জানিতে পারে।

নবম অধ্যায়।

রাজনৈতিক কার্য্য ১৮৮৩—১৮৮৫।

কারামুক্তির পর আমি পুনরায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিই। প্রথমেই আমি জাতীয় ধনভাণ্ডার সৃষ্টির আন্দোলনে যোগ দিলাম। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এক বিশাল জনসভায় ভারতবর্ষে ও বিদেশে বৈধ আন্দোলন দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির জন্য একটী জাতীয় ধনভাণ্ডার সৃষ্টির প্রস্তাব গৃহীত হয়। আদালত-অবজ্ঞার মামলা এবং নিখিল ভারতীয় একতালাভের উদ্দেশে ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলন আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছিল এবং সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশগুলিকে আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতে আমন্ত্রণ করি। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে সমগ্র ভারতের আশা আকাঙ্খা যে এক তাহা প্রমাণিত হয় সিভিল সার্ভিস আন্দোলনে; এই একতাবোধ যখন আদালত-অবজ্ঞার মামলায় বৃদ্ধি পাইল তখন আমরা সম্মিলিত ভারতের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কলিকাতায় যে জাতীয় সম্মেলন সংঘটিত হয় সেইখানেই ভারতের জাতীয় মহাসভার সূচনা দেখা যায়।

ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত বাদানুবাদ ভারতীয়গণের একতাবোধ তীব্রতর করে। এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় একটী রক্ষা-সমিতি গঠন করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে ইহার শাখা স্থাপিত করেন এবং নিজেদের কাল্পনিক স্বার্থরক্ষার জন্য একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের অধিক অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের একতাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও সঙ্গতি তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে সফল করে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায় ঔৎসুক্যসহকারে এই সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়া একতা ও সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। জাতীয় মহাসভার তখনও জন্ম হয় নাই কিন্তু ইহার উৎপত্তির হেতুগুলি ইলবার্ট বিল আন্দোলনে পুষ্টিলাভ করে এবং একবৎসর অতীত হইবার

পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার সংগঠনকার্য্যে আমি একটী বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন দিবস ব্যাপী স্থায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা শিক্ষিত ভারতবাসী ইলবার্ট বিল বিক্ষোভের উত্তর দেন। উক্ত জাতীয় সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছিল তাহারাই উত্তরকালে জাতীয় মহাসভার প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আমি পুনরায় উত্তরভারত ভ্রমণে বাহির হই। অধ্যাপনার জন্য আমি গ্রীষ্মাবকাশ ভিন্ন অন্য সময় বাহির হইতে পারিতাম না। মে মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লাহোর, অমৃতসহর, মুলতান, রাওলপিণ্ডি, আম্বলা, আগ্রা, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী ও বাঁকীপুর যাই। ভারতের বিভিন্ন জাতি ও প্রদেশের মধ্যে ঐক্যস্থাপন এবং বাঙ্গালার অধিবাসীগণের সহিত উত্তরভারতের সামরিক জাতিগুলির মিলনসাধনই আমাদের ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অনেকেই তখন মনে করিতেন যে উত্তরভারতের সামরিক জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন যে বাঙ্গালা দেশ হইতে একটীও সৈন্য প্রেরিত হয় না, সেই বাঙ্গালা দেশ হইতেই যত রাজনৈতিক আন্দোলনের আমদানি। আমরা ইহা সম্পূর্ণ অলীক প্রমাণ করিতে চাই। জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি এবং সম্মিলিত বহু শুভ প্রচেষ্টা আধুনিক ভারতের ঐক্য ও সমস্বার্থতা প্রমাণিত করিতেছে।

আমাদের অভিযোগ দশ বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় একই ছিল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্বন্ধে মিলিত ভারতবর্ষের দাবী তখনও গ্রাহ্য হয় নাই। সিভিল সার্ভিসের বয়স বৃদ্ধি করা হয় নাই, কেবলমাত্র ষ্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিসের দ্বারা সামান্য পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন হয়। সেইজন্য উত্তরভারতের বিশিষ্ট সহরে প্রত্যেক জনসভায় সেই দাবী পুনরায়

করা হয় এবং রাজনৈতিক কার্য্য প্রসারকল্পে বাঙ্গালা দেশের অনুরূপ একটী জাতীয় ধনভাণ্ডার সৃষ্টির আবেদন জানান হয়। শীঘ্র আমাদের আন্দোলনের ফল ফলে এবং ভারতসরকার ভারতসচিবের নিকট সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বয়সের সীমাবৃদ্ধির অনুরোধ করিয়া পত্র পাঠান। পর বৎসর একটী পব্লিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় এবং ইহার সুপারিশ ক্রমে বয়সের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হয় তাহাই বর্ত্তমানে বলবৎ আছে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার সম্মানার্থ যে বিরাট আয়োজন হয় তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। সরকারের নিকট ইহা একটী রহস্যোদ্ভেদের ন্যায় বোধ হয় কারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন যে ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনযাত্রার ও সহযোগিতার যে মনোভাবের আভাষ ইহাতে পাওয়া যায় তাহা ভবিষ্যতে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিবে। লর্ড রিপণ যে আমাদের জন্য খুব বেশী কিছু করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে কিন্তু তাঁহার সদিচ্ছা, আদর্শের উচ্চতা ও জাতিনির্ব্বিশেষে সমদৃষ্টি সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবাসীরা অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য এই আয়োজন করেন।

লর্ড রিপণের পর লর্ড ডাফ্‌রিন্‌ ভারতবর্ষের বড়লাট হন। বিলাতে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। তাঁহার কলিকাতায় আগমনের পর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান তাঁহাকে যে মানপত্র দান করেন তাহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি নূতনভাবে গঠনের আবশ্যকতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর ভারতের জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পূর্ব্বে আমার রচিত এই মানপত্রখানি বড়লাট বাহাদুরকে প্রদান করা হয়।

ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রসারের চেষ্টা আমরা পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলাম। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর রাজত্ব পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে যখন কলিকাতায় উৎসব হয় তখন কর্পোরেসানের তদানীন্তন সভাপতি হ্যারিসন্ সাহেব আমাকে ঐ উৎসবে সহযোগিতা করিতে আমন্ত্রণ করেন ও মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটীগুলি হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপর অর্পিত হয়। আমি এই সুযোগে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটী যাহাতে লাট সাহেবকে অভিনন্দনপ্রদান কালে ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন তাহার ব্যবস্থা করি। লর্ড ডাফ্‌রিন এই সকল অভিভাষণের উত্তর প্রদান কালে ব্যবস্থাপক সভাগুলির পুনর্গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঠিক পাঁচবৎসর পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইহার ফল লাভ হয়। লর্ড ডাফ্‌রিন্ ব্যবস্থাপক সভা পুনর্গঠনের প্রস্তাব বিলাতে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে কতিপয় ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করেন। তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া বহুক্ষণ তাঁহার প্রাসাদে আমার সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ব্যবস্থাপক সভাগুলি নির্ব্বাচন প্রথায় পুঃনপ্রতিষ্ঠিত করিবার ও সদস্যগণকে যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাদানের অভিমত প্রকাশ করি। বন্ধুর ন্যায় তিনি আমার সহিত আলোচনা করেন এবং অবশেষে তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারির সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া তাঁহাকে আমার আবশ্যকীয় সমস্ত তথ্য জানাইতে আদেশ দেন।

যে বৎসরের ঘটনা বর্ণনা করিতেছি তাহা আমার পক্ষে কঠোর পরিশ্রমবহুল ছিল। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য হুগলি জিলায় সরকার আউট্‌ষ্টিল্ (খোলাভাঁটি) প্রথার প্রচলন করেন। ইহাতে দেশী মদ্যের দাম প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া যায় এবং তজ্জন্য মদ্যপান অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মদ্যপানের বীভৎস পরিণাম সম্বন্ধে জেলার অভ্যন্তর হইতে বহু সংবাদ পাইয়া স্বচক্ষে দেখিবার জন্য হরিপালে একটী মদ্যের দোকানে যাই। তথায়

যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। ছয় জন নরনারী ভূতলে উন্মত্তবৎ পড়িয়া ছিল এবং আর একটী দল স্ত্রীপুরুষ উন্মত্ত অবস্থায় আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। বল প্রকাশের আশঙ্কা দেখিয়া আমি অতি সাবধানে দোকান হইতে বাহির হইয়া আসি এবং যথাসাধ্য ইহার প্রতিরোধ করিতে মনস্থ করি।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি গৃহে প্রত্যাগমন করি। সস্তায় মদ্য বিক্রয়েব এই ভয়াবহ পরিণাম হইতে জনসাধারণকে উদ্ধার করিতে হইলে দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভব করিলাম। আমরা দ্বিবিধ কার্য্যের আবশ্যকতা দেখিলাম। প্রথমতঃ জনসাধারণকে মিতাচার শিক্ষা দিতে হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ঐ প্রথাটী রহিত করেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনমত এক হইলে গভর্ণমেণ্ট আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না ভাবিয়া প্রথমে জনসাধারণের ভিতর প্রচারই যুক্তসঙ্গত বিবেচনা করিলাম। এইরূপে কার্য্য করিয়া আমরা সফলতা লাভ করি এবং তজ্জন্য ভবিষ্যতে এই পন্থাই অনুসরণ করি।

হুগলি জেলায় কতকগুলি জনসভার আয়োজন করিয়া আমরা আন্দোলন আরম্ভ করি। উন্মুক্ত আকাশতলে জল বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র নরনারী এই সমস্ত সভায় যোগ দান করে। অতি সরল ও প্রচলিত ভাষায় এই সকল সভায় বক্তৃতা দেওয়া হইত। জনসভায় বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা ইহার পূর্ব্বে না করিলেও সামান্য চেষ্টা করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম। ইহাতে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইল এবং পরে যখন ‘স্বদেশী আন্দোলন’ উপলক্ষ্যে বহু জনসভায় বক্তৃতা করিতে হইত তখন এই শিক্ষা আমার উপকারে লাগে। এই সকল সভায় খোল ও করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন হইত কারণ ইহাতে সবিশেষ ফল পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে বহুদূর হইতে গ্রামবাসীরা আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করিত। সঙ্গীত এই

আন্দোলনের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল এবং সুগায়ক বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয় যখন তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতগুলি সুমিষ্টস্বরে গাহিতেন তখন যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হইত। এই আন্দোলনের সকল কর্ম্মীই মাসের পর মাস নিঃস্বার্থভাবে এই প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন।

এই সকল দেশসেবকগণের স্মৃতিপূজা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। ভবিষ্য বংশীয়গণ পূতচরিত্র কৃষ্ণ কুমারকে নিঃস্বার্থ পরিহিতব্রতীরূপে শ্রদ্ধা করিবে। ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে প্রধান ছিল এবং রাজনীতি তিনি ধর্ম্মের অঙ্গরূপে দেখিতেন। জনহিতকর কার্য্যে তিনি ধর্ম্মের সন্ধান পাইতেন।

তাঁহাকে দেখিলে বিলাতের শুদ্ধাচারী অতিনৈষ্ঠিক ব্যক্তিগণের (পিউরিট্যান) কথা মনে পড়িত। তাঁহার প্রকৃতি ছিল সাধুর ন্যায় এবং আত্মপ্রত্যয় ছিল দৃঢ়। জীবনের সুখ সুবিধার প্রতি তিনি চিরকাল উদাসীন ছিলেন এবং কৃত্রিমতা তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করিতেন। পিউরিট্যানদের সহিত কিন্তু তাঁহার পার্থক্য ছিল এবং তাহা তাঁহার সহৃদয় ও কমণীয় ব্যবহারেই প্রকাশ পাইত। প্রত্যেক সৎকার্য্যেই তিনি যোগ দিতেন। স্বদেশী আন্দোলনে এবং বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। তিনি বৈধ উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিপ্লবাত্মক কার্য্য কখনও সমর্থন না করিলেও তাঁহার এই নির্ব্বাসনদণ্ড আমার মতে কর্ত্তৃপক্ষের একটী বিশেষ ভুল এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমি যখন ইণ্ডিয়া আফিসে লর্ড মর্লির সহিত সাক্ষাৎ করি তখন আমি তাঁহাকে একথা বলিয়াছিলাম।

আমরা জনসভা অনুষ্ঠান করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই; আউটষ্টিল (খোলাভাঁটি) প্রথা রহিত করিবার জন্য আবেদনও জানাই। আমাদের আবেদন সাফল্যমণ্ডিত হয় কারণ আমরা একদিকে দেশবাসীর ও

অপরদিকে কেন্ (Mr. Caine) সাহেব চালিত মাদকনিবারিণী সমিতির সমর্থন লাভ করি। আমাদের আবেদনক্রমে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য হাওড়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ ওয়েষ্টমাক্‌ট্ সাহেবকে (Mr. Westmacott) নিযুক্ত করেন এবং তাহার ফলে ঐ প্রথা রহিত হয়। হুগলি জেলার দরিদ্র অধিবাসীরা এই রূপে ঐ ভয়াবহ ব্যবস্থার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

ইহার পর বহুদিন গত হইয়াছে কিন্তু ঐ ভয়াবহ প্রথা উচ্ছেদকল্পে আমার প্রচেষ্টা জীবনের একটী আনন্দদায়ক স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছে। আমাদের কার্য্য কঠিন ছিল সন্দেহ নাই কারণ আমাদের পথহীন প্রান্তরে ভ্রমণ, ম্যালেরিয়াপূর্ণ দেশে বাস ও আশ্চর্য্য খাদ্য ভোজন করিতে হইত। একবার ব্যঞ্জনের সহিত একটী মৃত সরীসৃপ (Centipede) আমাকে রাঁধিয়া দেওয়া হয়। ক্ষুধার সময় সরীসৃপটী বাদ দিয়া ব্যঞ্জন আহার করিতে দ্বিধা করি নাই এবং তজ্জন্য কোনও শারীরিক ক্ষতিবোধও করি নাই। এই সমস্ত কষ্ট মহৎব্যাপারের আনুষঙ্গিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতাম এবং পরে বন্ধুবান্ধবদের আনন্দের উপাদানরূপে বর্ণনা করিতাম। কিন্তু এই সময় আমি বাঙ্গালার কৃষককুলের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করি এবং ইহা উত্তর কালে আমার জীবনে বহু উপকারে লাগে।

দশম অধ্যায়।

ভারতের জাতীয় মহাসভা।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় পরিষদের (National Conference) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই নিখিল ভারতীয় অধিবেশন কলিকাতার তিনটী প্রধান প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক আহূত হয়। জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকুলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনুকুলে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ এবং মিষ্টার আমীর আলির সম্পাদকতায় সেণ্ট্রাল মহমেডান্ এসোসিয়েসান্ উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়াছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে, ২৬ শে ও ২৭ শে ডিসেম্বর তিন দিবস ব্যাপী উক্ত অধিবেশন সম্পন্ন হয়। বাঙ্গালা দেশে ব্যতীত মীরাট, বারাণসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বহু নগর হইতে প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার বোম্বে হইতে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধি বিশ্বনারায়ণ মান্দলিক এই অনুষ্ঠানে বোম্বের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। এই সম্মেলনে ব্যবস্থাপক সভাগুলি সত্বর পুনর্গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই সমস্যা সমাধানের সন্তোষজনক উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটী কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠান কালে অনুরূপ কার্য্যসূচি ও উদ্দেশ্য সহ ভারতের জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন হইতেছিল। সভাপতি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (Mr. W. C. Bonnerjee) আমাকে জাতীয় মহাসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করিলে কলিকাতা অধিবেশনে আমি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া তখন কলিকাতা ত্যাগ আমার পক্ষে অসম্ভব জানাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন্ মডারেট্ দল কংগ্রেস ত্যাগ করে তখন পর্য্যন্ত মাত্র দুইবার আমি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারি নাই।

কলিকাতায় উক্ত জাতীয় পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন কালে আমাদের কতিপয় বন্ধু স্বর্গীয় এলেন হিউমের (Allen Hume) নেতৃত্বে অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া মাদ্রাজে সম্মিলিত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন সম্বন্ধে কয়েকটী তথ্য জানাইতে বোম্বে প্রদেশ হইতে কাশিনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্‌ আমাকে অনুরোধ করেন। প্রায় এক সময়ে এই দুইটী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং অনুরূপ মতামত ও অভাব অভিযোগ প্রকাশ করে। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনটী জাতীয় পরিষদ (National Conference) ও বোম্বে প্রদেশেরটী ভারতীয় জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress) নামে অভিহিত হয়। অতঃপর আমরা সকলেই জাতীয় মহাসভায় যোগ দিয়া একযোগে কার্য্য আরম্ভ করি।

বাঙ্গালা দেশের সমস্যাগুলি সমাধানকল্পে কংগ্রেসের কার্য্যসূচি অনুযায়ী আমরা বাঙ্গালায় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করি। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমরা প্রথম বাঙ্গালা প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করি। জাতীয় মহাসভা নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া কোন প্রদেশের নিজস্ব সমস্যা আলোচনা করিত না। প্রত্যেক প্রদেশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও এমন কি স্বায়ত্তশাসনের সমস্যাগুলি বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে এবং সেই জন্য প্রদেশের প্রতিনিধিরা একত্র হইয়া ঐ গুলি আলোচনা করিতে মনস্থ করেন।

অন্যান্য প্রদেশগুলি বাঙ্গালার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে অধুনা প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়া থাকে. বাঙ্গালাদেশে প্রাদেশিক সম্মেলনগুলির সংখ্যা সময়ে সময়ে কংগ্রেসের সংখ্যা অতিক্রম করিয়াছে। কখনও কখনও এই সম্মেলনের অন্তে দেশের গুরুতর সামাজিক সমস্যাগুলি মীমাংসাকল্পে সামাজিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা দেশে সামাজিক সমস্যাগুলি আর কেবল

আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হয় না কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিষয়ে অধুনা যে ঐকান্তিক আগ্রহ অনুভব করিতেছেন তাহার পরিচয় সামাজিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার সময় বহুবার পাইয়াছি। হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ এবং কন্যাদের বিবাহের বয়সবৃদ্ধি—এই দুইটী সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যতটা অগ্রসর আমাদের সমাজের হওয়া উচিত ততটা হয় নাই। যে নির্ম্মম দেশাচার বহু হিন্দুবিধবার জীবনের সুখশান্তি চিরতরে নষ্ট করিয়া হিন্দুগৃহ তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার উচ্ছেদকল্পে আর এক ভবিষ্যৎ বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন। ১৯১৪ সালে কুমিল্লা সামাজিক সম্মেলনে যে সজীব বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহা এখনও আমার মনে আছে। তিন সহস্রের অধিক জনপূর্ণ ঐ সম্মেলনে কেবলমাত্র বারজন বিধবা বিবাহের বিপক্ষে মত দেন। কিন্তু যাঁহারা এই সংস্কারের স্বপক্ষে মত দেন তাঁহাদের অনেকেই বোধ হয় কার্য্যতঃ ইহা অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন না। কথায় এবং কার্য্যে এখনও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় কিন্তু জনমত ক্রমেই সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং এই নৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে হিন্দুসমাজ হইতে এই প্রথার উচ্ছেদ শীঘ্রই আশা করা যায়। শিক্ষিত সমাজ অধুনা উপলব্ধি করিতেছে যে নারীজাতির প্রতি যে প্রথা এদেশে এত অধিক অবিচার করিয়াছে তাহার স্থান সভ্যজগতের অন্য কোথাও নাই। আমরা হয়ত সমাজের সেই পরিবর্ত্তন দেখিব না কিন্তু স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় সামাজিক মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি যখন বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিয়া ঐ সংস্কারের সমর্থন করেন তখন আমরা যে সম্পূর্ণ সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছি তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ বিধবারে বিবাহের জন্য পাত্রের বিজ্ঞাপন বেঙ্গলী পত্রিকায় দুইএকবার দেওয়া হয় এবং তাহার যে প্রত্যুত্তর পাইয়াছিলাম তাহা বাস্তবিক বিস্ময়কর। আমার কয়েকটী সনাতন পন্থী বন্ধুকে এইগুলি

দেখাইলে তাঁহারা আমার অপেক্ষাও বিস্মিত হন। অদৃশ্যভাবে সমাজের অভ্যন্তরে একটী বিরাট শক্তি কার্য্য করিতেছে এবং যথাসময়ে তাহা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া মনে হয়। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও বজ্রযোগিণী যতই শাস্ত্রের দোহাই দিক অগ্রগতি তাহাতে বন্ধ হইবে না এবং এমন একটী সময় আসিবে যখন ভবিষ্যবংশ এই নির্ম্মম প্রথা কিরূপে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইত এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবে। ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অজ্ঞাত কিন্তু অতীতের ইতিহাস আমরা জানি এবং তাহাতেই দেখি যে সনাতন ধর্ম্মের আবেষ্টনে যখন রঘুনন্দন হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের বিশ্লেষন করিতেছিলেন প্রায় সেই সময়েই বাঙ্গালার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, প্রেম ও ভক্তির অগ্রদূত শ্রীচৈতন্যদেব নরনারীর প্রভেদ ভুলিয়া ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও মুসলমানকে সমজ্ঞান করিতেছিলেন। কে বলিতে পারে হিন্দুবিধবার দুর্গতি মোচনার্থে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিবেন না ?

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন প্রথম কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হন। আমরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সমস্ত সদস্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কংগ্রেস সেবক ছিলাম কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসি-য়েসন জমিদারগণের স্বার্থের পরিপোষক হইয়াও জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে যোগ দেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং বাঙ্গালার প্রাচীন জমিদার ঊনঅশীতি বর্ষীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাদাভাই নৌরজীকে ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার প্রস্তাব করেন। প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এই অধিবেশন স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিল যে বয়স ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে ভারতের সমস্ত সম্প্রদায় কংগ্রেসের পাদপীঠে দেশের কল্যান কামনায় একত্রিত হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্র এবং মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরকে লইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসানের রাজনৈতিক দলটী গঠিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাদের নেতা ছিলেন কিন্তু পাণ্ডিত্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দিগম্বর মিত্র এবং কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর রাজা রাজেন্দ্রলালের উপর নেতৃত্ব ভার পড়ে। প্রতিভাদীপ্ত এই ব্যক্তিগণের বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব আমি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সুলেখক ছিলেন। প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিলাভ করেন কিন্তু গণসমস্যাগুলি বুঝিবার ক্ষমতার জন্য তিনি তাঁহার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ জনসেবকরূপে সম্মান লাভ করেন। তাঁহারা সরল এবং হাস্যরসপূর্ণ বক্তৃতা আমি বহুবার শুনিয়াছি। উত্তরকালে তিনি কানে কম শুনিতেন এবং সেইজন্য কর্পোরেশনের সভায় বিতর্ককালে কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহার বক্তৃতাগুলির সারাংশ লিখিয়া দিতেন। এইরূপে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি জনসাধারণের ব্যাপারে যোগ দিতেন বলিয়া সমাজের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মাননীয় নেতৃগণকে অবজ্ঞা করিবার অভ্যাস তখনও দেখা দেয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তীগণের স্বদেশের জন্য নিঃস্বার্থ কার্য্যাবলি তখনও জনসাধারণের মনে রেখাপাত করিত।

কলিকাতা কংগ্রেস ও পরবর্ত্তী কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে আমি ব্যবস্থাপক সভাগুলির পুনর্গঠন ও ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রস্তাব করি কারণ আমার নিকট ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হইত এবং তখন ইহা আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। দুর্ব্বলতা অথবা শক্তির নিদর্শন তাহা জানি না কিন্তু ইহা সত্য যে আমার জীবনে আমি সর্ব্বদাই একটী না একটী বিশেষ আদর্শের সাময়িক অনুপ্রেরণায় কার্য্য করিয়াছি। ইহা কখনও সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত সমস্যা, কখনও স্বায়ত্তশাসন কখনও বা ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন কিংবা স্বদেশী আন্দোলনের আকার

ধারণ করিয়া আমার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিত। সাময়িকভাবে আমি আমার আদর্শের মধ্যেই যেন নিজের সত্বা উপলব্ধি করিতাম এবং সেইজন্য আদর্শটী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমার কার্য্য গতানুগতিক ভাবে চলিত। নিজে যখন বোধ করিতাম যে আদর্শটী লাভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তখন অপরকে তাহা বোঝাইতে কষ্ট হইত না। আমার নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতে একটু বিলম্ব হইত কিন্তু একবার অনুপ্রাণিত হইলে আর কোনও রূপ বাধা মানিতাম না এবং তখন নিজের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া নিজের সৃষ্ট এক জগতে বাস করিতাম। সেইজন্য যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সরকার পক্ষ হইতে আমাদের পুনঃ পুনঃ জানান হইতেছিল যে বাঙ্গালার কৃত্রিম বিভাগটী অপরিবর্ত্তনীয় তখন ইহা রহিত করিবার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছিলাম। অপর সকলে যাহা সহজ সত্য ভাবিত আমি তাহা সেইরূপে দেখিতাম না। বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতাম বলিয়া অবিশ্বাসীর নিকট যাহা অসম্ভব তাহা আমি সম্ভব ভাবিতাম।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন সম্পন্ন হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানির একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া বহু প্রতিনিধি কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন। উত্তরকালে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম সদস্য রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ আমাদের মধ্যে ছিলেন। সমুদ্রভ্রমণ আমরা বিশেষ উপভোগ করি এবং কার্য্য ও আনন্দের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটে। সেই যুগের প্রবীন ও বিচক্ষণ প্রতিনিধিবর্গ যাঁহারা জাহাজে করিয়া মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগ দিতে যাইতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে প্রায় সকলেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের শক্তি সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করিতেছে। প্রথম উচ্ছ্বাস কাটিয়া গেলেও একথা সকলেই এখনও বিশ্বাস করে যে ভারতবর্ষ স্বরাজলাভ না করা পর্য্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলন চালাইতে ক্ষান্ত হইবে না।

মাদ্রাজে আমরা যে সহৃদয় আতিথেয়তার পরিচয় পাই তাহা এখনও আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে এবং তদবধি কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি সেই ধারা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও উচ্চপদস্থ স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ দিবারাত্র সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্টব্যক্তির স্থায়ী বন্ধুত্ব তথায় আমরা লাভ করিতে সক্ষম হই। বীররাঘব চারিয়া, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রঙ্গ নাইড়ু, আনন্দ চারলু এবং অন্যান্য ব্যক্তির সহিত গাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কংগ্রেস আন্দোলনে এই সামাজিক দিকটী অতীব প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক কারণ এইখানেই ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ পরস্পর মতামত ব্যক্ত করিয়া একটী বন্ধুত্বের ভাব আনয়ন করিতে সক্ষম হন।

অস্ত্র আইন (Arms Act) সম্বন্ধে এক সজীব বিতর্কের জন্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অস্ত্র আইন রহিত করিবার জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। লর্ড লিটনের শাসনকালে অস্ত্র আইন ও সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী প্রচলিত হয়। অবিশ্বাসের যে নীতির উপর লর্ড লিটন শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন এই আইন দুইটী তাহারই ফল। লর্ড লিটনের পর লর্ড রিপণ এই অবিশ্বাসের নীতি দূর করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্লাডষ্টোন্ সাহেব (Gladstone) প্রথমে এই দুইটী আইনের বিরুদ্ধতা করিলেও ক্ষমতা লাভের পর তিনি কেবল সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী রহিত করেন কিন্তু অস্ত্র আইনটী বরাবরই সকলের বিরক্তির কারণ স্বরূপ থাকিয়া যায় এবং সেইজন্য কংগ্রেসের বহু অধিবেশনে ইহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মাদ্রাজ অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব ডক্টর ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় অস্ত্র আইন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের এই মর্ম্মে একটী সংশোধন আনয়ন করেন যে কেবলমাত্র স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই অস্ত্র ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহাতে আমি যোগ

দিয়া উক্ত সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং অবশেষে মূল প্রস্তাবটী এই সর্ত্তে গৃহীত হয় যে সরকার কারণ প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবেন। এক্ষণে কিন্তু অস্ত্র আইন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কারণ কংগ্রেস উক্ত আইনটী সম্পূর্ণ রহিত করিতে চান না।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। তখনও কংগ্রেসের বিধিগুলি স্থষ্ট হয় নাই। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত নিয়মাবলি ও কার্য্যবিধি যখন সবে প্রস্তুত হইতেছিল সেই সময় একটী দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হয় যখন তাহিরপুরের রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় গোহত্যা নিবারণের প্রস্তাব আনয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্মেলনে এরূপ প্রস্তাব সর্ব্বসময়ে বিশেষতঃ সেই সময় অসুবিধাজনক ছিল। স্যর সৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্বে মুসলমান সমাজ কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিত। পেট্রিয়টিক এসোসিয়েসানের অধীনে তাঁহারা জাতীয় আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধতা করিতেছিলেন। আমাদের সমালোচকগণ কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিলেও আমরা এই জাতীয় কার্য্যে মুসলমানগণের সহযোগিতালাভের প্রাণপন চেষ্টা করি। সময়ে সময়ে আমরা মুসলমান প্রতিনিধিগণের ভাড়া দিতাম এবং তাঁহাদের অন্যান্য সুবিধাও প্রদান করিতাম।

রাজা শশীশেখরেশ্বরের উক্ত প্রস্তাবটী আমাদের দুর্ভাবনার কারণ হইল। এই বিপদে আমরা যেভাবে ঐ সমস্যার সমাধান করি তাহাই পরে জাতীয় মহাসভার বিধিতে পরিণত হয়। আমরা স্থির করিলাম যে কোনও বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় প্রস্তাব যদি উক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি কর্ত্তৃক নিন্দিত হয় তাহা হইলে জাতীয় মহাসভায় উহার আলোচনা করা হইবে না। আর একবার লাহোর কংগ্রেসে পাঞ্জাব ভূমি-হস্তান্তরকরণ আইন (Punjab Land Alienation Act) সম্বন্ধে আলোচনাকালে উপরোক্ত বিধি প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে জাতীয় মহাসভার যে অনুষ্ঠান হয় তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কংগ্রেসের সেই শৈশবে যে সমারোহপূর্ণ আয়োজন প্রথম এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সত্যই অপূর্ব্ব এবং কয়েকটী ঘটনার জন্য ইহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। লর্ড ডাফরিণের মতাবলম্বী স্যর অক্‌লাণ্ড কলভিন্ কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং যখন হিউম্ সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় শিক্ষিত ভারতবাসীকে কংগ্রেসে যোগ দিতে অনুরোধ করিতেছিলেন তখন যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পথে বহু প্রতিবন্ধক আনয়ন করেন। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত অযোধ্যানাথ কিন্তু একাই একশ' ছিলেন। তিনি যে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব ছিলেন তাহা নহে পরন্তু তিনি স্বদেশপ্রাণ ও গঠনকুশল ছিলেন এবং সেইজন্য ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ কংগ্রেস সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই সাফল্য সরকারের প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও জনমতেরই বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল।

কাশীর রাজা শিবপ্রসাদকে সরকারপক্ষীয় হইয়াও প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করিতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য বোঝা যায় এবং সকলেই তখন বুঝিতে পারেন যে ইহা একটী রাজনৈতিক চাল মাত্র। যখন জানা গেল যে তিনি কংগ্রেসের মঙ্গলসাধন চাহেন না তখন নর্টন সাহেব তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া যে বক্তৃতা দেন তাহাতেই তাঁহার কার্য্যের সমুচিত উত্তর দেওয়া হয়।

জর্জ্জ ইউল্ সাহেব এলাহাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনিই জাতীয় মহাসভার প্রথম অভারতীয় সভাপতি। ভারতীয় আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ উদারহৃদয় এরূপ বিদেশী ব্যবসায়ী আমি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। বরাবর তিনি কংগ্রেসের

বন্ধু ছিলেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতে কংগ্রেস প্রতিনিধি প্রেরণ করেন তখন তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বিলাতে আমাদের প্রচার কার্য্য যথেষ্ট বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

জাতীয় মহাসভার ইতিহাসে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ একটী স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর ব্রড্‌ল সাহেবের ভারত আগমনে কংগ্রেস আন্দোলন নূতন উদ্দীপনা লাভ করে এবং পরবৎসরই তিনি ব্যবস্থাপক সভাগুলির পুনর্গঠন ও প্রসারণের জন্য কমন্স সভায় বিল উত্থাপন করেন। বোম্বে অবস্থানকালে তিনি বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ঐ বিষয়ে যে মতামত সংগ্রহ করেন তাহাই তাঁহার পাণ্ডুলিপিটীর ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। প্রস্তাব উত্থাপন ব্যতীত সে বৎসর কংগ্রেসে আমি আর একটু কার্য্য করি। অর্থের জন্য আমাকে আবেদন করিতে হয়। আমার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল জনসভায় এক অননুভূত উৎসাহ লক্ষিত হয় এবং একঘণ্টার মধ্যে সমবেত জনমণ্ডলী হইতে চৌষট্টী হাজার টাকা দিবার স্বীকার পাওয়া যায় ও কুড়ি হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। গণআন্দোলনের ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা। সমবেত জনতা হইতে মহিলাগণ ঘড়ি ও অন্যান্য অলঙ্কার খুলিয়া দেন। ঐ দিনের স্মৃতি আমি কখনও ভুলিব না। আরও দুইবার আমি অনুরূপ আবেদন করিয়াছিলাম। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্য্যাতিত ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য আমাকে আবেদন করিতে হয় কিন্তু বোম্বের ন্যায় কোথাও অত অধিক সাড়া পাওয়া যায় নাই। ব্রড্‌ল সাহেব স্বচক্ষে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এবং স্বদেশভক্ত এক জাতির রাজনৈতিক উন্নতিকল্পে তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার মূলে ঐ দিনের প্রভাব কার্য্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

একাদশ অধ্যায়।

কংগ্রেস কর্ত্তৃক বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ।

বিলাতের জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য একটী প্রতিনিধি দল প্রেরণের প্রস্তাব বোম্বে কংগ্রেসে গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন ও প্রসারণ তখন কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং বোম্বে কংগ্রেসে কি উপায় উহা সাধিত হইতে পারে তাহারই একটী নক্সা প্রস্তুত হয়। উক্ত প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভাগুলি পুনর্গঠনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিবার জন্য ব্রড্‌ল সাহেবকে অনুরোধ করা হয়। আমি ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হই:— হিউম্ সাহেব, স্যর ফিরোজসা মেটা, মনমোহন ঘোষ, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরফ্ উদ্দীন, নর্টন এবং আর, এন, মুধোলকার।

প্রত্যেক প্রতিনিধি স্বীয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিদের আর্থিক অবস্থা আমি জানিতাম না কিন্তু আমার অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল ছিল না। আমার মোট সম্পত্তি তখন মাত্র তের হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট ঋণ পত্র এবং উহা আমার স্ত্রীর নামে ছিল। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে চারি হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে। আমি আমার সম্পত্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশ এইভাবে ব্যয় করিতে কোনরূপ দ্বিধা করি নাই। আমার স্ত্রীও স্বেচ্ছায় ও আনন্দে উক্ত অর্থ আমার হস্তে অর্পণ করেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করেন এবং এইরূপে কংগ্রেস প্রথম বিলাতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতঃ যে শাসন সংস্কারের সূচনা করেন তাহারই শেষ লক্ষ্য ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা।

দেশবাসীর শুভেচ্ছা বহন করিয়া আমরা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যাত্রা করি এবং এপ্রিলের প্রথমভাগে লণ্ডন পৌঁছাই। লণ্ডনে

কংগ্রেসের যে ব্রিটিশ কমিটি ছিল তাহাই আমাদের সভানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করেন। ক্লার্কেনওয়েল রোডে স্যার উইলিয়াম ওয়েডার-বার্ণের সভাপতিত্বে প্রথম সভার আয়োজন হয়। সে দিনের স্মৃতি অদ্যাপি আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। জর্জ্জ ইউল্ সাহেবের অতিথিরূপে ন্যাসানাল্ লিবারাল ক্লাবে আমরা ভোজন সমাপ্ত করিয়া ক্লার্কেনওয়েল অভিমুখে যাত্রা করি। সভায় মিষ্টার এইচ্, ই, এ, কটনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার পিতা স্যার হেন্‌রি কটন শুভেচ্ছা জানাইয়া পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। জর্জ্জ ইউল্ সাহেব পথে যাইতে যাইতে আমাকে বলেন যে ভারতীয় ও ইংরাজ শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প। উভয়েই দীর্ঘ বক্তৃতা ও নীরস বিবরণ পচ্ছন্দ করেন না কিন্তু হৃদয়াবেগে আঘাত লাগিলে বিচলিত হন। আমি শীঘ্র এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলাম। একদিন ম্যান্‌চেষ্টারে চেম্বার অব্ কমার্সের একটী সভায় আমার বক্তৃতার পর একটী ভদ্রলোক বলেন যে ভারতীয় ব্যাপারে তিনি কখনও পূর্ব্বে অত অবহিত হন নাই। অনেক সময় জনসভায় বক্তৃতার পর পুনরায় আমাদের তথায় যাইতে অনুরোধ করা হইত। দক্ষিণ ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে জনসভাগুলির অনুষ্ঠানের যিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তিনি কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির নিকট যে বিবরণী দাখিল করেন তাহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিত হয়ঃ—

"প্রত্যেক জন সভায় শ্রোতৃবৃন্দ সুরেন্দ্র নাথের বক্তৃতা পুনরায় শ্রবণ করিতে চান এবং ইহা সত্য যে তাঁহার উপস্থিতি এই আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিবে কারণ যে সমস্ত স্থানে ইতিমধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই সব স্থানেও বহু জনসমাগম হইবে যদি তিনি উপস্থিত থাকেন। আমি সুরেন্দ্র নাথ ও হিউম্ সাহেবকে পূর্ব্বেই এই বিষয় জানাইয়াছি এবং এক্ষণে কমিটির অবগতির জন্য ইহা লিখিতেছি। এই প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করাইয়া দিই যে কার্ডিফে সভানুষ্ঠানের অব্যবহিত

পরেই মিষ্টার আর, এন, হল দক্ষিণ ওয়েলস উদারনৈতিক সঙ্ঘের তরফ হইতে সুরেন্দ্রনাথকে বিলাতত্যাগের পূর্ব্বে কার্ডিফে পুনরায় যাইয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন ও এই আশ্বাস দেন যে তাঁহার উপস্থিতিতে সহস্র সহস্র জনসমাগমের সম্ভাবনা আছে।"

আমরা ইংলণ্ড, ওয়েলস্ এবং স্কট্‌লণ্ডের অধিকাংশ সহরেই সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং অবশেষে গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের কার্য্য শেষ করি। লর্ড ক্রস্ ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রসারের জন্য যে বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় বার আলোচনা কালে গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব উহার এবং নির্ব্বাচন প্রথার স্বপক্ষে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে স্বীকৃত হন। আমাদের আশা তিনি পূর্ণ করেন এবং যদিও নির্ব্বাচন প্রথা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই তথাপি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের বিধি অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটী ও জিলা বোর্ডগুলি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য প্রেরণের অধিকার পান এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী সদস্যগণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য প্রেরণের অধিকার লাভ করেন। প্রত্যেক সদস্যকে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার স্বীকৃত হয়। এইরূপে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস প্রেরিত প্রতিনিধিগণের চেষ্টায় প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রথম সোপান লাভ হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আর একটী বিধি দ্বারা শাসনব্যবস্থায় আরও অধিকার দান করেন কিন্তু প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের বিধি দ্বারা।

এক্ষণে আমাদের দলের বিভিন্ন প্রতিনিধিগণের সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। জাতীয় মহাসভার সৃষ্টিকর্ত্তা এলেন্ হিউম্ সাহেব প্রথম হইতে এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। উপযুক্ত পিতার এই উপযুক্ত পুত্রের সহযোগিতা আমাদের মনে উৎসাহ সঞ্চার

করিত। মিষ্টার মুধোলকার পরে যোগদান করেন কিন্তু যখন তিনি কার্য্যে নামেন তখন তিনি ঐকান্তিক ভাবেই কার্য্যে অগ্রসর হন। সৈয়দ আলি ইমাম সাহেব প্লাইমাউথে আমাদের সহিত মিলিত হন। তখন তিনি সবে ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। দাদাভাই নৌরজি ও স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ সময়ে সময়ে তাঁহাদের উপস্থিতি ও বক্তৃতাদ্বারা আমাদের সাহায্য করিতেন। ইয়ার্ডলি নর্টন সাহেব পরে যোগদান করিলেও যথেষ্ট কার্য্য করেন। অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বিতর্কসভায় নিম্নলিখিত কংগ্রেস প্রস্তাবটী তিনিই উপস্থিত করেন ঃ—"সম্প্রতি হাউস অব কমন্সে উপস্থিত বিলে নির্ব্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া এই সভা দুঃখপ্রকাশ করিতেছে"। উক্ত বিতর্কসভায় আমার বক্তৃতার নিম্নোক্ত অংশটী নর্টন সাহেব প্রায় পুনরুক্তি করিতেন।

"এই বিতর্কপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ইংরাজরা আসিবার পূর্ব্বে ভারতীয়গণ বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল। এই সভায় সমবেত ব্যক্তিগণকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে আমি হিন্দু বলিয়া গৌরব বোধ করি, কারণ এই জাতি এক মহৎ ও সুপ্রাচীন বংশ সম্ভূত। যখন সুসভ্য য়ূরোপীয় জাতিদের পূর্ব্বপুরুষগণ বনে জঙ্গলে ভ্রমন করিতেছিলেন তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশাল রাজ্য স্থাপন, সুদৃশ্য নগরী প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের প্রচার এবং এক মহৎ ভাষা অনুশীলন দ্বারা যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন আজও তাহা সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। (উঃ আনন্দধ্বনি)। আপনারা রাস্তার অপর ধারে বোড্লিয়ান লাইব্রেরিতেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক বহু গ্রন্থ পাইবেন এবং সেইজন্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য সমর্থন যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আমরা প্রতিনিধিমূলক যে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি দাবী করিতেছি তাহা প্রতিহত করিবার জন্যই যদি উক্ত মন্তব্য করা হইয়া থাকে তাহা হইলে

ইহার অযৌক্তিকতা এই বলিয়া প্রদর্শন করিব যে স্বায়ত্বশাসনমূলক রাষ্ট্রবিধি আর্য্যসভ্যতার একটী বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল এবং আমরা সেই আর্য্যবংশ সম্ভূত। (আনন্দধ্বনি)। যে মাননীয় ভদ্রলোক সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন তিনি স্যর হেনরি মেনকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করতঃ কতকগুলি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার প্রামাণ্য এমন কি ভারতীয় ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন যে কার্য্যতঃ স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন ভারত-বর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে বর্ত্তমান; আর্য্যগণের গ্রাম্যসমাজ ব্যবস্থা পর্ব্বতগুলির ন্যায় পুরাতন। (আনন্দধ্বনি)। অতএব আমরা যখন প্রতিনিধিমূলক অথবা আংশিক প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রবিধির প্রার্থনা করিতেছি তখন আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকেই অনুসরণ করিতেছি মাত্র।"

নিম্নোক্ত মন্তব্য দ্বারা আমি আমার বক্তৃতা সমাপ্ত করি :—

"দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে সমস্ত পৃথিবী ও মানবজাতির মধ্যে প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপনের জন্যই বিধাতা ইংরাজ জাতির হস্তে ইহা অর্পণ করিয়াছেন। ইংলণ্ড স্বাধীনতার জন্মভূমি, কারণ এই স্থান হইতেই দেশে দেশে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয়গণ সেই মাতারই সন্তান এবং সেইজন্যই তাহারা আজ তাহাদের জন্মগত অধিকার দাবী করিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরাজ জাতির নিকট আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না। ইংরাজ শাসনের সহিত সুসঙ্গত ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার যে দাবী আজ আমরা এখানে জানাইতেছি মনে হয় তাহা বিফল হইবে না এবং দলগত পার্থক্য সত্ত্বেও সকল ইংরাজই আমাদের আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন।"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই তারিখে বোম্বে প্রত্যাগমন করিলে

আমাকে অভিনন্দন দিবার জন্য কয়াজি ইন্‌ষ্টিটিউটে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। এলাহাবাদ ও কলিকাতাতেও অনুরূপ সভার আয়োজন হয় এবং সর্ব্বত্রই আমি আমার বক্তৃতায় দেশবাসীর নিকট আমাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করি।

গৃহে প্রত্যাগমনের পর রিপণ কলেজ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে গোলোযোগে পড়িতে হয়। রিপণ কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটী ছাত্র কলেজে অনুপস্থিত থাকিয়াও হাজিরা বহিতে উপস্থিত বলিয়া চিহ্নিত হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় এক বৎসরের জন্য আইন বিভাগকে বিধি বহির্ভূত ঘোষণা করেন। কলেজের পক্ষে ইহা এক ভীষণ দুর্দ্দৈব রূপে আমার নিকট আসে এবং যে কার্য্য শেষ করিয়া আমরা বিলাত হইতে সদ্য প্রত্যাগত হইয়াছিলাম তাহার সমস্ত আনন্দ নিঃশেষিত বোধ হইতে লাগিল। আমার রক্ত দিয়া গড়া কলেজটী কিরূপে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আমাদের একটী ক্ষীণ আশা ছিল যে ভারতগভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবটী তখনও অনুমোদন করেন নাই। আমরা এই বলিয়া ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিলাম্‌ যে, যে ব্যাপারের জন্য কলেজের আইন বিভাগকে বিধি বহির্ভূত করার প্রস্তাব হইয়াছিল সেরূপ ব্যাপার যাহাতে আর না ঘটে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা করিব। তখন পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ব্যাপারটী পুনর্ব্বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা আমাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন এবং এইরূপে ঐ অপ্রীতিকর ব্যাপারটীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্যবস্থাপক সভায় আমার কার্য্য।

পার্লামেণ্ট ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এক বিধি দ্বারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি পুনর্গঠিত ও প্রসারিত করেন এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট পুনর্ব্বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির ক্ষমতা আরও সম্প্রসারিত করেন। নির্ব্বাচন প্রথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত এবং বেসরকারী সদস্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় সরকার তখন নির্ব্বাচনে আপত্তি করিবার অধিকার গ্রহণ করিলেন। বরাবরই দেখা যায় যে গভর্ণমেণ্ট যখনই জনসাধারণের কোনও দাবী মানিয়া লন তখনই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা কতকগুলি রক্ষাকবচ দ্বারা আবৃত রাখেন। ব্যবস্থাপক সভাগুলির পুনর্গঠনের পূর্ব্বে সরকার মনোনীত সদস্যগণকে ইচ্ছা ও বিবেচনানুযায়ী ভোট দিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের আলোচনাকালে তদানীন্তন গভর্ণর যখন পৌর সভার চারি ভাগের তিন ভাগ সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাবটী সমর্থন করেন তখন সরকার মনোনীত সদস্যবহুল সভাতেও তিনি হারিয়া যান! এইরূপ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত সভাতেও সদস্যগণ কিয়ৎ পরিমাণে ভোগ করেন বলিয়াই আমার বন্ধু বর্দ্ধমান বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ও গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি কটন্ সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ হয় না, কারণ সরকারের অনুমতি ব্যতীত সরকারী সদস্যগণ গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে ভোট দিতে বাধ্য।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থায় আর একটী সুবিধা এই ছিল যে তখন কোন শ্রেণী বা ব্যবসায়ের পক্ষে বিশিষ্ট নির্ব্বাচন কেন্দ্র সৃষ্টি হয় নাই।

তখন জিলাবোর্ডগুলি পল্লীর ও মিউনিসিপ্যালিটি সহরের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কেন্দ্র ছিল। এই ব্যবস্থানুসারে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যথোপযুক্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দের বিশেষ বিধানে এই প্রাধান্য নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থায় বিভিন্ন নির্ব্বাচনপ্রথা ও বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্র না থাকিলেও কোন শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নাটোরের মহারাজা ও তাহিরপুরের রাজা জমিদারগণের স্বার্থের প্রতিনিধিরূপে এবং নবাব সিরাজুল ইস্‌লাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করেন নাই। সত্য বটে রাজা মহারাজাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর এবং মুসলমানগণকে হিন্দুদের উপর কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু যতদূর মনে হয় বাঙ্গালা দেশে কেহ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা অধিক দিনের নয় এবং বঙ্গভঙ্গ দ্বারা ইহা সৃষ্ট না হইলেও বর্দ্ধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্যই যেন সরকার সম্প্রদায়গত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থানুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে অধিকার ভোগ করিত তাহা ইহার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের যে নূতন আইন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেষ্টারই ফল তাহাও তাহাদিগের প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত করিয়াছিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভাগুলি পুনর্গঠিত হইলে পর আমি কলিকাতা কর্পোরেসন হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হই। এই নির্ব্বাচনে দুইজন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—বাবু কালিনাথ মিত্র এবং বাবু জয়গোবিন্দ লাহা। কালিনাথ মিত্র মহাশয় বিরুদ্ধ দলের অবিসংবাদী নেতা ও করদাতাদের প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। আমরা তিনজনে বন্ধুভাবে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হই এবং কোনওরূপ ক্রোধ বা দ্বেষ প্রকাশ দ্বারা এই দ্বন্দ্বে তিক্ততা আনা হয় নাই বলিয়াই নির্ব্বাচন অন্তে আমরা বন্ধুভাবে পৌরসভার কার্য্য পুনরায় পরিচালনা করিতে সক্ষম হই।

কিন্তু অধুনা কি পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছে—যাঁহারা স্বদেশবাসীগণের নিকট স্বরাজ আনিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন তাঁহারাই যখন দেখি মিথ্যাও বিদ্বেষ রক্ষাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন তখন এই প্রদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের ঘোর অধঃপতনের কথা মনে হয়। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে 'স্বরাজ' শব্দটীর প্রথম ব্যবহার এবং সেখানে 'স্বরাজের' অর্থ 'সংযম'। এক্ষণে কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এই শব্দটীকে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রারম্ভেই এই গ্লানি এক বিরাট অশুভের সূচনা করিতেছে।

কলিকাতা পৌর সভার প্রথম প্রতিনিধিরূপে আমি নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলাম। আমার এই জয়ের অনুকূলে কি ছিল তাহা বলা কঠিন কারণ কালিনাথ মিত্র মহাশয় পৌর সভার একজন অতি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। বোধ হয় জনসাধারণের কার্য্যে অনুরাগের আধিক্য এবং নূতন ব্যবস্থাপক সভা প্রবর্ত্তনে আমার অংশ-গ্রহণ আমাকে জয় লাভে সমর্থ করিয়াছিল। যাহা হউক, আমার জন্ম নগরীর প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়া আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলাম এবং সমস্ত আন্তরিকতার সহিত ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিলাম। ব্যবস্থাপক সভায় আমার কার্য্য সম্বন্ধে আমি এস্থানে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ ভাল হউক অথবা মন্দ হউক ব্যবস্থাপক সভার পুরাতন নথীপত্রের মধ্যে তাহাদের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। একথা আমি বলিতে পারি যে যথাশক্তি সুযোগ সুবিধানুসারে আমি কার্য্য করিয়াছিলাম।

প্রথমবার কার্য্যকাল শেষ হইলে পৌর সভা পুনরায় আমাকে সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের মিউনিসি-প্যালিটি ও জিলাবোর্ড হইতে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থবার আমি ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হই। এইরূপে আমি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে আট বৎসর কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য ছিলাম। আমার সময়ে যে দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থাপক সভার আলোচনার বিষয় হইয়াছিল তাহারা হইতেছে বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের আমূল পরিবর্ত্তন। ব্যবস্থাপক সভা পুনর্গঠিত হইবার সময় প্রথমটী মূলতুবি অবস্থায় ছিল এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটী ১৮৯৭ সালে উপস্থিত করা হইয়াছিল। পৌরসভা-পরিচালনা কার্য্যে আমার যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল তাহা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এই দুইটী প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ছিল। এই পরিচিত বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে এই ব্যবস্থাপন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল বিলটীর সংশোধন তদানীন্তন ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়টের দ্বারা সাধিত হয়। পরিশ্রম করিবার শক্তি ছিল তাঁহার অসাধারণ কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান যে কোনও জেলার কালেক্টারের পক্ষে গৌরবের বিষয় হইলেও তাঁহার ন্যায় এক বিশিষ্ট প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পক্ষে শোভা পাইত না, কারণ বিস্তারিত বিবরণটীর অন্তরালে তিনি বিষয়ের মূলতত্ত্বগুলি প্রায় ভুলিয়া যাইতেন। বাঙ্গলা প্রদেশের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল না বলিয়া তিনি হেনরি কটন্ সাহেবকে প্রধান সেক্রেটারি নিযুক্ত করিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন হয় তখন বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন প্রস্তাবটী পরিষদে মূলতবি ছিল। মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সরকারি অনাস্থা হইতেই এই প্রতিক্রিয়াশীল বিধির উদ্ভব হইয়াছিল। দেশের মিউনিসি-প্যালিটিগুলিকে সভাপতি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা একবার প্রদান করার পর সেই শক্তি প্রত্যাহার করা অযৌক্তিক হইলেও এক্ষণে সরকার যে কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে উক্ত ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার প্রার্থনা করেন এবং কোন মিউনিসিপ্যালিটির বিভাগ সম্বন্ধে

—যাহা কমিশনারগণের অনুমোদন ব্যতীত সম্ভব হইত না—সরকারকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করেন।

পরিষদের বাহিরে আমি ইহার বিরুদ্ধে যথোচিত আন্দোলন করি। সংবাদপত্রে প্রতিবাদ, জনসভার অনুষ্ঠান এবং পরিষদের কোন কোন ভারতীয় সদস্যের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া কোন ফল হয় নাই। অবশেষে বিলাতে আবেদনের কথা মনে হওয়ায় আমি এলেন্ হিউম সাহেবকে একখানি দীর্ঘ পত্রে আমার যুক্তিগুলি জানাই এবং লর্ড রিপণের সহিত তাঁহাকে দেখা করিতে অনুরোধ করি। লর্ড রিপণ তখন বিলাতের অন্যতম মন্ত্রী; হিউম সাহেবকে লিখিত পত্রখানির উত্তরে তিনি আমাকে জানান যে প্রত্যেক মন্ত্রী স্ব স্ব বিভাগে প্রধান কিন্তু তথাপি তিনি আমার পত্রখানি তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড কিম্বার-লিকে পাঠাইয়াছেন। উক্ত পত্রের বিষয় আর কিছু না জানিলেও ইহার ফল যে ভাল হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ একদিন স্যর চার্ল্‌স্ ইলিয়ট্ পরিষদের কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালে ঘোষণা করেন যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল সম্বন্ধে ভারত সচিবের সিদ্ধান্ত তাঁহার মীমাংসারই অনুকূল, কারণ তিনি এবং ভারত সচিব উভয়েই সৌভাগ্য-ক্রমে এ বিষয়ে একমত যে বিলটীর যে অংশগুলির সম্বন্ধে আপত্তি উত্থিত হইয়াছে সেগুলি পরিত্যক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্যর চার্ল্‌স্ ইলিয়ট্ যখন এই ঘোষণা করিতেছিলেন তখন আমি পরিষদে বসিয়া-ছিলাম। আমার তখনকার মনোভাব সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক, মফঃস্বলে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থ সেই সময় বজায় রহিল।

স্বায়ত্তশাসনের সঙ্কোচক ম্যাকেঞ্জি বিলটীও আমার সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়। স্যর চার্ল্‌স্ ইলিয়টের পরবর্ত্তী শাসক স্যর আলেক্‌জাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ইহার প্রণেতা ছিলেন এবং লর্ড কার্জ্জন ইহাকে প্রসারিত করেন। স্যর আলেক্‌জাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি

পামার ব্রিজে পাম্প ষ্টেসন্ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে কলিকাতা কর্পোরেসনকে বাক্যবীরদের আগার ও বিলম্বের দপ্তরখানা বলিয়া উল্লেখ করেন এবং প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করিয়া সদস্যদের অধিকার সঙ্কুচিত করিতে প্রবৃত্ত হন। একটী স্বতন্ত্র সমিতি সৃষ্টি দ্বারা তিনি পৌর সভার ক্ষমতা আরও বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব করেন। করদাতাগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য তখনও বজায় রাখা হয় বটে কিন্তু উক্ত বিলটী সিলেক্ট কমিটিতে গৃহীত হইবার পর লর্ড কার্জ্জন নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মনোনীত সদস্যের তুল্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা পৌর সভাকে সম্পূর্ণরূপে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ইহার পর যখন স্থির করা হইল যে সভাপতি সরকারি ব্যক্তি হইবেন তখনই সরকার পক্ষের আধিক্য বজায় হইল।

লর্ড কার্জ্জনের স্বেচ্ছাচারিতামূলক এই কার্য্যের প্রতিবাদ কল্পে, আমরা আটাশ জন পৌর সভার সদস্য পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছিলাম। তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর স্যর জন উড্বার্ণ পদত্যাগের ভয় দেখাইয়া ছিলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করেন নাই। বিলটী ১৮৯৭ সালে উপস্থিত করা হয়, ১৮৯৯ সালে মঞ্জুর হয় এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে আইনে পরিণত হয়। যে সিলেক্ট কমিটিতে (নির্ব্বাচিত সমিতি) উক্ত বিলটী পাঠান হইয়াছিল আমি তাহার সদস্য ছিলাম এবং আমাদের বিবরণী পেশ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যহ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। উক্ত বিবৃতি ও সংশোধন প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিবার জন্য এক পক্ষ কালের অধিক প্রত্যহ মাত্র জলযোগের সময় ব্যতীত বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলে। বহু বৎসর যাবৎ আমি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলাম কিন্তু এরূপ কঠোর পরিশ্রম কখনও করিতে হয় নাই। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় যে পরিশ্রম করি তাহারই কথা তখন

মনে পড়িত। পর দিবসের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পূর্ব্ব রাত্রে প্রায় ১টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতাম। এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে কার্য্যশেষে ভীষণ ব্রেনফীভারে আক্রান্ত হই। ২৭শে সেপ্টেম্বর বিতর্কের শেষ দিন বিলটী ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। ঐ দিনই রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী দিবস। যখন আমি সভাগৃহে প্রবেশ করিতেছিলাম তখন ঐ মহাত্মার মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য আমাকে এক আমন্ত্রণলিপি দেওয়া হয়। ইহা আমার মনে গভীর বিষাদের সঞ্চার করে এবং শেষবার বিলটীর প্রতিবাদ করিয়া আমি বলি ঃ—

"প্রাতে সভাগৃহে প্রবেশকালে আমি যে আমন্ত্রণ লিপিখানি পাই তাহাই আমাকে অদ্য রাজা রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমার মনে হয় ইহা ঠিক হইয়াছে যে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর তিরোধানের দিনটীই তাঁহার প্রিয় বাসস্থান ও কর্ম্মভূমি এই নগরীর স্বায়ত্তশাসনাধিকারের সমাধি দিবস বলিয়া স্মরণ করিবে।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটী বিশিষ্ট ঘটনা ঘটে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন বিলাতের কমন্স সভায় মিষ্টার হারবার্ট ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যাহাতে ভারতবর্ষে ও বিলাতে যুগপৎ গৃহীত হয় তাহার প্রস্তাব করেন। দাদাভাই নৌরজী তখন পার্লামেণ্টের সদস্য, তিনি উক্ত প্রস্তাবটী সমর্থন করেন এবং উহা গৃহীত হয় কিন্তু এখানকার সরকারি মহলে ঐ প্রস্তাব বজ্রাঘাতের ন্যায় ঠেকে। ইণ্ডিয়া অফিস শীঘ্র ইহার বৈধতা অস্বীকার করে এবং তদানীন্তন ভারতসচিব স্যর হেনরি ফাউলার মন্তব্য করেন যে ভারত সরকার উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা বদ্ধ নহেন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

যে সময়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন সেই সময় বাঙ্গালার তদানীন্তন অস্থায়ী ছোটলাট বাহাদুর স্যর এণ্টনি ম্যাকডোনেল্ আমার সহিত তাঁহার প্রাসাদে নিম্নোক্ত আলাপ করেন :—

ছোটলাট বাহাদুর :— মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে আপনি এত আগ্রহান্বিত কেন ?

আমি :— কারণ আমরা মনোনয়নের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি এবং মনে করি যে যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আমরা যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিব এবং তাহা হইলেই মহারাণীর ঘোষণা পূর্ণ হইবে।

ছোটলাট বাহাদুর :—কিন্তু পব্লিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদনানুযায়ী প্রাদেশিক কার্য্যে কয়েকটী পদ আপনার দেশবাসীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে এবং তাহা ব্যতীত বিলাতে ত আপনার দেশের অধিবাসীরা পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

আমি :— ইহার উত্তরে আমি পুনরায় বলি যে মনোনয়ন আমাদের সন্তোষ বিধান করিতে পারে না ও পারিবে না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের এক বিধানানুযায়ী ইহা স্থির হয় যে কৃতী ভারতীয়গণকে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করা হইবে এবং তজ্জন্য নিয়মাবলী রচিত হইবে। কিন্তু মাত্র ছয়টী নিয়ম রচনা করিতে ছয় বৎসর সময় লাগে এবং এমন কি তাহার পরও সরকার অতি ধীরে ধীরে উক্ত বিধানানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হন।

ছোটলাট বাহাদুর :—কিন্তু আপনারা ত এক্ষণে এদেশে ও বিলাতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

আমি :— তথাপি ভারতীয় মতামত গভর্ণমেণ্টের নিকট অগ্রাহ্যের বিষয়। আমাদের অধিকার আপনাদের সম্মতির উপর নির্ভর করে এবং আমাদের সুবিধাগুলি আপনাদের দয়ার বিষয়।

এই আলোচনা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হয়। কিন্তু যখন ১৯০৯ সালে আমি বিলাতে লর্ড ম্যাকডোনেলের সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বমত আংশিক ভাবে পরিবর্ত্তন করেন এবং যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষাবলম্বন করেন। কার্জ্জন উইলি হত্যাকাণ্ডের পর তাঁহার মতের এই পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তিনি ভারতীয় ছাত্রগণের অধিক বিলাতগমন অনুচিত বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য তিনি আইন ও সিভিল সার্ভিস উভয় পরীক্ষা যুগপৎ ভারতবর্ষ ও বিলাতে গ্রহণের পক্ষাবলম্বন করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভারতের জাতীয় মহাসভা ১৮৯৪—১৮৯৬।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। আমরা একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া বাঙ্গালার সমস্ত প্রতিনিধি একত্রে যাত্রা করি। চিন্তা ও জীবনযাত্রা প্রণালির সমতা বিধান ব্যতীত এই একত্র কয়েক দিবস যাপনের ফলে বহু ব্যাপারের সৌহার্দ্দপূর্ণভাবে মীমাংসা সম্ভব হইয়াছিল। জাহাজে আমরা প্রাদেশিক সম্মেলন সম্বন্ধে এক অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই প্রাদেশিক সম্মেলনগুলি কংগ্রেসরই শাখা স্বরূপ এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার এইরূপ প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার সময় বলেন যে উপনদী যেমন নদীকে পুষ্ট করে সেইরূপ এই প্রাদেশিক সম্মেলনগুলি কংগ্রেস আন্দোলনকেই বর্দ্ধিত করিবে। এতাবৎকাল প্রাদেশিক সম্মেলনগুলি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইত কিন্তু আন্দোলনটী বেশ সক্রিয় হয় নাই এবং সেইজন্য আমরা কিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করিলাম। আমরা স্থির করিলাম যে জাতীয় মহাসভার ন্যায় এই প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিও ভ্রাম্যমাণ হইবে। বহরমপুরের প্রতিনিধি বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় ১৮৯৫ সালে বহরমপুরে এই সম্মেলন আহ্বান করেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলে আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ঐ বৎসর বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়। তদবধি ঐ প্রচেষ্টা প্রতি বৎসর অধিকতর সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে আমি সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়াছিলাম। জাতীয় মহাসভার প্রত্যেক অধিবেশনে আমি দুইটী প্রস্তাব সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলাম—প্রথমটী হইতেছে ভারতীয়দের উচ্চ রাজকার্য্যে অধিক পরিমাণে নিয়োগ এবং দ্বিতীয়টী

প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন। আমি এই দুইটী সমস্যাকে ভারতীয় সমস্ত সমস্যার মূল মনে করিতাম এবং সেইজন্য ইহাদের সুষ্ঠু সমাধানের উপর সমস্ত নির্ভর করে বলিয়া মত প্রকাশ করিতাম। আমরা যদি আমাদের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক রচিত নিয়মানুযায়ী দেশের রাজস্ব ও শাসন পরিচালনা করিতে পারি তাহা হইলেই স্বায়ত্তশাসনের মূলসূত্র লাভ হইবে এবং এইরূপে আমরা আমাদের কার্য্যশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্থানলাভ করিতে সক্ষম হইব। স্বীয় স্বার্থের অনুরোধে শক্তি সঞ্চয় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, পরন্তু পরমেশ্বর যে মহৎ কার্য্যের জন্য আমাদের প্রেরণা দিয়াছেন সেই কার্য্যে শক্তি সঞ্চয় আমাদের অভিপ্রেত ছিল।

"ছাত্রগণের রাজনীতিতে যোগদান কর্ত্তব্য কি না"—এই বিষয়ে মাদ্রাজে একটী ছাত্র সভায় বক্তৃতা দিতে আহূত হই। পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য ও মিষ্টার খাপর্দ্দে উভয়েই এই বিতর্কে আমার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। তখন আমি যে মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহা চিরকাল দৃঢ়তার সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছি। আমি সমাজের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি ও সরকারী উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বলিয়াছিলাম যে ছাত্রগণের রাজনীতিতে যোগদান কর্ত্তব্য এবং যোগ্য নেতৃত্বে তাহারা রাজনৈতিক কার্য্যও করিতে পারে। আনন্দের বিষয় যে এক্ষণে অনেকেই আমার অনুকূলে মত পোষণ করিতেছেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রথম বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসবে তদানীন্তন সেক্রেটারি উইলসন্ সাহেব যখন আমাকে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আমন্ত্রণ করেন তখন আমি জানাই যে যদি ঐ প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের রাজনীতি আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয় কেবল তাহা হইলেই আমি তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিব। স্যর চার্লস্ ইলিয়টের নিকট ঐ বিষয়টী স্থাপন করা হইলে তিনি উহা নামঞ্জুর করেন বলিয়া আমি উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন বা ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি নাই।

ছাত্রগণকে রাজনীতি চর্চ্চার সুযোগ না দেওয়া যে মূঢ়তা তাহা আজকাল সকলেই বুঝিতেছেন। ভাল বা মন্দ যাহা হউক রাজনীতি আলোচনা তাহারা করিবেই এবং যদি তাহাদিগকে যথার্থ রাজনীতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাহাদের মনে উৎকট হৃদয়োচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হইবে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ছাত্রগণের রাজনীতি চর্চ্চায় কোনরূপ মানা নাই এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথায় প্রায় ছাত্রদের সহিত রাজনীতি চর্চ্চায় আমন্ত্রিত হন। ভারতবর্ষ বিলাত না হইলেও ছাত্রদের মন সর্ব্বত্র সমান ভাবাপন্ন এবং সেইজন্য জ্ঞান ও যোগ্য আলোচনার ফল পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রাচ্যেও উপকারী হইবে।

কিন্তু আজকাল কতকগুলি যুবকের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও পরমতের প্রতি অমার্জ্জনীয় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার আমি নিন্দা করি। সহিষ্ণুতা হিন্দু জাতির বহু প্রাচীন ধর্ম্ম এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা ছাত্রজীবনের প্রাণস্বরূপ। বদ্ধমূল ও আবহমানকাল অনুষ্ঠিত এই অভ্যাস ত্যাগ সুষ্ঠুভাবে রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আমার মনে হয় আমাদের গৃহে ও শিক্ষায়তনে অধুনা সংযমের অভাব ও বিশৃঙ্খলার প্রসার দেখা দিয়াছে। যাহা হউক, আশা করি ইহা চিরস্থায়ী হইবে না এবং যে কারণ পরম্পরায় ইহাদের উৎপত্তি তাহাদের অবসান ঘটিলেই এই মনোভাবেরও অবসান হইবে।

'রেওয়া' নামক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজে আমরা মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসি। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মিষ্টার বি, এল, গুপ্ত এবং মিস্ মূলার আমাদের সহযাত্রী হন। মিস্ মূলার মিষ্টার ঘোষ নামক একটী ভারতীয় ছাত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিতবাদীর সম্পাদক কালিপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় ভোজবিদ্যা ও তাসের খেলা দেখাইয়া জাহাজে সাহেব যাত্রীদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। বহু বিদ্যায় পারদর্শী বিশারদ মহাশয় এই

বিষয়টীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। বিখ্যাত বাঙ্গালা লেখক, উত্তম কবি ও করুণরসাত্মক গানের রচয়িতা এই অমায়িক স্বভাব কাব্যবিশারদ ও তাঁহার কার্য্যাবলি সম্বন্ধে আমি পরে সবিস্তারে বলিব। আমার সহযাত্রীরা কংগ্রেস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। পোতাধ্যক্ষ হানসার্ড সাহেবের সভাপতিত্বে সেলুনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং যাত্রিপূর্ণ সেই সভায় আমি আধঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা প্রদান করি। নিম্নলিখিত ভাষায় আমার বক্তব্য সমাপ্ত করি ঃ—

"ইংরাজ ভিন্ন অন্য জাতিকেও আমাদের এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আমি আবেদন জানাইতেছি কারণ তাঁহারাও সভ্য মনুষ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত নহেন কি? কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি বলিব যে কংগ্রেসের কার্য্য কেবল ভারতবর্ষেরই কার্য্য নহে। আরও বৃহত্তর কর্ত্তব্য ইহার রহিয়াছে। স্বাধীনতার প্রসার ও মানবসভ্যতার উন্নতি বিধানই ইহার লক্ষ্য এবং সেই জন্যই পবিত্র ও কলনাদিনী গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বস্থ এক মহাজাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ সভ্যজগতে সুসংবাদরূপে গৃহীত হইবে।"

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার আমি ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হই। দাক্ষিণাত্যের রাজধানী ও বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র পুণায় সে বার অধিবেশন হয়। নভেম্বর মাসের প্রথমেই আমি মহাদেও গোবিন্দ রাণাডের নিকট হইতে সভাপতি হইবার জন্য আমন্ত্রণ পাই এবং সেই দিনই আমি ধন্যবাদ সহকারে উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া উত্তর দিই। তখনকার দিনে সভাপতি পদের জন্য কোনও প্রতিযোগিতা বা চেষ্টা হইত না, অভ্যর্থনা সমিতির নির্ব্বাচন বিনা দ্বিধায় গৃহীত হইত। প্রথম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই পদের জন্য দ্বন্দ্বের আভাষ পাওয়া যায় এবং পর বৎসর সুরাট কংগ্রেসের ভেদেই ইহার পরিণতি ঘটে।

পশ্চিম ভারতের সমস্ত গণ-আন্দোলনের পশ্চাতে তখন মনীষী

রাণাডের শুভ চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। স্বার্থবুদ্ধি বা সাময়িক কোনও ভাবাবেগ জন্য তিনি রাজানুগত্য গ্রহণ করেন নাই; ইহার মূলে ছিল শুভবুদ্ধি ও সাধারণের মঙ্গল কামনা এবং সেইজন্যই তিনি স্বীয় প্রদেশে জনসাধারণের বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে সম্মান লাভ করেন ও রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রত্যেক আন্দোলনেই তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের মুদ্রাঙ্ক দেখা যাইত। জনসেবক জীবনের প্রারম্ভেই আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনের জন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন আমি পুনায় যাই তখন আমি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং সেই সময় তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি, ঐকান্তিক স্বদেশ প্রেম এবং সরলতা ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হই।

জাতীয় মহাসভার সভাপতি পদ গ্রহণের পর আমি সভাপতির অভিভাষণ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। অধ্যাপনা, বেঙ্গলী পত্রিকার সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য এবং কলিকাতা পৌরসভার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাকে উক্ত গুরু দায়িত্ব পালন করিতে হইয়াছিল। আমি একটী সহজ পন্থা অবলম্বন করি। প্রত্যহ বেলা দুইটার সময় বারাকপুরে গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ আমার অভিভাষণ রচনায় মনোনিবেশ করিতাম। ঐ সময়ে আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না—কঠোর ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিতাম।

এইরূপে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া আমি আমার গৃহে উক্ত কার্য্যে একাকী ব্যাপৃত থাকিতাম, কারণ পরিবারস্থ সকলে আমার পুত্রের অসুস্থতার জন্য এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। দুই ঘণ্টা কাল কঠোর পরিশ্রমের পর আমি তিন কোয়ার্টার ধরিয়া গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতাম। ভ্রমণ কালে সেই দিনের লিখিত বিষয়টী মনে মনে পুনরালোচিত ও সংশোধিত হইত এবং উক্ত সংশোধনগুলি পরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতাম। সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও মনঃসংযোগ সহকারে ছয় সপ্তাহ ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমের পর অভিভাষণটী শেষ হয়। লিখিত কোনও টীকা টিপ্পনী ব্যতীত আমি সমগ্র বক্তৃতাটী প্রদান করিয়াছিলাম।

যদিও চারি ঘণ্টার অধিককাল ধরিয়া অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলাম, তথাপি পাঁচ সহস্রের অধিক শ্রোতৃবৃন্দকে সর্ব্বক্ষণ আমার প্রতি আকৃষ্ট রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়।

কোনওরূপ লেখার সাহায্য ব্যতীত দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান ও পুস্তকাদির অংশ বিশেষ আবৃত্তি করিবার রহস্যের বিষয় প্রায় আমাকে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু বোধ হয় বক্তা নিজেই ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ। বাক্যের রচনাবিন্যাস ও কৌশলের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক, ন্যায়সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে স্মৃতিশক্তির সহায়তা করে। বাক্যগুলি ছন্দোবদ্ধ হইলে মনের উপর তাহাদের মুদ্রাঙ্কপড়ে এবং স্বরপ্রবাহ স্মৃতিকে সাহায্য করে। লর্ড সলিসবারি (Lord Salisbury) বলিতেন যে বক্তৃতা রচনার সময় সর্ব্বোত্তম বাক্যগুলি যেন তাঁহার মনের উপর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। সমস্ত বক্তা সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। সমস্ত কার্য্যের ন্যায় ইহাতেও উদ্যোগ ও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কার্লাইল সত্যই বলিয়াছেন যে প্রতিভা অত্যধিক কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতার নামান্তরমাত্র। জন্ ব্রাইট্ (John Bright) বলিতেন, সযত্নে প্রস্তুত না হইলে কোনও বক্তৃতাই শ্রবণযোগ্য হয় না এবং সেইজন্য তিনি তাঁহার বিশেষ বক্তৃতা-গুলি রচনা করিবার সময় ক্যাবিনেটের সভায় অনুপস্থিত থাকিতেন। উপস্থিত বিতর্কের যোগ্য করিতে নিত্য চেষ্টার প্রয়োজন—এই চেষ্টাই বাক্যের উপর অধিকার ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রদান করে; এক কথায় নিপুণ বাক্‌যোদ্ধার সমস্ত মানসিক প্রয়োজন এই পূর্ব্ব প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। কিন্তু নিপুণ বাক্‌যোদ্ধা মাত্রেই বড় বক্তা হয় না, কারণ বক্তার অনেক গুণ চেষ্টালব্ধ নয়। হৃদয়াবেগ উচ্চ চিন্তার জনক এবং উহাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিতে সক্ষম।

ঐকান্তিক ভাবে মাতৃভূমিকে ভাল না বাসিলে বক্তা হওয়া যায় না। স্বদেশই বক্তার নিকট প্রথম ও প্রধান বিষয়। স্বদেশপ্রীতির পূত মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে শ্রেষ্ঠ ধীশক্তিও কাহাকেও বাগ্মীর প্রসিদ্ধি

দান করিতে পারে না। ধীশক্তির সাহায্যে একজন ভাল তর্করসিক হইতে পারেন, সুন্দররূপে স্বীয় বক্তব্য বুঝাইতে পারেন কিংবা তাঁহার বাক্যের দ্বারা অপরকে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিতে পারেন কিন্তু তীব্র দেশপ্রেম অথবা ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্যতীত কেহই মানবমনকে আলোড়িত করিয়া উচ্চ আদর্শ এবং সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিতে পারেন না। নৈতিক গুণাবলিই বক্তার সম্পদ এবং সেইজন্য যাঁহারা স্বদেশের সেবায় বা ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন সেই সকল মহামানবগণের নিত্য সাহচর্য্যই এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

সাধারণ্যে বক্তৃতার কৌশল সম্বন্ধে বহুকাল পূর্ব্বে যুবকগণের এক সভায় আমি বলিয়াছিলাম ঃ—

"স্বর্গীয় সুরভিপূর্ণ এক পরিবেষ্টনের মধ্যে তোমরা বাস করিবে এবং সেখানে বার্ক, ম্যাজিনি, খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি তোমাদের নিত্য সহচর হইবেন। 'বন্দেমাতরমের' সুরের সহিত তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী গ্রথিত হউক।" শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বক্তার নৈতিক চরিত্রের প্রধান উপাদান। এই উপাদান যত অধিক পরিমাণে যিনি লাভ করিবেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাক্যের প্রস্রবণ সেই অনুপাতে উন্মুক্ত হইবে। ধীশক্তি বাগ্মীর পক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেও অপ্রধান; নৈতিক উপাদানই প্রধান। ধীশক্তির মধ্যে একাগ্রতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। প্রসিদ্ধ বাগ্মী গ্লাড্‌ষ্টোন্ সাহেবের এই গুণ বিশেষ পরিমাণে ছিল। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে বটে কিন্তু চিন্তারাশির মধ্যে বাস করিয়া তাহা-দিগকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী বাগ্মীর পক্ষে একাগ্রতা আরও প্রয়োজনীয়। জীবনব্যাপী এই গুণের অনুশীলন দ্বারা আমি যথেষ্ট পরিমাণে উপকার পাইয়াছি।

পুনায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ সকলের প্রশংসা লাভ করে। পুনায় এবং অন্যত্র আমি যে সম্মান লাভ করি তাহা কলিকাতাবাসীদের

মনে গভীর রেখাপাত করে। একজন শিক্ষকও আন্দোলনকারীর স্বীয় প্রদেশের বাহিরে এই সম্মানলাভে সরকারীমহলও স্তম্ভিত হয়। আমি নিজেই এই অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হই। অভিভাষণ প্রদানের শেষে মঞ্চোপরি যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে আমি বাৎসরিক অধিবেশনের শেষে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম বটে, কিন্তু যখম দেখিলাম যে সেখানকার আব-হাওয়ায় এক বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার হইয়াছে তখন অবস্থার অনুরূপ প্রস্তুত হই এবং পূর্ব্বরচিত বক্তৃতাটী ত্যাগ করিয়া বিশাল জনতা ও শ্রোতৃবৃন্দের ভাবাবেগের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করি। তখন আর বক্তা শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করে নাই পরন্তু শ্রোতৃবৃন্দই বক্তাকে অনুপ্রেরণা দিতেছিলেন। মনে হইল সত্যই যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি আমাকে তাহাদের সহিত যোগ করিয়াছে এবং আমার উপস্থিতরচিত ভাষণের অন্তে যখন আমি উপবেশন করিলাম তখন যুবকগণ আমার পদধূলি লইবার জন্য মঞ্চের উপর যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি স্মরণ আছে। কোন্ অদৃশ্য শক্তি ঐ যুবকগণের পূর্ব্বপুরুষদের বর্ত্তমানকালের বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা যেন সেই মুহূর্ত্তে অতীতের কুহেলিকা ভেদ করিয়া আমার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমার জীবনে ইহা এক গৌরবময় স্মৃতি।

পুনা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমনের পথে পীড়িত পুত্রকে দেখিবার জন্য এলাহাবাদে নামি। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রমুখ বন্ধুরা শিয়ালদহ ষ্টেসনে আমাকে অভিনন্দিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। ষ্টেসনে অত্যধিক জনতার জন্য রাজা অজ্ঞান হইয়া যান এবং অতি কষ্টে আমি আমার গাড়িতে উঠিতে সমর্থ হই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন কলিকাতা মহানগরীতে হইবার প্রস্তাব হয় এবং সেইজন্য পূর্ব্ব হইতে আমরা উদ্যোগ করিতে ব্যস্ত হই। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে একটী

অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। অবসরপ্রাপ্ত এই প্রসিদ্ধ বিচারকের সহযোগিতালাভে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলাম। কোনওরূপ অনুরোধ বা প্ররোচনা ব্যতীত তিনি স্বেচ্ছায় জাতীয় মহাসভায় যোগ দেন। আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি গোপন ছিল না যদিও মহামতি রাণাডের ন্যায় যতদিন বিচারকের পদে আসীন ছিলেন ততদিন কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেন নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আন্দোলন আর এক বিষয়ে প্রসারলাভ করে। প্রায় দেখা যায় যে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি পূর্ব্বেই তাহাদের ছায়াপাত করে। ভারতে শিল্পের যে প্রসার স্বদেশী আন্দোলনের সহিত দেখা দিবার উপক্রম করিতেছিল তাহারই আভাষ কংগ্রেসে এক নূতন ব্যবস্থায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর (মিষ্টার জে, চৌধুরী) অন্তর্দৃষ্টি এবং গঠনশক্তির জন্যই এই নূতন ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছিল এবং কংগ্রেস আন্দোলন ইহার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। বাঙ্গালায় শিল্পসম্বন্ধীয় আন্দোলনে তিনিই অগ্রণী। জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের সহিত শিল্পসম্বন্ধীয় প্রদর্শনী প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব তিনিই প্রথম করেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা সচেষ্ট হইলাম। সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য আমরা আবেদন করিলাম এবং তদানীন্তন ছোটলাট স্যর জন উড্‌বার্ণ সাহেবকে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে আমি নিজে অনুরোধ করি। ছোটলাট বাহাদুর কিন্তু ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গভূত বলিয়া উক্ত প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই। যাহা হউক কুচবিহারের মহারাজা কর্ত্তৃক উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। *

* এ বিষয় সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখুন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আমি যে কংগ্রেসের সহিত স্বদেশী প্রদর্শনী সংযোগ করি সে কথা সত্য। তবে রাষ্ট্রগুরু যে লিখিয়াছেন যে ১৮৯৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সহিত স্বদেশী প্রদর্শনী সংযুক্ত করি সেটি ঠিক নহে। ১৯০১ সালে বিডনস্কোয়ারে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় যাহাতে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব (Solicitor) সেওয়ানি সভাপতি হন সেই কংগ্রেসের সহিত আমি একটি স্বদেশী প্রদর্শনী সংযুক্ত করি। ইহাতে রাজনৈতিক নেতাদের অনেকের ঘোরতর আপত্তি ছিল। তাঁহারা তখন বলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরূপ প্রদর্শনীর কোন স্বার্থকতা থাকিতে পারে না। আমি রাষ্ট্রগুরুকে বুঝাই ইহার স্বার্থকতা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ আমার বিশ্বাস যে যতদিন আমরা আমাদের দেশের শিল্প ও বানিজ্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিতে না পারিব, ততদিন আমরা স্বদেশে স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী হইতে পারিব না। দ্বিতীয়তঃ আমি বলি যে কংগ্রেস ও রাজনৈতিক আন্দোলন তখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শিল্পী ও শ্রমজীবিরা যতদিন এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক না হইবে, ততদিন আমরা স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী হইতে পারিব না। কংগ্রেসের সহিত আমি এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী সংযুক্ত করিব বলি। রাষ্ট্রগুরুর অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি অন্য নেতাদের আপত্তি খণ্ডন করিয়া আমার প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। ফলে, ঐ প্রদর্শনী স্বদেশীশিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও উন্নতিকল্পে তদবধি জনসাধারণের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। এমন কি, শিল্পকলায় বিশিষ্ট বিচারক হাভেন সাহেব ও সার জন উডরোফ (যিনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হন) এই প্রদর্শনীর শিল্পসংগ্রহের সবিশেষ প্রশংসা করেন। এই কংগ্রেসের অধিবেশনের পরে আমি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া আমাদের সচরাচর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যাহাতে এদেশেই সংগ্রহ হইতে পারে সে জন্য Indian Stores বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান বহুবাজারে ভারতসভা (Indian Association) গৃহের নিম্নের তলায় স্থাপন করি। আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের অর্থে লিমিটেড্ কোম্পানি রূপে কার্য্যারম্ভ হয়। অবৈতনিক ভাবে আমিই উহা পরিচালনা করিতাম। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, জনসাধারণের কাছে প্রতীয়মান করা

যে স্বদেশের অভাব স্বদেশেই মোচন করা যায়, স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা বাড়ান, স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি ও জনসাধারণের মনে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি বৃদ্ধি করা। বক্তৃতা অপেক্ষা উদাহরণের সাফল্য অধিক।

রাষ্ট্রগুরু যে এই প্রদর্শনী ১৮৯৬ সালের কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল লিখিয়াছেন সে ভ্রান্তির কারণ, ঐ সময় স্বদেশী আন্দোলন কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত না হইলেও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ কতকগুলি দেশবৎসল যুবকের সহায়তায় স্বদেশী শিল্প সংরক্ষণ ও উন্নতিকল্পে একটি স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। Bengal Technical College এর Journal* এ আমি একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহাতে এই স্বদেশী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ আছে। সুতরাং তাহা আর আমি এখানে পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না। তবে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ১৮৯৬ সালে যখন এদেশে স্বদেশী ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তন করার সংকল্প করি, তখন রাষ্ট্রগুরু আমার এই কল্পনা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। রবিবাবুদের সহায়তায় যখন ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, রাষ্ট্রগুরুর ইহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাই।

রবিবাবু আমার অগ্রজ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের অতি নিকট আত্মীয়। স্বদেশীযুগে প্রায়ই সায়ংকালে আমার দাদার (সার আশুতোষের) বাড়ীতে অনেকেই সমবেত হয়ে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ও সমসাময়িক রাজনীতি আলোচনা করিতেন ও প্রীতি ভোজনান্তে সিদ্ধান্ত করিতেন যে বাঙ্গালাই একদিন সমগ্র ভারতকে নবজীবন দান করিবে। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি অধিকতর লিপ্ত ছিলাম ও তাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করাতে চেষ্টা করিতাম বলিয়া রবিবাবু আমাকে স্নেহভরে "গোলযোগেশ" বলে ডাকিতেন।

১৯০১ সালে স্বদেশী প্রদর্শনী কলিকাতাকংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত করার পর যখন স্বদেশী ভাব দেশব্যাপী হইতে লাগিল তখন লর্ড কার্জ্জন ভারতে, বাঙ্গালায় রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য বঙ্গব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ উপেক্ষিত ও অগ্রাহ্য হইলে আবার আমরাই জনকতক রিপণ কলেজে সমবেত হইয়া রাষ্ট্রগুরুকে বলি, 'আবেদন

* Journal of the College of Engineering and Technology-(25th Anniversary Number, March, 1931) দ্রষ্টব্য।

নিবেদনে আর কোন ফল হইবে না। ভারতে ও বিলাতে আমাদের শাসন কর্ত্তাদের চৈতন্য সাধন করার জন্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত দেশব্যাপী স্বদেশীগ্রহণ ও বিদেশীবর্জ্জন আন্দোলন সংযুক্ত করুন, দেখুন কি ফল হয়।' ১৯০৬ এর কংগ্রেসের স্বদেশীপ্রদর্শনী ও ইণ্ডিয়ান ষ্টোর প্রভৃতি অনুষ্ঠান এই আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করে। ১৯০৬ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস একটি অপূর্ব্বকাহিনী, তাহা আমার এই শেষ বয়সে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাতে অখণ্ডবঙ্গভঙ্গ কেবল মাত্র রাজপুরুষদ্বারা খণ্ডন হয় নাই, ইহাতে সমগ্র ভারত নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশের শিল্প, ব্যবসা, বানিজ্য, যৌথ সমিতি, ব্যাঙ্ক, নানাবিধ কারখানা ও শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন কি, বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি নবজীবন ও নব উদ্দীপনা প্রাপ্ত হয়। স্বরাজ আমাদের স্বদেশীর অন্তর্ভূত ছিল। আমরা রাষ্ট্রগুরুকে বলিতাম যে জনসাধারণ Dominion Status বুঝিবে না। আমরা তাহাদের বুঝাইতাম আমরা এদেশে জন্মাইয়াছি, ঘরের খাইব, ঘরের পরিব— ইহা আমাদের সঙ্গত অধিকার ও এদেশের শাসনের ও সংরক্ষণের ভারসম্বন্ধেও আমাদের অনুরূপ অধিকার, ও ইহারই অর্থ স্বরাজ। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ১৯০৬ সালে দাদাভাই নাওরোজি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সমগ্র ভারতের পক্ষে স্বরাজ দাবি করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দুইটী মেঘাচ্ছন্ন বৎসর।

ভারত সরকারের ব্যয় এবং ভারতবর্ষ ও বিলাতের মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত সম্বন্ধ মীমাংসার জন্য যে ওয়েল্‌বি কমিশন গঠিত হইয়াছিল তাহাতে সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমি আহূত হইয়াছিলাম। লর্ড ওয়েল্‌বি এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং স্যর উইলিয়াম্ ওয়েডারবার্ণ, মিষ্টার কেন্ এবং দাদাভাই নৌরজি সদস্যরূপে কার্য্য করেন। বাঙ্গালাদেশ হইতে আমি ভারতীয় সাক্ষ্যরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। মিষ্টার গোখেল্ ও স্যর দিন্‌সা ওয়াচা বোম্বাই হইতে এবং মিষ্টার সুব্রহ্মণ্য আয়ার মাদ্রাজ হইতে আহূত হইয়াছিলেন।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার পর সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম এবং এই স্থলে রাজস্ব বিভাগের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্যর হারবার্ট রিষ্‌লের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলাম তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যে কঠোর পরিশ্রম তখন আমাকে এই বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য করিতে হইয়াছিল ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকাকালে তাহার উপকারিতা বোধ করিতে পারি।

মে মাসের প্রথমে লণ্ডনে পৌঁছাইয়া দেখিলাম যে ভারতীয় বন্ধুদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হইয়া গিয়াছে। কমিশনের নিকট পেশ করিবার জন্য আমাকে একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল কারণ উহার উপরই আমার সাক্ষ্য গ্রহণের কথা ছিল। এইটী প্রস্তুত করিতে এক পক্ষ কাটিয়া যায় এবং আমাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। দাদাভাই নৌরজি কমিশনের সদস্যরূপে কার্য্য করিলেও সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সকাল ১১টা হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত আমার সাক্ষ্যগ্রহণ চলিয়াছিল। কমিশনের অন্যতম সদস্য স্যর লুই পেল (Sir Louis Peila) ভারতীয়দের উচ্চরাজকার্য্যে অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগের যে সাক্ষ্য

দেই সেই সম্বন্ধে আমাকে বিশেষভাবে জেরা করেন। আমি আমার দেশবাসীগণকে শিক্ষা বিভাগের উচ্চকার্য্য হইতে অপসারিত রাখার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ করি। মনীষী গোখেল্ আমার সাক্ষ্যপ্রদানের বিশেষ প্রশংসা করেন।

ইহার পরই কোনও এক অনুষ্ঠানে স্যর চার্ল্‌স্ ইলিয়টের সহিত আনার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটী তখন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনাধীন ছিল এবং আমি স্যর চার্ল্‌সের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করি। স্যর চার্ল্‌স ইলিয়ট্ স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক না হইলেও দেখিলাম বিলাতের স্বাধীন আবেষ্টনে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি আমাকে বলেন "বিলাতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালি দেখিয়া এক্ষণে আপনাদের পৌরসভার বিষয় অধিক ভাবিতেছি।" কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে প্রস্তাবিত প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্ত্তনের তিনিও পক্ষপাতী ছিলেন না। আমাদের সাহায্য করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। আমার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হইলে আমি যে অল্পসময় সেখানে ছিলাম সেই সময় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকস্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া জানিতে পারিলাম যে প্রেসিডেন্সি বিভাগের জিলা-বোর্ডগুলির পক্ষ হইতে আমাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আমরাওতি নামক স্থানে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বেরারের রাজধানী এই স্থানটী আমার স্বর্গীয় বন্ধু মিষ্টার মুধোলকরের প্রধান কর্ম্মভূমি ছিল। জাতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ ও নিরহঙ্কার কর্ম্মী অল্পই দেখা যায়। তিনি আমাকে তাঁহার অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু আমি আমার প্রিয় বন্ধুগণের সহৃদয় সেবা ও সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার আবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি নাই।

পুনার প্রসিদ্ধ নাটুভ্রাতাদের নির্ব্বাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী আমি ঐ অধিবেশনে উত্থাপন করিয়াছিলাম। দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দার এই নাটু-ভ্রাতাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিম ভারতে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের সময় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। শিক্ষা দীক্ষায় তাঁহারা মহারাষ্ট্রে সকলের প্রশংসার পাত্র ছিলেন। যখন আমি জাতীয় মহাসভার সভাপতিরূপে পুনায় যাই তখন তাঁহাদের আতিথেয়তার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া-ছিলাম। কংগ্রেস আন্দোলনকে সরকার সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও প্রকাশ্যভাবে ইহাতে যোগদান করিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হন নাই।

প্লেগ, বাধ্যতামূলক স্বতন্ত্রীকরণ, এবং আবাস পরিদর্শন পুনার অধিবাসীগণের মনে তখন এক ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। মিষ্টার গোখেল্ তখন বিলাতে ছিলেন ; তিনি ঐ সমস্ত বিবরণ প্রকাশ কয়িয়া অসুবিধায় পড়েন। হিন্দুর নিকট গৃহ ও গার্হস্থ্য জীবন পবিত্র—সেইজন্য গৃহাভ্যন্তরে কোনওরূপ হস্তক্ষেপেই হিন্দুগণ মর্ম্মান্তিক আহত হয়। পুনার অধিবাসীগণ তখন সেই কারণে এত উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে প্লেগ কমিটির সভাপতি রাণ্ড সাহেব (Mr. Rand) এবং লেফ্ন্যাণ্ট অয়রেষ্ট (Lieut. Ayerst) নিহত হন।

পুনার বিশিষ্ট নাগরিকরূপে নাটুভ্রাতৃদ্বয় সরকারকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন। শীঘ্র এক অপ্রচলিভ রেগুলেসানের* কবলে পড়িয়া তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইলেন ও তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দেশবাসীর কল্যাণকামনায় তাঁহাদের চেষ্টার ইহাই কি পুরস্কার, অথবা জনসাধারণের মনে ভীতি-উদ্রেকের ইহাই সরকারি পন্থা ? মনীষী বার্কের ভাষায় অনাবশ্যক এই ব্যবস্থাকে 'মানবের দুঃখবরণরূপ মহামূল্য ধনের অপচয়' বলা যাইতে পারে, কারণ শীঘ্রই সাহেবদের হত্যাকারীগণ ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ১৮৯৭

---

* Bombay Regulation XXV of 1827 corresponding to Bengal Regulation III of 1818.

খৃষ্টাব্দে, যখন ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইতেছিল তখন নাটুভ্রাতারা পাঁচমাস নির্ব্বাসনে।

শান্তির সময় সরকার যাহাতে রেগুলেসানদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন তাহাই উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়। কংগ্রেস প্রস্তাব করেন যে কোনও প্রদেশে বা বিশেষ স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে সরকার ঐ বিষয়ে পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিবেন এবং কোন ক্ষেত্রেই কাহাকেও তিনমাসের অধিক কাল বিনাবিচারে আটক রাখা হইবে না।

১৮৯৮ খৃষ্টব্দে ভারতের রাজনৈতিকগগন ঘনমেঘাচ্ছন্ন বোধ হইয়াছিল। সরকারের দমননীতি ও তজ্জনিত গণবিক্ষোভে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া দেশের উপর পড়িয়াছিল। প্লেগের প্রতিষেধকল্পে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা পুনা সহরে এরূপ কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে জনসাধারণের উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। ইহার পরই উক্ত দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারিহত্যা, নাটুভ্রাতাদের নির্ব্বাসন এবং পশ্চিম প্রেসিডেন্সিতে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের উদ্ঘাটনে সমস্ত দেশে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

এই বিক্ষুব্ধ সময়েই লর্ড কার্জ্জন ভারতের বড়লাটরূপে আসেন। পার্লামেন্টের এই বিশিষ্ট সদস্যের নিকট আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম যদিও সম্পূর্ণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সিমুলতলায় আমার গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় এবং তদবধি বৎসরে একবার তথায় বায়ুপরিবর্ত্তনের ফলে আমার স্বাস্থ্য এই পরিণত বয়সেও কার্য্যক্ষম রহিয়াছে। প্রতি বৎসর অধীর আগ্রহে আমি এইস্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতাম কারণ ইহাতে আমার যথেষ্ট উপকার হইত। সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া বা বিগত স্মৃতির আলোচনা করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে দিনযাপন করিতাম না। এইস্থানেই ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমি আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ রচনা করি এবং আমার জীবনস্মৃতির এক তৃতীয়াংশ লিখি। জনসমাগম হইতে বহুদূরে স্বাস্থ্য ও শান্তির মধ্যে আমি কার্য্য করিতে আনন্দ পাই। এখানে আমি বিশ্রাম লাভ করি কিন্তু লঘু কার্য্যের দ্বারা সে বিশ্রাম আরও উপভোগ্য হয়। নিরবচ্ছিন্ন আলস্য বা বিশ্রামের আমি কখনও পক্ষপাতী নই কারণ বুদ্ধিবৃত্তি তাহা হইলে সম্পূর্ণ অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময় লঘুভাবে মস্তিষ্ক পরিচালনা আমার স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া মনে হয় কারণ ইহাতে সমস্ত শরীরে রক্তচলাচলদ্বারা শরীরের কলুষ বাহির হইয়া যায়। স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন আমি পছন্দ করি না।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সরকারের মর্ম্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডে দেশে এক বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র সদয় ও সুদক্ষ চিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বারাকপুর ষ্টেসনের নিকট তাঁহার ঔষধালয় হইতে এক রাত্রে প্রত্যাগমন করিবার সময় তিনজন ইংরাজ সৈন্য মত্ত অবস্থায় তথায় উপস্থিত হয় এবং সামান্য বচসার পর নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহার পর শীঘ্রই তাঁহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয় কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি তথায় প্রাণত্যাগ করেন।

ডাক্তারের চীৎকারে যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল সেই সকল ব্যক্তিগণ আক্রমণকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাহাদের মত্ততা কাটিয়া গিয়াছিল এবং ব্যাপারের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাহারাও অতি দ্রুত পলাইতে থাকে। দুইজন একটী শিরস্ত্রাণ পশ্চাতে ফেলিয়া সৈন্যাবাসে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয় কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি একটী মসজিদের মধ্যে আশ্রয় লয়। পুলিস আসিয়া মসজিদের ভিতর হইতে ঐ দুষ্কৃতকারীকে ধরিতে সক্ষম হয়।

ডাক্তার আমাদের গৃহচিকিৎসক ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দুঃখ ও ঘৃণার সহিত আমি এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনা শ্রবণ করিলাম। আমার গৃহের পার্শ্বে অবস্থিত হাসপাতালে ডাক্তারকে রাখা হইয়াছিল কিন্তু দুর্ব্বৃত্তদের শাস্তি দিবার আগ্রহে আমি তাঁহাকে দেখিতে না গিয়া আমার বাসস্থান হইতে ১৬ মাইল দূরে আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থার জন্য সাক্ষাৎ করি, কারণ তখনকারদিনে ইউরোপীয়ান জুরীদের মনোভাবের জন্য এই সমস্ত মামলা প্রথম হইতে সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিতে হইত।

আমি ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া' নামক পত্রে ঘটনার সমস্ত বিবরণ তারে প্রেরণ করি এবং তাহারই ফলে পার্লামেণ্টে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়। আমি ছোট লাটবাহাদুর উড্‌বার্ণ সাহেবকে এ বিষয় জানাইলে তিনি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং বড়লাট বাহাদুর যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন তাহা আমাকে জানান। হাইকোর্ট সেসনে অপরাধীগণের বিচার হয়। ইউরোপীয়ানবহুল একটী বিশেষগঠিত জুরীর সাহায্যে প্রধান বিচারপতি বিচার আরম্ভ করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে তিনটী অভিযোগ ছিল ঃ—হত্যা, অপরাধজনক নরহত্যা এবং গুরুতর আঘাত। জুরী একমত হইয়া শেষোক্ত অপরাধে আসামীদের অপরাধী করেন ও আর দুইটী অভিযোগ হইতে মুক্তি দেন। প্রধান বিচারপতি কিন্তু আসামীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

অনুরূপভাবে নিহত গুরুদিৎ মাইতি নামক আর একটী ব্যক্তির ব্যাপারও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। মাইতি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল তখন তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া দুইজন পাদচারী ইংরাজ নিজেদের অবমানিত বোধ করিয়া তাহাকে এরূপভাবে আক্রমণ করে যে সেই বৃদ্ধ ঐ নিদারুণ আঘাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিম্ন আদালত কেবল অর্থদণ্ড করিয়াই ক্ষান্ত হইলে আমি বেঙ্গলী পত্রিকায় ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং স্যর জন্ উড্‌বার্ণকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। ইহার ফলে পুনর্বিবচারের আদেশ হয় কিন্তু একজন আসামী তখন বুয়র্ যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া গিয়াছিল। অপর যে আসামীর পুনর্বিবচারের ফলে চারি মাস কারাদণ্ড হয় সে সরকারী পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের কর্ম্মচারী ছিল। কারাদণ্ডের অবসানে তাহার পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

ডাক্তার সুরেশ চন্দ্রের মর্ম্মন্তুদ মৃত্যুতে একমাত্র উপায়ক্ষমকে হারাইয়া তাঁহার সংসার অসহায় হইয়া পড়ে। অল্পবয়স্ক পুত্রদের মধ্যে কেবল একজন তখন মেডিকেল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিল। ছোটলাট বাহাদুর স্যর জন উড্‌বার্ণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে তিনি উহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থনপূর্ব্বক বলেন যে ডাক্তারের পুত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি তাহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ করিয়া দিতে পারিতেন। যাহা হউক তিনি তাহাকে সবরেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করেন এবং পরে তাহার ভ্রাতাকেও আমার অনুরোধে স্যর এডোয়ার্ড বেকার ঐ পদে চাকুরি দেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে আমরা লর্ড কার্জ্জনকে তাঁহার সহানুভূতিসূচক বাক্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি কারণ আমরা আশা করিয়াছিলাম যে রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি উদার ও উন্নতিমূলক নীতি অনুসরণ করিবেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরের

ঘটনাবলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশাবাদীকেও নিরাশ করে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সিলেক্ট কমিটি হইতে বাহির হইয়া আসিলে লর্ড কার্জ্জন ইহার সম্বন্ধে যে আদেশ দেন তাহাতেই তাঁহার প্রতিক্রিয়া-মূলক কর্ম্মপদ্ধতি ও ভারতীয় জনসাধারণের মতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশিত হয়। সমস্ত কলিকাতা নগরীতে ইহাতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা অধিকতর বিক্ষোভ কেবল লর্ড কার্জ্জনের আর একটী অপকার্য্য বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনেই সম্ভব হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সহরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে নিম্নোক্ত যে প্রস্তাবটী আমি উত্থাপন করি তাহাতেই জনসাধারণের অবিশ্বাস ব্যক্ত হয়ঃ "ভারতের জাতীয় মহাসভা এতদ্বারা সরকারের প্রতিক্রিয়ামূলক শাসনপ্রণালির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। জনসাধারণের একত্রিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল্ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া বড়লাট বাহাদুর স্বায়ত্ত্ব শাসনের কণ্ঠরোধ করিতেছেন। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় স্বায়ত্ত্ব শাসনের পরিপন্থী অনুরূপ একটী আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।"

স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসনের মূলোচ্ছেদে উদ্যত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটী স্থানীয় ব্যাপার হইলেও সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যে বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ সচেতন থাকিত তাহা প্রাদেশিক হইলেও তখনকার দিনে কংগ্রেসে যেমন আলোচিত হইত সেইরূপ প্রাদেশিক সম্মেলনেও ভারতীয় সমস্যা আলোচনার বিষয় হইত এবং ইহার দ্বারা প্রদেশের সহিত অবশিষ্ট ভারতের মিলন সাধন ও জাতীয় জীবনের একতাবোধ সংসাধিত হইত।

ব্রিটিশ কমিটির সহায়তায় বিলাতে সাধারণ জন সভার অনুষ্ঠান ও ভারতীয় সংবাদাদির প্রচারকল্পে একটী প্রতিনিধিদল গঠনের প্রস্তাব লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয়। ঐ উদ্দেশ্যে একটী ধনভাণ্ডার সৃষ্টির প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে লাহোরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। প্রবীন কংগ্রেস সেবক লালা মুরলীধর আমাদের লাহোরে আমন্ত্রণ করেন। যতদিন তিনি জনসভায় যোগ দিতে সমর্থ ছিলেন ততদিন হাস্যকৌতুক দ্বারা কিরূপে কংগ্রেসকে সজীব রাখিতেন তাহা এখনও অনেক প্রবীন কংগ্রেস-সেবকের মনে আছে। জরা ও বার্দ্ধক্য কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কমাইতে পারে নাই।

লালা যশীরামের নিকট আমি লক্ষ্ণৌ সহরে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে লাহোর কংগ্রেসের পূর্ব্বে পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে আমি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিব। কংগ্রেসের প্রতি পাঞ্জাবের জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য তিনি ইহা প্রয়োজনীয় বোধ করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজার ছুটীতে তখন আমি সিমুলতলায় বিশ্রাম করিতেছিলাম, কিন্তু কর্ত্তব্যের এই আহ্বানে তথা হইতে পাঞ্জাব যাত্রা করিলাম। দিল্লী নগরীতে আমরা প্রথম জনসভা আহ্বান করি। সর্দ্দার গুরুচাঁদ সিং দিল্লীতে আমার সহিত মিলিত হন। দিল্লী, অমৃতসহর, লাহোর, রাওলপিণ্ডী প্রভৃতি স্থানে আমি জনসভায় বক্তৃতা দিই।

রাওলপিণ্ডীতে অবস্থানকালে আমি লালা যশীরামের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পাই। লাহোর কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাবু কালিপ্রসন্ন রায়ের ভাষায় লালা যশীরাম পাঞ্জাবে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত ভারই তাঁহার উপর ছিল এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টির জন্যই সম্ভব হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই এরূপ কর্ম্মবীরের মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং আগামী জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে ইহাতে এক বিষাদের ছায়া পতিত হয়।

লাহোর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন একজন বাঙ্গালী। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন আর কি হইতে পারে? সমরনিপুণ জাতিরা আমাদের

প্রদেশবাসীগণকে ঘৃণা করে একথা যে মিথ্যা অপবাদ তাহা এই ব্যাপারেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা গিয়াছিল। কালিপ্রসন্ন রায় মহাশয় পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব, স্বাধীনচেতা নাগরিক এবং একজন সাধু ব্যক্তিরূপে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্যেকের সম্মানের পাত্র ছিলেন। সকলেরই ধারণা ছিল যে জাতীয় মহাসভার সহিত সহযোগিতা না করিলে তিনি পাঞ্জবের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতির পদে আসীন হইতেন।

লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে আমি পুলিস, রেলওয়ে প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ রাজকার্য্য হইতে ভারতীয়গণকে সরাইয়া রাখিবার প্রথার নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করি।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় সভার যে অনুষ্টান হয় তাহাতেও আমি অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করি এবং বিলাতের কমন্স সভা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যুগপৎ গ্রহণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেন তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য অভিমত ব্যক্ত করি।

জাতীয় মহাসভার এই অধিবেশনেই উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শেষবারের জন্য অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে পুনরায় বিলাতগমন করিতে হইলেও জাতীয় মহাসভার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ব্যাধির জন্য একটুও কমে নাই। ওয়ালথামষ্টো (Walthamstow) হইতে প্রগতিশীল দলের মনোনীতরূপে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য পদপ্রার্থী হন। জয়ের আশা থাকিলেও প্রতিকূল ভাগ্যের জন্য তাঁহাকে এই দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয় কারণ তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই মন্দ হইতেছিল। শীঘ্রই বিলাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ বাঙ্গালা তথা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর। সমগ্র বাঙ্গালা দেশ যখন বঙ্গভঙ্গের জন্য বিষাদক্লিষ্ট সেই সময়েই একে একে উমেশ চন্দ্র, বদরউদ্দিন তায়াবজি, আনন্দ মোহন বসু ও নলিন বিহারী সরকার মহাশয় পরলোকের পথে যাত্রা করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

১৯০০—১৯০১।

ইং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমার সাংবাদিক জীবনের স্মরণীয় বৎসর। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত বেঙ্গলী পত্রিকাখানি সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয় এবং তাহার পর ইহা দৈনিকে পরিণত হয়। পত্রিকাখানিকে দৈনিকরূপে প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব পূর্ব্বে বহুবার আমার নিকট করা হইলেও আমি তাহাতে কর্ম্মজীবন সঙ্কুচিত হইবে ভাবিয়া রাজী হইতে পারি নাই। কিন্তু শীঘ্র আমি বুঝিলাম যে ভারতীয় স্বার্থের পোষক ইংরাজি সাপ্তাহিকে বাঙ্গালা দেশ তৃপ্ত হইতে ছিল না। জাতীয়তার প্রসারের সহিত সংবাদ পত্রের চাহিদাও বাড়িতেছিল এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি প্রভাব ও জনপ্রিয়তা হারাইতেছিল। অতএব আমাকে অবস্থা ও প্রয়োজন মত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইল।

আমার সহৃদয় বন্ধু স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব আমার নিকট উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। হিতবাদীর অন্যতম মালিক বাবু উপেন্দ্র নাথ সেনের সহিত দশ বৎসরের জন্য যৌথ কারবারের চুক্তি সম্পাদন করিয়া বেঙ্গলী পত্রিকাখানিকে দৈনিকরূপে প্রকাশিত করিতে সক্ষম হই। ভারতীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে আমাদের বেঙ্গলী পত্রিকাই প্রথম রয়টারের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হয় এবং সে জন্য কোনও দিন আমাদের ক্ষোভ করিতে হয় নাই।

আমার সম্পাদকতায় বেঙ্গলী পত্রিকার সাফল্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু এই সূত্রে উক্ত পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ তারাপ্রসন্ন মিত্রের দুর্ল্ভ অনুরাগ ও ব্যবসা বুদ্ধির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না কারণ তিনিই এই পত্রিকাখানির জীবনস্বরূপ ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার দ্বারা তিনি এই পত্রিকার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জীবন ও রিপণ কলেজের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্বর্গীয় অমৃত চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জীবন হইতে আমি এই মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ের সাফল্য লাভের জন্য প্রধানতঃ সাধুতা ও সাধারণ বুদ্ধির সহিত অসীম অনুরাগের প্রয়োজন।

আমি ৪০ বৎসরের অধিককাল সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে বুঝিতে পারিয়াছি যে সম্পাদক অপেক্ষা কর্ম্মাধ্যক্ষের উপর সংবাদ পত্রের সাফল্য নির্ভর করে। সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব অগ্রাহ্য করিবার নয় কারণ তিনিই জনমত গঠন করেন কিন্তু পরিচালকের কর্ম্মকুশলতা আরও অধিক প্রয়োজন।

সাংবাদিক জীবনে আমি কুৎসাবাদ, রাজদ্রোহ অথবা ব্যক্তিগত দোষারোপ পরিহার করিতে সচেষ্ট থাকিতাম। সময়ে সময়ে আমি তীব্র ভাষায় লিখিতাম বটে—কিন্তু সেই সব সময়েই তীব্র ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত বলিয়াই ঐরূপ করিতাম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জনমত এত বিক্ষুব্ধ ছিল যে সে সময় সংযত ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব হইত না।

আমাদের শাসকগণ সংবাদপত্রের তীব্র ভাষার সম্বন্ধে প্রায় অভিযোগ করেন কিন্তু তাঁহারাই যে এই উদ্দীপনার কারণ তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। কোন সংবাদপত্রই কুৎসাবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া চলিতে পারে না। কখনও জন স্বার্থের খাতিরে, কখনও বা লিপিকারের দোষে সংবাদপত্রে অপরের কুৎসা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সব সময়ে যথার্থ দায়ী না হইলেও কার্য্যতঃ ও আইনতঃ তিনিই প্রকাশিত সমস্ত বিষয়ের জন্য দায়ী। ১৯১১ খৃঃ মে মাসে এইরূপ একটী ব্যাপার ঘটে যখন আমি দ্বিতীয়বার আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হই। মেদিনীপুর ষড়যন্ত্রের মামলা তখন বিচারাধীন ছিল। মেদিনীপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ ওয়েষ্টন সাহেব উক্ত মোকদ্দমায় যে এজাহার দেন তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী

মন্তব্য বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; অধুনা 'ট্রিবিউন্' পত্রের সম্পাদক ও বেঙ্গলীর তদানীন্তন সহ-সম্পাদক বাবু কালিনাথ রায় ঐ মন্তব্যগুলি লেখেন কিন্তু আদালতে জবাব দিবার সময় আমি ঐ রচনার সমস্ত দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করি। মহাপ্রাণ কালিনাথ ইহাতে কিন্তু বাধা দেন এবং আমাকে লিখিত একখানি পত্রে নিজের উপর উক্ত রচনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার লিখিত পত্রের কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না কিন্তু তাঁহার অনুরোধে উক্ত পত্রখানি আমি আমার পক্ষের ব্যারিষ্টার মিষ্টার এ, চৌধুরীকে দেখাই। মামলায় আমরা কোনরূপে ঐ পত্র ব্যবহার না করিলেও, মিষ্টার চৌধুরী অপর পক্ষের Advocate Generalকে পত্রখানি দেখাইয়াছিলেন। ইহাতে কি ফল হইয়াছিল জানি না কিন্তু একটী সম্পূর্ণ আইনগত কারণে মামলাটি খারিজ হইয়া যায়। \

বেঙ্গলীর সম্পাদক থাকা কালে প্রায় আমি ব্যক্তিগত আক্রমণের কারণ হইতাম। জনসাধারণের কার্য্যে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করেন ইহার জন্য তাঁহাদের প্রস্তুত থাকিতে হয় কারণ ইহা তাঁহাদের জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

দশ বৎসর পরে আমি বেঙ্গলী পত্রিকার একক মালিক হই। ১৯১৯ খৃঃ জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ঐরূপ থাকিবার পর আমি কাশিম বাজারের মহারাজের সহিত একটী চুক্তি সম্পাদন করি। ইহার ফলে তিনি বেঙ্গলী পত্রিকার অন্যতম মালিক হয়েন এবং একটী নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কারবারটীকে একটী যৌথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সর্ত্ত গৃহীত হয়। পরবর্ত্তী ঘটনা প্রবাহে আমি বেঙ্গলীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

আহমেদাবাদ সহরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় মহাসভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমি আমন্ত্রিত হই। ১৯০২ খৃঃ অক্টোবর মাসে যখন আমন্ত্রণ আসে তখন আমি সিমুলতলায়

অবস্থান করিতে ছিলাম। আমার বন্ধু স্যার দিন্‌সা ওয়াচা বেসরকারি-ভাবে এ সম্বন্ধে আমাকে লেখেন। আমাকে অব্যাহতি দিয়া কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করিতে আমি অনুরোধ করি। স্যর দিন্‌সা ওয়াচা পুনরায় লিখিয়া পাঠান যে দিল্লী দরবারের অনুরূপ কোনও আকর্ষণ জাতীয় মহাসভার অনুষ্ঠানে আনিতে হইলে স্যর ফিরোজ সা মেহটা ও অভ্যর্থনা সমিতির মতে আমারই সভাপতি হওয়া কর্ত্তব্য। আমি কিন্তু ঐ সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া চিঠি লিখিলেও শেষ অবধি আমাকেই সভাপতি হইতে হয়।

আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভার অধিষ্ঠানটী সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। আহমেদাবাদের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক আমাকে যে রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রদর্শিত হয় তাহার উত্তরে আমি আমার বক্তৃতার শেষ অংশে বলিয়াছিলাম "জাতীয় মহাসভার সভাপতি-রূপে আমি যে সম্মান পাইয়াছি তাহা বিজয় অভিযানের পর স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী নৃপতির ন্যায় কিন্তু এ সম্মান আমাকে প্রদত্ত হয় নাই, ইহা সেই মহান্‌ আদর্শের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যাহার প্রতিনিধিরূপে আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

জাতীয় মহাসভার কয়েকদিন পরেই করোনেযন দরবার অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। ভারতীয় জনমত এই ব্যয় বাহুল্যের প্রতিবাদ করিলেও গভর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। আমার অভিভাষণে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ই অধিক ছিল। আজীবন শিক্ষাব্রতীরূপে উক্ত সমস্যা সম্বন্ধে আমি বিশেষ উৎসুক ছিলাম। লর্ড কার্জ্জনের বহু অপকীর্ত্তির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তথাকথিত সংস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারদর্শিতা বৃদ্ধির ওজরে তিনি কলিকাতার পৌরসভা সরকারী অধীনে আনয়ন করেন এবং সেই একই অজুহাতে এক্ষণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

জনমতকে পদদলিত করিয়া পারদর্শিতার অজুহাতে তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হন।

১৯০১ খৃঃ লর্ড কার্জ্জন যে শিক্ষা সম্বন্ধীয় সম্মেলন আহ্বান করেন তাহাতে কেবলমাত্র ইংরাজ শিক্ষাব্রতীগণ আমন্ত্রিত হন। এই গোপন বৈঠকে বড়লাট বাহাদুর ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষে তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন তাহাতে গোপনীয়তার স্থান নাই—শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে কোনও রূপ গোপনীয়তার প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক তাহা বলাই বাহুল্য। কথায় ও কাজে এরূপ বৈষম্য বিরল, কারণ যে সময়ে ও যে ব্যাপারে গোপন ষড়যন্ত্রের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছিল সেই ব্যাপারে ও সেই সময়েই ঐ নির্ল্লজ্জ উক্তি করিতে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কিন্তু ইহাই তাঁহার রীতি ছিল এবং ইহার জন্য আমরা অনুকম্পা বোধ করিতাম, কারণ এই লর্ড কার্জ্জনই পাশ্চাত্য ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠান শেষ হইবার সঙ্গে একটী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয় কিন্তু এই কমিশনে একজনও হিন্দু লওয়া হয় নাই যদিও এই দেশের শিক্ষা সমস্যায় হিন্দুরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ ছিল। বেঙ্গলী পত্রিকায় আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করি এবং ভারতের জনমত আমাকে আন্তরিক সমর্থন করে। ইহারই ফলে পরে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

পাঁচ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে যে বিবরণী দাখিল হয় তাহাতে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতের উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্যই যেন এই ব্যবস্থা হইতেছিল এবং সেই জন্যই ১৮৮২ খৃঃ শিক্ষা-সম্মেলন কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণীর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব ইহাতে করা হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি স্থান পায়ঃ—(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি রহিত করণ (২) আইন ক্লাসগুলি তুলিয়া দেওয়া এবং

(৩) সিণ্ডিকেট্ কর্ত্তৃক কলেজের নিম্নতম বেতনের হার নির্দ্ধারণ যাহা কার্য্যতঃ বেতনের হার বৃদ্ধিরই প্রস্তাব মাত্র। এইরূপে পারদর্শিতা বৃদ্ধির অজুহাতে শিক্ষার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিবার প্রস্তাব হয়। অধিকাংশ সদস্যই স্ব স্ব রিপোর্টে ভারতীয় ব্যবহারজীবীদের বিরুদ্ধে স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আইন শিক্ষাও আইনজীবীদের বিরুদ্ধে চিরকালই সরকার প্রতিকূল। সদস্যগণের মধ্যে কেবল স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিকূলমত পোষণ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার বিবরণীতে স্বীয় মত নির্ভীক ভাবে ব্যক্ত করেন;

শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভার উদ্যোগ হয় এবং সরকারের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করা হয়। এই বিক্ষোভ বৃথা যায় নাই। ভারত সরকার জনমত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া হোম গভর্ণমেণ্ট ১৯০২ খৃঃ অক্টোবর মাসে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। আইন ক্লাসগুলি সম্বন্ধে ইহাই ঠিক হয় যে প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া আদর্শ কেন্দ্রীয় আইন কলেজ স্থাপিত হইলেও অন্য আইন কলেজ থাকিতে পারিবে। বেতনের নিম্নতম হার নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সরকার নীরব থাকেন।

উক্ত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া একটী ইউনিভার্সিটী এক্ট (বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন) প্রস্তুত হয়। উচ্চ শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই দরিদ্র দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনওরূপ আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলেও উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধিরই পথে চলিয়াছে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

১৯০৪ খৃঃ ইউনিভার্সিটী এক্ট আইনে পরিণত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উক্ত আইনানুসারে নিয়মাবলি প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একটী সমিতি গঠিত হয়। ইউনিভার্সিটী সংক্রান্ত আইনটী বিধিবদ্ধ হইবার পর আমি রিপণ কলেজের উপর আমার মালিকানী সত্ত্ব ত্যাগ করতঃ কলেজটীও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয় একটী ট্রাষ্টীর হস্তে সমর্পণ করি। আর্থিক বা অন্য কোন স্বার্থ সম্বন্ধ না রাখিয়া আমি মাত্র অন্যতম ট্রাষ্টীরূপে কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিলাম ; তবে আমার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার ক্ষমতা আমারই রহিল।

কলেজ ও বিদ্যালয়টী এইরূপে সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইলে আমি ইহার উপযুক্ত স্থায়ী গৃহের চেষ্টা আরম্ভ করিলাম এবং এক্ষণে ইহা আর আমার নিজস্ব সম্পত্তি নয় বলিয়া অর্থ সংগ্রহে আমার কোনও দ্বিধা রহিল না। ১৯১০ খৃঃ আগষ্ট মাসে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এডওয়ার্ড বেকার কলেজ গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যে প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার এরূপ নিকট সম্বন্ধ সেই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্যভাবে সাহায্যের জন্য স্যর জন্ রীস্ বেকার সাহেবকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। ইহাতে তিনি আমাকে তাঁহার বেলভিডিয়ার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ সমালোচনার প্রত্যুত্তর হিসাবে আরও পাঁচ হাজার টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই দৃঢ়চেতাঃ সদয় ব্যক্তিটী রিপণ কলেজের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত কলেজের আইন ক্লাসগুলি কিছুতেই রক্ষা পাইত না। আইন কলেজের পাঠাগারটী সুসজ্জিত ছিল না বলিয়া তিনি কয়েক হাজার টাকার ল-রিপোর্ট কলেজকে দান করেন।

কলেজ গৃহের জন্য অর্থ সংগ্রহ দুরূহ ব্যাপার, কারণ জনসাধারণের অনুভূতি প্রবলভাবে উদ্দীপিত না হইলে অর্থ সংগ্রহ সহজসাধ্য হয় না।

আমাদের দরিদ্র দেশে ইহা আরও কঠিন কারণ একই শ্রেণীর লোকের নিকট বার বার হাত পাতিতে হয়।

স্যর এডওয়ার্ড বেকার ছুটীতে যাইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত স্যর উইলিয়াম্ ডিউককে সরকারী অর্থের জন্য আবেদন করি। তিনি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং কলেজগৃহটী যখন পরিদর্শন করিতে আসেন তখন নির্ম্মাণ কার্য্য সামান্যমাত্র অগ্রসর হইয়াছিল দেখিয়া তিনি আমাকে বলেন "ব্যানার্জ্জি, আপনি বিশ্বাসের উপর নির্ম্মাণ করিতেছেন।" ইহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম "বিশ্বাস যে পর্ব্বত প্রমাণ বাধাকেও দূর করিতে সমর্থ তাহা বোধহয় আপনি জানেন।" উত্তরকালে আমার বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছিল।

১৯১৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যাপনা কার্য্য হইতে আমাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়, কারণ ঐ সময় আমি বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হই। দীর্ঘ ৩৮ বৎসর কাল যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম সেই কার্য্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে আমি সত্যই মর্ম্মপীড়া অনুভব করি। তৃপ্তির সহিত আমি যখন আমার দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনের কথা ভাবি তখনই আমার মনে পড়ে কি গভীর ভাবে আমি দেশের তরুণ ছাত্রদের স্নেহ করিতাম এবং তাহারাও কি ভাবে আমাকে প্রতিদান দিয়াছিল। তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষাগঠনে আমি সাহায্য করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত করিয়াছি বলিয়া অনেকে আমায় দোষ দেন কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ঐ যথাযথ চিন্তাধারাই বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলির শ্রেষ্ঠ প্রতিবন্ধক।

যখনই আমি তরুণ ছাত্রদের দেশপ্রেম শিক্ষা দিয়াছি তখনই তাহা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে উপদেশ দিতে ভুলি নাই। স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য হইলেও নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত তাহা লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য

ছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপন্থার উদ্ভব হয়'—শিক্ষক বা নেতার উপর তাহা নির্ভর করে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে জনমত গঠিত না হইলে ফ্রান্সের বিখ্যাত বিপ্লব ঘটিতে পারিত না।

যাহা হউক তরুণ ছাত্রদের সাহচর্য্য আমার জীবনে এক পরম লাভ বলিয়া আমি মনে করি, কারণ ইহার জন্যই জীবনসায়াহ্নেও আমি আমার মনের তারুণ্য ও আশাবাদ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। ক্লাসে অধ্যাপনাকালে আমারও যথেষ্ট শিক্ষা হইত। তাহাদের স্বদেশপ্রেমিক হইতে, সৎ হইতে ও সত্যানুরাগী হইতে কেবল শিক্ষাই দিতাম না, পরন্তু তাহারাও আমাকে মানসিক ঔদার্য্য ও তারুণ্য বজায় রাখিয়া আশাবাদী হইতে প্ররোচিত করিত। সেইজন্য যখনই অধ্যাপনাঅন্তে গৃহে ফিরিতাম তখনই মনে মনে অনুভব করিতাম যে তরুণমনের বহু গুণ আমি যেন নূতন করিয়া লাভ করিয়াছি এবং আমার অভিজ্ঞতাবহুল জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ সব গুণ জীবন যুদ্ধে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত।

ফ্রেড্‌রিক দি গ্রেট্‌ কখনও কোনও শিক্ষককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। মহাত্মা বিদ্যাসাগর একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালাদেশের শাসকদেরও উহাই না কি রীতি। কিন্তু আমার বোধহয় শিক্ষকের জীবনে সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলিরই আবশ্যক। আমেরিকার একাধিক প্রেসিডেণ্ট শিক্ষক ছিলেন। প্রায় চল্লিশবৎসর কাল তরুণ ছাত্রদের সাহচর্য্যে যে উপকার লাভ করিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। অধ্যাপনা কার্য্য ত্যাগ করিলেও কলেজের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে এখনও আমি শিক্ষাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সহিত আমার সম্বন্ধ আমরণ বিদ্যমান থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্যরূপে আমি পাঁচবৎসর

কার্য্য করিয়াছিলাম। নূতন ইউনিভার্সিটি আইনে দশবৎসরের পুরাতন রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটগণ সেনেট সভায় পাঁচজন সদস্য পাঠাইবার অধিকার লাভ করেন। আমি প্রার্থীরূপে দাঁড়াইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোটে নির্ব্বাচিত হই। আমি যখন সেনেটের সদস্য তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন স্যার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনটী প্রণয়নে তিনি একটী বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলির সহিত দীর্ঘ পরিচয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে সম্যকরূপে বুঝিবার ক্ষমতার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি যোগ্যতম কর্ণধার ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অখণ্ড কর্ত্তৃত্ব ও প্রতাপ ছিল। তিনি এরূপ বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির সহিত নূতন নিয়মাবলি প্রবর্ত্তন করেন যে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকে নাই। তাঁহারই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য স্যর তারকনাথ পালিত ও স্যর রাসবিহারী ঘোষ রাজোচিত দান করেন। আশুতোষের কর্ম্মদক্ষতায় তাঁহাদের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাঁহারা ঐ বিরাট দান করেন। তাঁহারই আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার বিরাট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

বিচারপতির পদ হইতে অবসরগ্রহণের পরই তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ আবশ্যক, কারণ তাঁহার স্থান পূর্ণ হইবার নয়।

ইং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে বিরত হই। ঐ বৎসরেই আমি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদপ্রার্থী হই এবং উহাতে আমার প্রতিযোগী ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। এক বিশেষ অবস্থায় আমার পরাজয় ঘটে। নির্ব্বাচন-কালে উভয়ের পক্ষে ভোট সমান হইলে ভারত সরকারের নিকট ব্যাপারটী যায় এবং আইনানুযায়ী দুইমাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ

করিতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য ছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন এই রীতির লঙ্ঘন করিয়া তিনমাস পরে যখন আমি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আর রহিলাম না তখন পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন। এইরূপে আমাকে পরাজিত করা হয়।

এই কপট ও অসাধু কৌশলের দ্বারা আমায় বড়লাট বাহাদুরের সভা হইতে সরাইয়া রাখা হইল। পূর্ব্বেও কয়েকবার আমি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ প্রার্থী হই কিন্তু প্রত্যেকবারই আমি পরাজিত হই এবং আমার মনে হয় সরকারী প্রভাবের ফলেই এইরূপ ঘটা সম্ভব হইয়াছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বঙ্গ-বিচ্ছেদ।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে ইং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ একটী স্মরণীয় বৎসর কারণ ঐ বৎসর যে নবযুগের সূচনা হয় তাহার প্রভাব জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ঐ বৎসর সরকার বঙ্গ-বিচ্ছেদ করেন।

বাঙ্গালা দেশ একজন শাসকের পক্ষে শাসন করা শক্ত এইরূপ মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই সরকারী মহলে দেখা যাইতেছিল এবং শাসন কার্য্যের সুবিধার ব্যপদেশে বঙ্গ-বিভাগের প্রয়োজনীয়তার আভাষও পাওয়া যাইতেছিল। ঐ ধারণানুযায়ী ১৮৭৪ খৃঃ বাঙ্গালাদেশ হইতে আসাম প্রদেশকে বিভক্ত করিয়া একজন চীফ্ কমিশনারের অধীন করা হয়। দ্বিধাকৃত আসামের মধ্যে সিলেট্, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া নামক তিনটী বাঙ্গালাভাষাভাষী জেলা থাকা সত্বেও বাঙ্গালাদেশে তখন কোন আন্দোলন হয নাই, কারণ জনমত তখনও সুগঠিত হয় নাই এবং একতাবোধ অজ্ঞাত ছিল। জনসাধারণ বিনা দ্বিধায় এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ করে এবং আসামবাসীগণ সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ তাঁহারা তখন মনে করিয়াছিলেন যে ইহার দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল হইবে।

ভাল অথবা মন্দ—সকল ব্যাপারেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা যায় এবং সেইজন্যই বোধ হয় শীঘ্র সরকার বাহাদুর পারদর্শিতা ও চাকুরির সুবিধার অজুহাতে দেশবিচ্ছেদব্যবস্থা আরও কার্য্যকরী করিতে মনস্থ করেন। আসামে অল্পসংখ্যক সিভিলিয়ান রাজকর্ম্মচারীর প্রয়োজন ছিল বলিয়া বাঙ্গালা ও যুক্তপ্রদেশ হইতে সিভিলিয়ানদের পাঠান হইত কিন্তু ঐ সমস্ত রাজকর্ম্মচারীরা পুনরায় আসাম হইতে চলিয়া আসিতে ইচ্ছুক হইতেন কারণ তথায় কার্য্যে উন্নতির আশা অল্প ছিল। ঐ সকল কারণে সরকার মনে মনে বৃহত্তর আসাম সৃষ্টির

ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। বাঙ্গালা দেশের চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা—এই তিনটী জিলা বাহির করিয়া আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইলে চট্টগ্রাম বিভাগের অধিবাসীগণ ইহাতে প্রবল আপত্তি করেন। নূতন ব্যবস্থাপক সভা তখন কার্য্য করিতেছিল। জনমত তখন অনেকটা শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল এবং সেইজন্য জনমত সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা দুঃসাধ্য ছিল বলিয়া উক্ত প্রস্তাব তখনকার মত চাপা থাকিলেও সরকারের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।

শাসনতন্ত্রের কর্ণধার তখন লর্ড কার্জ্জন। তিনি তাহার অশান্ত কর্ম্মশক্তির তাড়নায় নূতন নূতন উদ্ভাবনে ব্যস্ত। সীমানির্দ্ধারণের প্রশ্ন তাঁহার মনে উদয় হয় এবং তিনি ভারতবর্ষের মানচিত্র নূতন করিয়া ঠিক করিতে মনস্থ করেন। বাঙ্গালা হইতে সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া উক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটী ও ঢাকা ও মৈমনসিংহ এই দুইটী জিলা আসামের অন্তর্ভূক্ত করিবার প্রস্তাব হয়।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই প্রস্তাবের এত তীব্র বিরোধিতা করে যে সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করেন নাই। সেইজন্য পূর্ব্ববঙ্গের নেতাদের বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় মতে আনিবার চেষ্টা সরকার পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। তদানীন্তন ছোট লাট স্যর এনড্রু ফ্রেসারের (Sir Andrew Fraser) সভাপতিত্বে বেলভিডিয়ার প্রাসাদে উক্ত বৈঠকের অধিবেশন হয়। নব প্রতিষ্ঠিত জমিদার সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সমস্ত ব্যবস্থা করেন। তিনি আমাকে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের অনুরোধ করেন কিন্তু উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তির উপর কার্য্যভার পড়িয়াছে দেখিয়া যোগদান নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

এই বৈঠকের ফলে সরকার জনমতের সম্মান রক্ষা করিবে মনে করিয়াছিলাম কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা আমার সে আশা পূর্ণ করে নাই। লর্ড কার্জ্জন বাহ্যতঃ জনমত সংগ্রহের চেষ্টায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

ভয় দেখাইয়া কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে, পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হন। তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন পদ্ধতি যে নবচেতনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেন না এবং সেইজন্যই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার উপস্থিতি নেতৃবৃন্দকে তাঁহার মতে আনিতে সমর্থ হইবে। মৈমনসিংহে তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের অতিথি হন। বাঙ্গালার জমিদারদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বিরল ছিল। বড়লাট বাহাদুরকে রাজোচিত আতিথেয়তার সহিত সম্মানিত করিলেও মহারাজা স্থির ও নির্ভীকভাবে তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ তিনি দুর্দ্দৈবস্বরূপ মনে করেন এবং সেইজন্য ইহার প্রতিকূল।

পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে বড়লাট বাহাদুরের বঙ্গভঙ্গ প্রচেষ্টা আরও পরিপুষ্ট হয় এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও ফরিদপুর ও বরিশাল জেলাকে প্রথম উক্ত ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। জনসাধারণকে কিছুমাত্র ইঙ্গিত না দিয়া বিরাট গোপনীয়তার অন্তরালে এই প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইতেছিল। জনমতের অনুসরণ সরকারের ইচ্ছা ছিল না। লর্ড কার্জ্জন ও স্যর এনড্রু ফ্রেসার প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে সহজেই তাঁহারা নেতৃবৃন্দকে স্ব-মতে আনিতে সক্ষম হইবেন কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাহা সম্ভব নয় তখন জনমত পদদলিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের সাহস ও ঔদার্য্যের অভাব তাঁহাদের এই গোপনীয়তায় প্রকাশিত হয়!

বাঙ্গালার তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই এক স্মরণীয় দিবস, কারণ বাঙ্গালার জনসাধারণ ঐ দিনই বঙ্গবিচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারেন। স্তব্ধ অধিবাসীগণ প্রথম যখন শুনিলেন যে বহুস্মৃতিবিমণ্ডিত উত্তরবঙ্গকে প্রাচীন প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে তখন তাঁহারা বজ্রাহতের ন্যায় বোধ করেন। কিন্তু হতবুদ্ধি হইলেও আমরা কর্ত্তব্য ভুলি নাই এবং বৈধ উপায়ে এই বঙ্গবিচ্ছেদের পরিবর্ত্তন সাধনে মনস্থ হই।

লাঞ্ছিত ও অবমানিত জাতির বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন কারণ ক্রমবর্দ্ধমান একতাবোধ নষ্টকরিবার জন্যই এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য প্রথম ইহার উৎপত্তি হইলেও পরে শাসকসম্প্রদায়ের হাতে ইহা রাজনৈতিক চালে পরিণত হয় এবং একবার কার্য্যে পরিণত হইলে ইহা যে ভারতের উন্নতির সোপান স্বরূপ হিন্দুমুসলমান মিলনের পথে পরিপন্থী হইবে তাহাও সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল। খোলা খুলিভাবেই ইহা প্রচার করা হয় যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামকে মুসলিম প্রদেশে পরিণত করা হইবে এবং ঐ নূতন প্রদেশের শাসনবৈশিষ্ট্য ধর্ম্মগত বৈষম্যের উপর স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যও প্রচারিত হয়।

শীঘ্রই আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদে আমাদের প্রথম সম্মেলন হয়। মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। মিষ্টার কটন (H. E A. Cotton) ঐ সভায় যোগ দেন এবং বঙ্গবিচ্ছেদের তীব্র নিন্দা করেন। 'ষ্টেটসম্যান' ও 'ইংলিসম্যান' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদকদ্বয় এই ব্যাপারে বাঙ্গালার জনসাধারণের কার্য্যে সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলনের সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন হইলেও অধিকদিন এইরূপ মনোভাব থাকে নাই।

বঙ্গবিচ্ছেদ আদেশের পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য এবং শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য যদি প্রাদেশিক বিভাগ একান্ত আবশ্যক বোধ হয় তাহা হইলে বঙ্গভাষা ভাষীদের এক শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত রাখিবার জন্য এক বার্ত্তা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন কর্ত্তৃক বড়লাট বাহাদুরের নিকট পাঠাইবার সিদ্ধান্ত উক্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়। পরবর্ত্তীকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ যে ভাবে প্রাদেশিক বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেইরূপ ব্যবস্থাই উক্ত সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করিয়াছিল।

মহারাজার প্রসাদে উক্ত সম্মেলনের পরে প্রায় প্রত্যহই ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েসান হলে অথবা মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের গৃহে অনুরূপ সভার অনুষ্ঠান হইতে থাকে। বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলনের ইতিহাসে ৭ই আগষ্ট স্মরণীয় থাকিবে কারণ ঐ দিন টাউনহলে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। মফঃস্বল হইতে প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং সকলেই এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কেবল সভা সমিতি করিলেই অন্যায়ের প্রতিরোধ হইবে না, কারণ লর্ড কার্জ্জন জনমতকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিয়া যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার যথাযথ উত্তর দিতে হইলে আরও কিছু করা প্রয়োজন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

স্বদেশী আন্দোলন।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদরূপ দুর্য্যোগের মধ্যেই বয়কট্ বা বর্জ্জন নীতির উদ্ভব হয়। কখন এবং কাহার দ্বারা ইহার সৃষ্টি তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন কারণ সেই দুর্য্যোগে ঘনঘটার বক্ষ ভেদ করিয়া সমগ্র জাতির প্রাণে যে নব চেতনা জাগ্রত হয় তাহা সমস্ত জাতির মনের দ্বার খুলিয়া নব নব প্রচেষ্টা ও কর্ম্মপদ্ধতি দেখাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বাল্যকালে মেকলের ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম যে প্রথম চার্লস ও পার্লামেণ্টের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ হয় তাহার প্রারম্ভে সমগ্র দেশের মন ঐ একই বিষয়ে আকৃষ্ট হয় এবং সকলেই অন্য চিন্তা ভুলিয়া ঐ ব্যাপারেই মনোনিবেশ করে। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ এদেশে অনুরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। সমগ্র প্রদেশ তখন ঐ এক চিন্তায় মগ্ন। জাতির মনে তখন ঘৃণা ও বিস্ময়; এবং এই বিস্ময় ও অপমানবোধ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল বেলভিডিয়ার প্রাসাদে অনুষ্ঠিত মিথ্যাসম্মেলনের অভিনয় ও জনমত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষার জন্য। দেশের এইরূপ অবস্থায় বিলাতি দ্রব্য বর্জ্জন নীতির প্রচার আরম্ভ হয়। ঠিক কাহার দ্বারা ইহার প্রচলন তাহা বলা যায় না—বোধ হয়, একই সময়ে অনেকেই ইহা আরম্ভ করেন। পাবনা জেলার এক সভায় এই নীতি প্রথম ঘোষিত হয় এবং তারপর অন্যান্য মফঃস্বল সহরে অনুষ্ঠিত সভায় ইহার পূর্ণঘোষণা হইয়াছিল। চীনদেশ কর্ত্তৃক আমেরিকা জাত দ্রব্যের সাফল্যমণ্ডিত বর্জ্জন সমগ্র এসিয়া মহাদেশে ও ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহে তখন প্রচারিত হইতেছিল।

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনেচ্ছা আরও বৃদ্ধি পায় নূতন শিল্প অন্দোলনের কল্যানে। স্বদেশী আন্দোলন তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং দেশের শিক্ষিত সমাজে স্বদেশী বোধ পূর্ণভাবে জাগরুক হইয়া উঠিতেছিল।

আমাদের শিল্পসংক্রান্ত অসহায়তা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই এই বর্জ্জন নীতি রাজনৈতিক ও শিল্পসংক্রান্ত—এই দ্বিবিধ উন্নতির পরিপোষকরূপে গৃহীত হয়।

এই আন্দোলন প্রারম্ভে কিংবা পরে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন রূপে সমালোচকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা যথার্থ নয়, কারণ বিলাতের জনসাধারণের নিকট যখন আমরা ভারত সরকারের বঙ্গবিভাগ আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিতেছিলাম ঠিক সেই সময়েই ব্রিটিশ-বিরোধী কোন আন্দোলন আরম্ভ করা কেহই যুক্তি সিদ্ধ মনে করিতে পারে না। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের গৃহে যে শেষ সম্মেলন হয় তাহাতে বর্জ্জন-নীতি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়ঃ—

"ভারতীয় ব্যাপারে বিলাতের জন সাধারণের ঔদাসীন্য ও বর্ত্তমান ভারতসরকার কর্ত্তৃক জনমত সম্পূর্ণরূপে পদদলনের প্রতিবাদকল্পে যতদিন বঙ্গদেশকে দ্বিধাবিভক্ত রাখা হইবে ততদিন বিলাতী দ্রব্য ক্রয় না করিবার যে সংঙ্কল্প মফঃস্বলে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত হইয়াছে তাহা এই সভা পূর্ণভাবে অনুমোদন করিতেছে।"

অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে বর্জ্জন-নীতি সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের পর ইহা পরিত্যাগ করা অভিপ্রেত ছিল। বাঙ্গালা দেশের দারুণ অভিযোগটীর প্রতি বিলাতের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উক্ত আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেইজন্য অভিযোগের কারণ অনেকাংশে নিবারিত হইলে বর্জ্জন আন্দোলন ও বন্ধ হয়।

বর্জ্জন আন্দোলনের আতিশয্য সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু ইহাও সত্য যে সমস্ত নিয়মানুগ আন্দোলন এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা-দুষ্ট কারণ আতিশয্য মানবস্বভাবের স্বভাবজাত দোষ। প্রত্যেক ব্যাপারে—এমন কি মহৎ ব্যাপারেও—চরম ও নরমপন্থী দেখা যায়।

কিন্তু চরমপন্থার ওজরে নিয়মানুগত আন্দোলন বন্ধ থাকিতে পারে না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে মানবইতিহাসের কয়েকটী শ্রেষ্ঠ অধ্যায় অলিখিত থাকিত এবং জাতির মুক্তিকামনার সহিত স্বার্থত্যাগের ও স্বদেশপ্রেমের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জড়িত আছে তাহাও আমরা পাইতাম না।

বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের উপর বর্জ্জন আন্দোলনের ভার দেওয়া হয়, কারণ তাঁহার সংযম ও স্বদেশপ্রেমের জন্য বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। সে সময় তিনি যশঃ ও প্রতিপত্তির উচ্চতমশিখরে আরূঢ় ছিলেন। ভারতীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরারের' তিনি সম্পাদক ছিলেন। সাহস ও নিষ্ঠার সহিত তিনি বহুকাল স্বদেশের মুক্তিকামনায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সংযত ও ধীর চরিত্রের জন্য তিনি ভারতের মুক্তি বিরোধী ব্যক্তিগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। শেষপর্য্যন্ত তিনি দেশবাসীর এই প্রীতি আকর্ষণ-করিতে পারিলেই সুখের হইত। কিন্তু হায়! তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায়গুলি অন্যরূপ। বাঙ্গলাদেশের বিপ্লবাত্মক অনুষ্ঠানগুলি তাঁহার ভাবপ্রবণ মনে এরূপ বিশেষভাবে আঘাত দেয় যে স্বাধীন সংবাদপত্রের বীর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ কেবল সরকারকে সমর্থন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই পরন্তু একখানি বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষে বর্জ্জন আন্দোলন পূর্ব্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং সেইজন্য এই নির্ভীক কল্পনা প্রথমে অনেকের মনে হাস্য উদ্রেক করে। কিন্তু শীঘ্রই ইহার সাফল্য প্রমাণ করিয়াছিল যে এই আন্দোলনের পিছনে জনসাধারণের সম্পূর্ণ শুভেচ্ছা বর্ত্তমান। ইহার এতদূর সাফল্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণও আশা করেন নাই। কিন্তু বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় এই নূতন অভিজ্ঞতা হইতে গ্রহণীয় শিক্ষা বাছিয়া লইতে

পারিলেন না কারণ কোনও নূতন ব্যাপারেই তাঁহারা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারিতেন না। ফলে এই হইল যে জনসাধারণের ভাবাবেগে তাঁহারা সংযম হারাইয়া রুষ্ট হইয়া উঠিলেন এবং যেখানে কৌশলে তুষ্ট করিবার যথেষ্ট উপায় ছিল সেইখানেই দমননীতির আশ্রয় লইয়া অশান্তির তীব্রতা বৃদ্ধি করিলেন মাত্র।

এই আন্দোলন ছাত্র-সমাজকে এত গভীরভাবে বিচলিত করে যে ভাবোচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে তাহারা আতিশয্য প্রদর্শন করিত। জাতির হৃদয় যখন কোন মহৎ ভাবদ্বারা আলোড়িত হয় তখন নমনীয় তরুণ মনেই ইহার পূর্ণ মুদ্রাঙ্ক পড়ে। নূতন আন্দোলনের প্রচারকগণ সর্ব্বকালে ও সর্ব্বযুগে তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাদের বাণী প্রথম প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারক সেইজন্যই বলিয়াছিলেন "তরুণদের আমার নিকট আসিতে দাও"। গ্রীস, ইটালি আমেরিকা, জার্ম্মণী—সমগ্র বিশ্বের যে কোনও স্থানে যখনই কোনও নূতন আশার বাণী প্রেরিত হইয়াছে তখনই তরুণ সম্প্রদায় সেই আহ্বানে প্রথম সাড়া দিয়াছে।

এই বিরাট জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করিতে আমি যুবকবৃন্দকে আবেদন করি। আদালত অবমাননার মামলায় আমি যখন কারারুদ্ধ হই তখন তাহারা কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম এবং সেইজন্য আমি অনুভব করিয়াছিলাম যে তাহারা এরূপ দৃঢ় একটী জনমত গঠন করিতে সক্ষম হইবে যাহা ব্যতিরেকে সাফল্যলাভ সুকঠিন। যখনই তাহাদের নিকট জনসভায় বক্তৃতা দিতাম তখনই তাহাদের সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতাম এবং রাজনৈতিক কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণেই এরূপ সম্ভব হইয়াছিল। যদিও বঙ্গবিচ্ছেদ তাহাদের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল তথাপি স্বদেশী আন্দোলন প্রসারের জন্যই তাহারা অধিক ব্যগ্র ছিল। *

যদিও আমি আমার জীবদ্দশায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রত্যক্ষ করি নাই কিংবা

* এই অধ্যায়ের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখুন।

মানসচক্ষে ইহার রূপ কল্পনা করিতে পারি না তথাপি ইহার পূর্ব্বগামী উন্মাদনা ও জনমতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের অর্থ এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তখন এক আশ্চর্য্য আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তরুণ ও বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাতে আকৃষ্ট এবং ইহার অদৃশ্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত বোধ করিয়াছিল। যুক্তি ও বিচার স্তব্ধ হইয়া তীব্র ভাবাবেগের নিকট মাথা নত করিয়াছিল কারণ সমগ্র জাতির হৃদয় তখন এই ভাবাবেগে চালিত হইতেছিল। একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আমাকে বলিয়াছিলেন যে সেই সময়ে তাঁহার চিকিৎসাধীন একটী বালিকা প্রলাপের ঘোরে বিদেশী ঔষধ গ্রহণ করিবে না বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।

কেন প্রত্যেকে এরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল? প্রত্যক্ষ ও বাহ্য কারণগুলির দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে ইতিহাসের দূরদর্শী ছাত্রের নিকট রহস্য বলিয়া কিছু নাই। বঙ্গবিচ্ছেদ রদ করিবার প্রয়াসে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহা হইতে স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি নয়। বাঙ্গালা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে যে জাতীয় জাগরণ প্রকাশ পায় যুগপৎ তাহারই সহিত স্বদেশী-ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল। মানব মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত নয় পরন্তু ইহা এক জীবন্ত রচনা এবং সেইজন্যই যখন কোন নূতন ভাব অনুভূত হয় তখন তাহা সমগ্র দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং মানবের কার্য্যাবলির প্রত্যেক বিষয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভারতীয় স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয় এমন একদল সমালোচক কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথমাবধি বলিয়া আসিতেছেন যে রাজনৈতিক সংস্কার অপেক্ষা সামাজিক সমস্যাগুলির মীমাংসা সাধন অধিকতর প্রয়োজনীয়, কারণ তাঁহাদের মতে সুদৃঢ় সামাজিক জীবনের পর রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা অধিকতর ফলপ্রসূ। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তন উক্ত বাক্যের ব্যর্থতা প্রমাণ করিয়াছে কারণ জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে

সামাজিক, শিল্পসম্বন্ধীয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই নবচেতনার সঞ্চার হইয়াছে। ইহাদ্বারা পুনরায় এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইল যে সকল প্রকার সংস্কার পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও সংশ্লিষ্ট এবং একে অন্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কারগুলি কেশবচন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের কার্য্যাবলি কৃষ্টদাস পাল প্রমুখ সংস্কারকগণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার পর যে নূতন নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব হয় তাঁহারা পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসরণকরতঃ পুরাতন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় এমন কি জনসাধারণের মনে নবচেতনার সঞ্চার করিতে সমর্থ হন। নূতন আদর্শ ও নূতন পদ্ধতিগুলি সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করে এবং তাহার ফলে জাতীয় জীবনের যে জাগরণ হয় তাহারই প্রকাশ দেখা যায় বিভিন্ন কর্ম্মধারায়।

ইহার অবশ্যম্ভাবী আনুসঙ্গিকরূপে শিল্পাদি সম্বন্ধীয় ব্যাপারেও এক নূতন ভাব দেখা যায় এবং দেশের বহু কৃতী সন্তান স্বদেশজাত শিল্পোন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহারই এক ভ্রাতা স্যার আশুতোষ চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীব ও বিখ্যাত আইনবিষয়ক পত্রিকা কলিকাতা উইক্‌লি নোট্‌সের (Calcutta Weekly Notes) প্রতিষ্ঠাতা রূপে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যশস্বী হইলেও তিনি কেবল আইনব্যবসায়ী ছিলেন না পরন্তু স্বদেশী শিল্পের উন্নতিবিধান তাঁহার জীবনের এক প্রধান আকর্ষণ ছিল। তিনিই প্রথম ১৮৯৬ * খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভার একটী অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শণী আরম্ভ করেন এবং পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরিচালনায় আরও বৃহৎ পরিমানে সুসজ্জিত এক প্রদর্শণী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

---

* এবিষয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখুন।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে যে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্বেই স্বদেশী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল এবং দেশের রাজনৈতিক মুক্তি কামনার সহিত শিল্পোন্নতির চেষ্টা গ্রথিত হইয়াছিল। অবাধ-বানিজ্যের বিরোধই স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এবং জনসাধারণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার উপর ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিলাতী সংবাদপত্রগুলি সমস্ত ব্যাপারটীকে একটী বিরাট ভুল ও ক্ষণস্থায়ী ভাবাবেগ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের স্থায়িত্ব এবং বঙ্গ-ভঙ্গের ছয় বৎসর ইহার কার্য্যকারিতা সকল বিদেশী দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। বৎসরের পর বৎসর বিদেশী দ্রব্য সস্তায় পাইয়াও যখন দরিদ্র বাঙ্গালার অধিবাসীগন অধিক মূল্য দিয়া স্বদেশী দ্রব্য কিনিতে লাগিল তখন স্বার্থত্যাগ ও দেশ-প্রেমের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাহারা স্থাপন করিয়াছিল তাহা সত্যই অতুলনীয়।

তীব্র আবেগ শীঘ্রই সীমা লঙ্ঘন করিয়া জীবনের বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয় এবং ক্রমেই ইহা সামাজিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। স্বদেশিকতাও প্রথম প্রথম আমাদের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রত্যেক স্তরে যে ছাপ ফেলিয়াছিল তাহা ভুলিবার নয়। বিবাহে যদি কোন বিদেশী দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠান হইত তাহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ আসিত যদি অনুরূপ দ্রব্য দেশে মিলিত। এমন কি পুরোহিত-গণ দেবতার উদ্দেশে কোন বিদেশীদ্রব্য দেওয়া হইলে পৌরহিত্য করিতে অস্বীকার করিতেন। বিলাতি লবণ অথবা বিলাতি চিনি ব্যবহৃত হইলে নিমন্ত্রিতগণ উৎসব হইতে চলিয়া যাইতেন। এরূপ অবস্থায় কেহ বিলাতি ধুতি অথবা শাড়ি কিনিবার কথা ভাবিতেই পারিতেন না; যদি কেহ সস্তার জন্য কিনিতেন তাহা হইলে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কিনিতে হইত।

উনবিংশ অধ্যায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রদের সহায়তা।

স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ দেশব্যাপী করবার জন্য আমরা ছাত্র সম্প্রদায়ের সহায়তা গ্রহণ করা স্থির করলাম। এ বিষয়ে কতকটা ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। আমি ছাত্রাবাস ও 'হোষ্টেলে গিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের স্বার্থকতা ও বঙ্গ-ভঙ্গে যে দেশের কি অনিষ্ট হবে বুঝাইতাম। বাহিরে যে যুক্তি ও কারণ দেখান হউক না কেন, ভিতরের কথা হচ্ছে, বঙ্গ-ভঙ্গের যথার্থ উদ্দেশ্য ছিল শুধু বাঙ্গালীজাতির ভারতবাসীর উপর প্রভাব নষ্ট করা নয়, রাষ্ট্রগুরু যে ভারত সন্তানকে জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবারজন্য গত ৩০ বৎসরের অধিক প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই চেষ্টা ব্যর্থ করা। বাঙ্গালাভাষাও জগতের প্রসিদ্ধ ভাষাগুলির মধ্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহাও নষ্ট করা ইহার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। যাহা হউক, বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব যে শুধু বাঙ্গালার পক্ষে নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল সাধন করিবে এই ধারণা আবাল-বৃদ্ধের মনে বদ্ধমূল হইতে বিলম্ব হয় নাই। ছেলেদের ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্যগুলির ব্যাঘাত না জন্মে তাহাদের দ্বারায় আমাদের আন্দোলনের সহায়তা যা করে পেতে পারি তাই লওয়া স্থির করলাম। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে জাতীয় সঙ্গীত শিখিয়ে রবিবার প্রাতে মিছিল বাহির করতাম। এই প্রভাত ফেরীতে সাধারণের মন জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হত। তালে তালে পা ফেলে যখন শতাধিক কণ্ঠে একসঙ্গে গাইত 'বিদেশী পণ্যে করি পদাঘাত' তখন রাজপথ ও তদুপরি অট্টালিকা পর্য্যন্ত বিকম্পিত হয়ে উঠ্‌ত। ছেলেরা আবার নিজেরাই দলবদ্ধ হয়ে বড়বাজারে ও অন্যান্য যে সব স্থানে বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় হত, সেখানে ঘাঁটি দিয়ে ক্রেতাদের স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন করতে অনুরোধ করত্। তাদের প্রতি আমাদের আদেশ ছিল যে কার ও উপরে বল প্রয়োগ করবে না। সে আদেশ তাহারা পালন করলেও অনেক সময় পুলিসের দ্বারা তাদের ধর্‌পাকড় করা হত। তাদের ছাড়িয়ে নেবার ও যাতে সাজা না হয় তার জন্য অনেক উকিল, এটর্ণি ও ব্যারিষ্টার আমাদের সহায়তা করতেন।

তার মধ্যে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা ইচ্ছা করলে ছেলেদের কলেজ, স্কুল ছাড়াতে পারতাম; কিন্তু তারা পড়াশুনা যাতে না ছাড়ে সে বিষয়ে আমাদের সবিশেষ চেষ্টা থাকত। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হয়েছিল "গোলামখানা," কিন্তু সেখানে পড়েও যে স্বাধীনচেতা হওয়া যায় তাদের তা' বুঝাতাম। জাতীয় শিক্ষার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের সব যুবকমণ্ডলীর শিক্ষার ভার নিতে যে আমরা সক্ষম নই তা' তাদের বুঝিয়ে দিতাম; আর, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের অর্থেই নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং কলেজ স্কুল ছাড়া, কি পরীক্ষা না দেওয়ায় দেশের কোন মঙ্গল সাধিত হতে পারে না বুঝাইতাম।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের মনে স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসলতা বদ্ধমূল করা ও তাদের চরিত্রগঠন করে যাতে তারা মানুষ হয়ে দেশের কর্ত্তব্যসাধন করতে পারে। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে কাজ করান ও দেশ-নেতাদের আদেশ পালন করতে শিক্ষা দেওয়া। নিয়মানুবর্ত্তিতা (Discipline) ব্যতীত কোন জাতি মহৎ কার্য্য সাধন করতে পারে না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমরা অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিলাম।

বিংশ অধ্যায়।

স্বদেশানুরাগ এবং বন্দেমাতরম্‌।

আধুনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি স্বদেশী আন্দোলনের যুগের অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন সন্দেহ নাই এবং সমস্ত সংবাদপত্র অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষপাতী। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে স্বদেশী আন্দোলন আমাদের গৃহে ও পারিবারিক জীবনে যে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহার তুলনায় অসহযোগ কিছুই করে নাই। স্বদেশী প্রচেষ্টা যেরূপ সামাজিক ব্যাপারের অন্যতম বলিরা গণ্য হইয়াছিল, অসহযোগ কোথায় সেরূপ হয় মাই। শিল্পোদ্যম রাজনৈতিক বাদানুবাদের সহিত গ্রথিত হইয়া সাময়িক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে কিন্তু অবশেষে ইহা তাহার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে প্রত্যেক শিল্পই ব্যবসায় মাত্র এবং ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারাই শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব। মূলধন, ব্যবস্থা এবং অভিজ্ঞতা—এই তিনটী শিল্পোদ্যমের প্রধান আবশ্যক। স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস এই প্রচেষ্টাকে সাময়িক ভাবে সাহায্য করিলেও সাধারণ অবস্থার অভ্যুদয়ে এই উচ্ছ্বাস আর কার্য্যকরী থাকে না।

অনেকে বলেন যে আমাদের গণ-আন্দোলনগুলি অন্তঃসারশূন্য ও নির্ব্বীর্য্য, কারণ আমরা গণসমর্থন লাভের চেষ্টা করি না। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে জনসাধারণের বিশেষ স্বার্থ জড়িত না থাকিলে তাঁহারা কোন আন্দোলনে সম্যক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় না। দেশের নেতৃবৃন্দই প্রত্যেক আন্দোলনের উদ্ভাবক ও চালক এবং জনসাধারণ সহানুভূতি দ্বারা নৈতিক সমর্থন প্রদান করেন। বিশেষ কোন ঘটনার সমাবেশে যখন তাহাদের অন্তরের অনুভূতি উদ্দীপ্ত হয় এবং বর্ত্তমান বা বিগত অত্যাচারের স্মৃতি যখন তাহাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে তখনই কেবল তাহারা প্রতিবাদে এত মুখর হইয়া উঠে যে সময়ে

সময়ে তাহারা সীমা ছাড়াইয়া যাইতে চায়। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তাহারা স্বীয় স্বার্থের অনুসন্ধান পায় এবং তাহারা বুঝিতে পারে যে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে তাহাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনিবার্য্য।

প্রথম হইতেই আমার রাজনৈতিক জীবনে তিনটী আদর্শ ছিল, যথা:— (১) স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতিগণকে একত্রিতকরণ (২) হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপন এবং (৩) জনসাধারণের উন্নতি বিধানকরতঃ প্রত্যেক আন্দোলনের সহিত তাহাদের সংযোগ স্থাপন। প্রথম দুইটী আদর্শের জন্য আমি ১৮৭৬ এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করি এবং বহু সভায় ভারতীয় একতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। আমার একটী আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ এই স্বদেশী আন্দোলন আনিয়াছিল বলিয়া আমি মনে প্রাণে ইহা গ্রহণ করি।

প্রদেশের সর্ব্বত্র এমনকি বাহিরেও স্বদেশী সভায় সাধ্যমত যাইতাম। অসাধারণ উত্তেজনা ও কঠোর পরিশ্রমের ঐ সময়ে কেহ যথাসাধ্য কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সময়ে সময়ে আমরা অজানা দুর্গম স্থানে গিয়া পড়িতাম বলিয়া বিচিত্র খাদ্য গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু আমরা কোন অসুবিধাই গ্রাহ্য করিতাম না, এমন কি ম্যালেরিয়া, কলেরার ভয় আমাদের টলাইতে পারিত না। আমাদের উৎসাহই রক্ষাকবচের কাজ করিত।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পরলোকগত সহকারী ও হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। ভগ্নস্বাস্থ্য ও রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তিনি প্রত্যেক স্বদেশী সভায় উপস্থিত হইতেন। ঐ সমস্ত সভায় তিনি এক নূতনত্ব আনয়ন করেন। যদিও তিনি নিজে গান গাহিতে পারিতেন না, সঙ্গীতে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল এবং তিনি সুন্দর গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত গানগুলি স্বদেশী সভায় এক গভীর প্রভাব

সৃষ্টি করিত। সঙ্গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং সামান্য হিন্দী জানিলেও তাঁহার হিন্দী গান 'দেশ কি এ কেয়া হালৎ' তখনকার দিনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার তিরোভাবে একজন বিরাট কর্ম্মীর অভাব হইলেও স্বদেশী আন্দোলন থামে নাই, কারণ সমস্ত মহৎ আন্দোলনই প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের নিকট ঋণী হইলেও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না।

জনসাধারণের বিক্ষোভে সরকার ভীত হইয়া পরিচিত দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাহার ফলে বিক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল মাত্র। ট্যাসিটস্ (Tacitus) লিখিয়াছেন যে এগ্রিকোলা (Agricola) এক সময়ে বলিয়াছিলেন য়ে রাজ্য শাসন অপেক্ষা গৃহশাসন অধিক শক্ত। সংসারে অশান্তির উদ্ভব হইলে সময়ে শুভবুদ্ধির উদয় হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে কিন্তু অখণ্ড প্রতাপের মোহে সরকার শীঘ্র বিক্ষোভ দমন করিতে গিয়া যে অদূরদর্শী নীতির আশ্রয় নেন তাহা পরিণামে শুভ নয়। সাময়িক সাফল্য লাভ করিলেও পরিণামে এই নীতি অশেষ অকল্যান সাধন করে।

ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায় স্বদেশী আন্দোলনে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের উৎসাহ সমগ্র সমাজকে এরূপ উৎসাহিত করিয়াছিল যে সরকার তাহাদের দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষগণের নিকট এই মর্ম্মে পত্র প্রেরণ করেন যে তাঁহারা যদি ছাত্রগণকে স্বদেশী আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করিতে বাধা না দেন, তাহা হইলে সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহাদের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে বলা হইবে।

উক্ত ঘোষণা দ্বারা বিক্ষোভের বৃদ্ধি হয় এবং সকলেই একবাক্যে ইহার নিন্দা করে, এমন কি ষ্টেটস্ম্যান্ পত্রিকাও এইরূপ ঘোষনার বিরোধী হন। কিন্তু শাসনবিভাগ কাহারও উপদেশে কর্ণপাত না

করিয়া ঘোষণার পর ঘোষণা করিতে থাকেন। ইহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 'বন্দেমাতরম' সংক্রান্ত ঘোষণাটী ইহাদের অন্যতম। পূর্ব্ববঙ্গের নবগঠিত শাসন বিভাগ কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয় যে সাধারণের নিকট বন্দেমাতরম ধ্বনি করা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তখনকার দিনে এই নিষিদ্ধ ধ্বনি সমগ্র ভারতের জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়াছিল এবং শিক্ষিত ভারতীয় যখনই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিলিত হইত তখন প্রত্যেকের মুখেই এই ধ্বনি শোনা যাইত।

বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটী মণীষী বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দ-মঠে' আছে। বাঙ্গালা গান হইলেও ইহা এত সংস্কৃতবহুল যে ভারতের যে কোন স্থানের শিক্ষিত ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে। ইহার সুন্দর শব্দবিন্যাস, মধুর ছন্দঃ এবং সর্ব্বোপরি গভীর স্বদেশানুরাগ ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে এবং জাতীয় জীবনে এই সঙ্গীতটী যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বঙ্কিমচন্দ্রও সঙ্গীতটী রচনার সময় ধারণা করিতে পারেন নাই। ইতালীর একতা-সূচক বিখ্যাত সঙ্গীতটী যখন দান্তে রচনা করিয়াছিলেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে ম্যাজিনি এবং গ্যারিবল্ডি ঐ সঙ্গীতটীকে কিভাবে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিবেন। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির্গণ আদর্শ ছড়াইয়া যান ; উত্তম জমিতে পড়িলে কালে তাহারাই বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎবংশীয়গণের অশেষ কল্যাণসাধন করে।

একবিংশ অধ্যায়।

স্বদেশী আন্দোলন আমাদের সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও শিল্প-সম্বন্ধীয় জীবনে এক নবচেতনা আনিয়াছিল এবং এই জাতীয় নবচেতনার পূর্ণপ্রভাব সাহিত্যে বিশেষতঃ সংবাদপত্রগুলির উপর পড়িয়াছিল। সভা-সমিতিতে তখনকার দিনে যে সকল বক্তৃতা বাঙ্গালায় প্রদত্ত হইত সেগুলি রক্ষিত হইলে বাঙ্গালাভাষার গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী অসহযোগ আন্দোলনে এরূপ ভাব বাঙ্গালা দেশে দেখা যায় নাই। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অন্তরে সে ভাবের প্লাবন বহে নাই যাহা দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক জীবনে উন্নতির প্রয়াস বৃদ্ধি পায় ও মানবকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে কিংবা বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য ও সংবাদ পত্রগুলিতেও সেরূপ বিরাট উদ্দীপনা দেখা যায় নাই যাহাতে জাতীয় জীবন মহত্তর লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। আমার মনে হয় এই অসহযোগ আন্দোলন জাতিকে মানুষের বৃহত্তর স্বার্থ হইতে সংশ্লিষ্ট রাখিবার প্রয়াস। জগতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জাতি হিসাবে আমরা যদি বাঁচিতে চাই, তাহা আমার মতে অসম্ভব, কারণ তাহাতে জাতির বৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের শিল্প বিভাগ এক অপূর্ব্ব প্রেরণা পায়। একটীর পর একটী করিয়া সাবান, দিয়াশলাই এবং কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। বয়ন শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। ম্যানচেষ্টার বাঙ্গালার তন্তুবায়শ্রেণীর অন্ন অপহরণ করিয়াছিল এক্ষণে সেই নষ্টপ্রায় তাঁতশিল্পের প্রাণ সঞ্চার করা হইল। আমি যখন হুগলি জিলার অন্তর্গত হরিপালে এক স্বদেশী সভায় যাই তখন সেখানকার তাঁতিরা দলে দলে আসিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া-গিয়াছিল। দেশের সর্ব্বত্র এক অপূর্ব্ব উৎসাহ লক্ষিত হয় কিন্তু অনেক

ক্ষেত্রেই সুব্যবস্থা ও পারদর্শিতার অভাবে মূলধন যথেষ্ট থাকিলেও সাফল্য সম্ভব হয় নাই এবং এই সমস্ত অসাফল্য স্বদেশীবোধকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।

দুঃখের বিষয় ভারত সরকার এই আন্দোলনকে সাহায্য করিবার সুযোগটী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে যদি গভর্ণমেণ্ট শিল্প আন্দোলনকে সাহায্য করিতেন তাহা হইলে রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা কমিয়া যাইত এবং দেশের শিল্পসমস্যা প্রভূত পরিমাণে মিটিয়া যাইত। কিন্তু সরকার সেরূপ কিছুই করিলেন না পরন্তু দমননীতির দ্বারা চতুর্দ্দিকে অশান্তির বীজ বপন করিতে লাগিলেন যাহা উত্তরকালে তরুণদের বিক্ষুব্ধ করিয়া অশুভ সন্ত্রাসবাদ আনয়ন করিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু দমননীতি স্বদেশী আন্দোলনকে নষ্ট করিতে পারে নাই। আমাদের ধুতি ও শাড়ির জন্য ম্যান্‌চেষ্টার অথবা অন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী যাহাতে না থাকিতে হয় তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বোম্বাই তখন দেশের বস্ত্র অংশতঃ যোগাইতেছিল। বাঙ্গালা দেশ যাহাতে নিজের বস্ত্র কিয়দংশ যোগাইতে পারে তাহার চেষ্টা আমরা করিতে লাগিলাম। কিছুকাল যাবৎ শ্রীরামপুরে একটী কাপড়ের কল চলিতেছিল। আমরা সেই কলটী কিনিয়া ইহার কার্য্য বাড়াইতে মনস্থ করিলাম কিন্তু তাহাতে ১৮লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। আমরা একটী আবেদন প্রচার করিলাম এবং তাহার ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায়। তখন আমরা কলটী কিনিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিতে তৎপর হই। বাঙ্গালার পুরনারীরা এই জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন বলিয়া কলটীর নাম রাখা হইল 'বঙ্গলক্ষী মিল'। বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া কার্য্য করিয়া এবং আমাদের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা দান করতঃ এই কলটী এক্ষণে উন্নতির পথে চলিয়াছে।

ভারতীয় পরিচালনায় বিমা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রথম হয়। আমি একটী সভায় স্বদেশবাসীর দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করি এবং অনেকেই তখন আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। শীঘ্রই দেশে কয়েকটী বিমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে National এবং Hindusthan Co-operative Insurance Companies দুইটীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭ই আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলনের উদ্বোধন এবং সেই দিনেই বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। আজ ইহা এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার যুবকবৃন্দ যখন শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে কলেজ স্কোয়ার হইতে টাউনহল পর্য্যন্ত শান্তভাবে শোভাযাত্রা* করিয়া যাইতেছিলেন তখন দেশীয় সমস্ত দোকানগুলি বন্ধ হইয়া যায় এবং সহরের যে অংশে ভারতীয়গণ বাস করেন সেই অংশ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু টাউন হলের নিকট বিরাট জনতা সমাগম হইয়াছিল। আমরা টাউন হলের একতলায় ও দুতলায় দুইটী সভা এবং ময়দানে একটী সভা করিতে মনস্থ করিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিলে জনতা শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংযতভাবে তিনটী সভায় বিভক্ত হইয়া যায়।

আমি তিনটী সভাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলাম। নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে জনসাধারণের স্বদেশীবোধ ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যাইবে। টাউনহলের উপরতলা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রদ্বারা সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা হয় এবং Whiteaway Laidlaw & Co. কর্ত্তৃক উক্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হয় কিন্তু সভানুষ্ঠানের দিন প্রাতঃকালে হালিম গজনবি (Mr. Halim Ghaznavi) আমার নিকট আসিয়া বলেন যে বিলাতি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রগুলি না সরাইলে গোলমাল হইবার আশঙ্কা আছে। জনমত অগ্রাহ্য করিতে

* এই অধ্যায়ের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখুন।

আমরা সাহসী হই নাই এবং শীঘ্র পরামর্শ করিয়া একঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বিলাতি বস্ত্রগুলি সরাইয়া ফেলা হয়। *

এইরূপে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহার সাফল্য জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া জাতীয় উদ্দীপনা প্রবুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বঙ্গবিচ্ছেদ জনসাধারণের মনে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং অবিভক্ত ও একতাবদ্ধ বাঙ্গালাদেশ সমস্বরে ইহার প্রতিবাদ করে। দুইটী আন্দোলনই একসঙ্গে চলিতে থাকে এবং একটী আর একটীকে প্রভাবান্বিত করে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ম্যানচেষ্টার জাত দ্রব্যাদির আমদানী মন্দীভূত হওয়ায় মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ীগণ ভীত হইয়া উঠে এবং সংগৃহীত বস্ত্র যাহাতে সহজে বিক্রয় করিতে পারে তাহার জন্য আমাদের নিকট প্রস্তাব করে। আমরা তাহাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিলাম যদি তাহারা পুনরায় বিলাতি বস্ত্র আমদানি না করিবার সঙ্কল্প করিত। বহু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই।

* আমার যতদূর স্মরণ হয় হালিম গজনভি সাহেব (এখন Sir Halim Gaznavi) যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বঙ্গ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে ছিলেন ও স্বদেশী আন্দোলন সমর্থন করিতেন তিনি Hall and Anderson কোম্পানীকে (Whiteaway Laidlaw নহে) কাল ক্রেপ (crape) দিয়া বাঙ্গালার শোক নিদর্শন স্বরূপ হল সজ্জিত করিতে বলেন। কিন্তু সাধারণে বিলাতী বস্ত্র ব্যবহারে আপত্তি করিতে পারে বলিয়া তিনি সেগুলি রাষ্ট্রগুরুর পরামর্শমত অপসারিত করিতে আদেশ দেন।—সম্পাদক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

কলেজ স্কোয়ার হইতে টাউন হল পর্য্যন্ত যুবকদের শোভাযাত্রা।

যখন বঙ্গ-ভঙ্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন সভাসমিতির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হল তখন স্থির হয় যে কলিকাতা টাউনহলে একটি বিরাট মহাসভা আহূত হবে যাহাতে বাঙ্গালার সব জেলা ও মহকুমা থেকে প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে এ সম্বন্ধে জনমত উপেক্ষার প্রতিবাদ করেন ও এই মহা অনিষ্টের প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। ছেলের দল যেমন তেমন করে সভাস্থানে গেলে গোলযোগ হতে পারে বলে তাদের সব এক রকম পরিচ্ছদ পরে দলবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। স্থির হল একটি কাল জামা, যার কাল জামা নাই তার সাদা জামা কাল কি জাম রঙে ডুবিয়ে ও মাথায় বাসন্তি রংয়ের উষ্ণীষ পরে গোলদীঘিতে সমবেত হয়ে সারি বেঁধে তারা যাত্রা করবে। এরূপ মিছিল বাহির করতে আমরা পুলিশের কোন অনুমতি প্রার্থনা করা আবশ্যক মনে করি নাই। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হালিডে সাহেব মিছিল বেরবে খবর পেয়ে আমাকে লিখে পাঠান যেন ছেলেদের আমি তিনজন করে সারিতে রেখে রাস্তার বাম ফুট-পাথ দিয়ে টাউনহলে নিয়ে যাই। আমরা সেইমত সারিবন্দি করে গোলদীঘি থেকে বেরিয়ে কলেজষ্ট্রীট, বহুবাজার, ওল্ডকোর্টহাউস ষ্ট্রীট, লাটসাহেবের বাড়ী ঘুরে টাউনহলের সামনে খোলা মাঠে ক্রমে পৌছাই। (এখন সেখানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রাসাদ প্রস্তুত হয়েছে।) আসবার সময় ছেলেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে এমনভাবে এসেছিল যে পথের সব দর্শকবৃন্দ, স্বদেশী বা বিদেশী, সকলেই এই মিছিলের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। এমন কি সে সময় রুশো জাপানি যুদ্ধে জাপান জয়ী হওয়ায় অনেক বিদেশী সমালোচক বলেন যে দেখছি বাঙ্গালীরাও একদিন জাপানিদের মত একটি মহাজাতি হতে পারবে। ছেলেরা টাউনহলের সামনের মাঠে পৌঁছে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দলে দলে বড় বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল ও প্রতি দলের নায়ক গায়ক সহ গাছে চড়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে লাগিলেন ও নীচের দল সমস্বরে যথাসময় তাতে যোগদান করছিলেন। সেই দৃশ্য দেখবার জন্য মাঠের উত্তরে ভারত গভর্ণমেণ্টের দপ্তরের (Secretariat এর) দক্ষিণের বারান্দাগুলিতে ভীড় জমে গিয়েছিল ও এই আন্দোলনের প্রতি রাজকর্ম্মচারীদের ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল। তাঁহারা ছেলেদের মিছিলের

খুব তারিফ করেছিলেন। ছেলেরা কেউ গিয়ে টাউনহলে ভীড় করে নাই। টাউনহলের বিরাট সভা অতি শৃঙ্খলার সহিত সমাধা হবার পর রাষ্ট্রগুরু ও অন্য নেতারা টাউনহলের রাস্তার উপর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছেলেদের নিকটে সভার মন্তব্যগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তাদের সংযম ও সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। ছেলেরা তখন বিভিন্ন দল বেঁধে কলিকাতার বিভিন্ন-ভাগে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ফিরে গেল। এই মিছিল সম্বন্ধে সিস্টার নিবেদিতা আমায় বলেছিলেন, 'এইরূপ মিছিলের প্রভাব নবজাতি উদ্বোধনের পক্ষে সভা সমিতি অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।'

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অবধারিত বিষয়।

১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার দিন স্থির হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত জাতি সেইদিন শোকপ্রকাশ করিতে মনস্থ করে। মফঃস্বলের নেতাগণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক নিম্নোক্ত উপায়ে শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা হয়ঃ (১) রাখি-বন্ধন—বাঙ্গালার বিচ্ছিন্ন অংশদ্বয়ের সৌহার্দ্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব সূচক রক্তবর্ণ সূত্র পরস্পরের মণিবন্ধে বাঁধিয়া দিয়া আমরা প্রাচীন ভারতের অনুরূপ প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন করি; (২) ১৬ই অক্টোবর সমস্ত দেশ উপবাস করিবার সঙ্কল্প করে। কোন গৃহে চুল্লী না জ্বালাইয়া কেবল বৃদ্ধ ও রোগীদের জন্য কোনপ্রকারে খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত দোকান-পাট ও ব্যবসা বন্ধ থাকে এবং নাগরিকগণ অনাবৃত পদে প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতে থাকে। সমস্ত দেশ অন্তরের সহিত ইহা পালন করিয়াছিল।

ইহা ছাড়া ঐ দিন একটী গঠনমূলক কার্য্যের সূচনা হয়। আমি একটী 'ফেডারেসন্ হল্' (Federation Hall বা মিলন মন্দির) স্থাপনের প্রস্তাব করি। বঙ্গ-বিচ্ছেদ রহিত না হইলে উহাই বাঙ্গালার বিচ্ছিন্ন অংশদ্বয়ের অদৃশ্য ঐক্যের চিহ্নস্বরূপ হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। প্যারির হোটেল্ ডি ইনভেলিডস্ (Hotel des Invalides) নামক স্থানে নেপোলিয়ানের সমাধির চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ মাল্যশোভিত মর্ম্মরমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া এই ধারণা আমার মনে জাগে। সে সময় আল্সা (Alsace) এবং লোরেন্ (Lorraine) প্রদেশের প্রতিনিধিদ্বয় বস্ত্রাবৃত ছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার প্রতিমূর্ত্তি অনুরূপ ভাবে স্থাপন করিয়া বিচ্ছিন্ন জিলা-গুলিকে আবৃত রাখিবার কথা আমার মনে হইয়াছিল। তাছাড়া

ঐ মন্দির আমাদের বিচ্ছেদের কথা স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিয়া আমাদের ঐক্যলাভের চেষ্টাকে আরও সফল করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

উক্ত প্রস্তাবটী সযত্নে বিবেচিত হইয়াছিল এবং স্বর্গীয় স্যর তারকনাথ পালিত এবং ভারতবর্ষের কল্যানের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সেই মহীয়সী রমণী 'ভগিনী নিবেদিতা' কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা-দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিরাট এবং রাজোচিত দান স্যর তারক-নাথকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি বহুদিকে ছিল। দেশের জন্য তাহার হৃদয় যখন আলোড়িত হইত তখন তিনি রাজনীতিতে নামিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না পরন্তু বিজ্ঞ ব্যবহার-জীবের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং সহৃদয় বন্ধুর আন্তরিকতার দ্বারা আমাদের সাহায্য ও পরিচালনা করিতেন। বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেন এবং রোগাক্রান্ত হইয়াও যখনই পারিতেন তিনি তাঁহার সাহায্য ও পরিচালনার দ্বারা এই আন্দোলনকে পুষ্ট করেন।

'ফেডারেসন্ হল্' বা মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনই ১৬ই অক্টো-বরের আমাদের একমাত্র কর্ম্ম ছিল না। বঙ্গ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলন—এই দুইটী আন্দোলন একত্রে চালিত করিবার জন্য আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে তাঁতশিল্পের প্রসার কল্পে একটী জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন করা প্রয়োজন।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) তারিখে ঐরূপ আমাদের কার্য্যের তালিকা স্থির হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ম্মব্যস্ত থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও মানসিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের অভাব ছিল না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা মহানগরীর রাজপথ সকল বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। দলে দলে যুবক ও বৃদ্ধেরা গঙ্গাস্নান করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া

পড়িল এবং পথিকগণকে রাখি পরাইয়া দিতে দিতে চলিতে লাগিল। পথে সংকীর্ত্তন ও অন্য স্বদেশানুরাগসূচক গান গীত হইতে লাগিল। রাখী হস্তে দলে দলে নরনারী স্নানঘাটগুলিতে আসিয়া জমিতে লাগিল এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলের হস্তে রাখী বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

প্রত্যুষে বাহির হইয়া আমি বিডন্ স্কোয়ার, সেণ্ট্রাল্ কলেজ * এবং অন্যান্য স্থানে যাই। ঐ সকল জায়গা জনাকীর্ণ হইয়াছিল এবং আমি সর্ব্বত্রই বক্তৃতা করিয়াছিলাম। দলে দলে যুবকগণ আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল এবং তাহাদের দেওয়া লাল রাখীতে আমার বাহু আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। জীবনের ইহা এক স্মরণীয় দিন; কঠোর পরিশ্রম করিতে হইলেও মানব জীবনে এরূপ উদ্দীপনাময় দিন একবারই আসে।

অপরাহ্ন সাড়ে তিনটার সময় মিলন মন্দিরের (Federation Hall) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনজন্য সভা আহূত হইলেও বহু পূর্ব্ব হইতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার দর্শক উপস্থিত হইলেও এরূপ সুশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল যে সভায় একটীও পুলিশের দরকার হয় নাই যদিও বিভিন্ন থানায় পুলিস প্রস্তুত ছিল। †

সে দিনের সভায় প্রধান পুরোহিত ছিলেন আনন্দ মোহন বসু মহাশয়। বিভক্ত প্রদেশের অন্যতম জিলা ময়মনসিংহে তাঁহার আদিম নিবাস এবং সেইজন্য তিনি এই বঙ্গবিচ্ছেদ কেবল দেশের অকল্যান বলিয়া দেখিতেন না পরন্তু ইহাকে তিনি ব্যক্তিগত অনুযোগের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। তখন তিনি এক মারাত্মক ব্যাধির কবলিত হইলেও মানসিক শক্তি ও স্বদেশের মঙ্গল কামনা হারান নাই।

---

* এই কলেজটি অধ্যাপক খুদিরাম বসু মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, এখন ইহার অস্তিত্ব নাই।

† এ বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখুন।

আমরা তাঁহার চিকিৎসকগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা যখন মত দিলেন যে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে তিনি সভায় যোগদান করিতে পারেন তখন আমরা বঙ্গমাতার এই সুসন্তান কর্ত্তৃক উক্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইবে ভাবিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

রুগ্ন শয্যায় থাকিয়াও আনন্দমোহন যে সুন্দর বক্তৃতাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা মানসিক শক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিল। জীবনে যে সমস্ত অপূর্ব্ব বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য মানবের হয় তাহাদের অন্যতম ছিল আনন্দমোহনের ঐ দিনের বক্তৃতা। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার রচিত এই বক্তৃতাটী তাঁহার শেষ বাণী বলিয়া যেন আরও মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল। বক্তৃতাটী পাঠ করিবার ভার আমার উপর পড়ে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে যখন তাঁহাকে সভায় আনা হয় তখন সমস্ত দর্শকবৃন্দ দণ্ডায়মান হয়, তখন বোধ হয় যেন তাঁহারা পরলোক হইতে আগত অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন। ইহার পর দেশবাসী আর আনন্দমোহনের সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদ পান নাই—দিনের পর দিন তিনি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এই সংবাদই কেবল জনসাধারণ পাইয়াছিল।

সভাস্থল নিস্তব্ধ হইলে পর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালায় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা বঙ্গবিচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে উক্ত সভায় সভাপতি হইবার প্রস্তাব করেন। রাজনৈতিক সভায় স্যর গুরুদাসের উপস্থিতি এমন একটী অসাধারণ ঘটনা যে ইহা সরকারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বিচারক রাজনীতির বাহিরে এবং স্যর গুরুদাসের মত ছিল যে ভূতপূর্ব্ব বিচারকগণও রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারের বাহিরে থাকিবেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ জনমতকে তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই।

সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে আমি আনন্দমোহনের রচিত বক্তৃতাটী পাঠ করি। বিরাট জনসভাস্থ সকলেই আমার কথা শুনিতে পায়, কারণ পরে শুনিয়াছিলাম যে রাস্তার অপর পারে আনন্দমোহনের

বাটী হইতে আমার কথা স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। বাবা কুমার সিং (Baba Kumar Singh) নামক গুরু নানকের এক বংশধর শিখ পুরোহিত সভার প্রারম্ভে স্বস্তিবাচন করিয়াছিলেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ঠিক পূর্ব্বে স্যর আশুতোষ চৌধুরী নিম্নোক্ত ঘোষণাটী ইংরাজীতে পাঠ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালায় উহার অনুবাদ করিয়া শোনান :—

'যেহেতু বাঙ্গালী জাতির একান্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া সরকার বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন আমরা সেই জন্য আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমাদের মাতৃভূমিকে অখণ্ড এবং আমাদের জাতীয় একতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিব। শ্রীভগবান আমাদের সহায় হউন'।

'বেঙ্গলী' পত্রিকা আফিসে উপরোক্ত ঘোষণাটী স্থির করা হইলে পর আমরা সভার ঠিক পূর্ব্বে তথা হইতে সভাস্থলে আসিয়াছিলাম। বঙ্গ-বিচ্ছেদের অশুভ প্রভাব প্রতিহত করিবার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির জীবন্ত প্রতীকরূপে এই মিলন মন্দিরটীর (Federation Hall) পরিকল্পনা হয় এবং সেইজন্যই একটী অনুরূপ ঘোষণাবাণীর প্রয়োজনীয়তা ছিল।

আমরা ঐ মন্দির নির্ম্মাণকল্পে উক্ত জমি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে কিন্তু পরে দেখা গেল যে অনুরূপ মন্দির নির্ম্মাণের আবশ্যকতা নাই কারণ বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা সরকার পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গভাষাভাষী-গণকে একত্রিত থাকিবার সুবিধা দেন। সেইজন্য ঐরূপ স্মৃতিমন্দির অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হইয়াছিল।

অনুষ্ঠানটী শেষ হইলে আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তাঁহার স্বগৃহে লইয়া যাওয়া হয়। পরিশ্রম সত্ত্বেও তিনি ক্লান্তিবোধ করেন নাই কারণ তাঁহার অসীম মানসিক শক্তি তাঁহাকে কার্য্যক্ষম করিয়া রাখিয়াছিল। উহা ব্যতীত উপস্থিত ঐ বিরাট জনতার মধ্যে যে দেশপ্রেম ও দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাও তাঁহাকে বহুলাংশে উদ্দীপনা যোগাইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাঁহার

প্রিয়জনেরা তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেও যখন দেখিলেন ঐ বিরাট অনুষ্ঠানটী সুষ্ঠুরূপে তিনি সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন তখন তাঁহারা সকলেই গৌরব বোধ করিয়াছিল।

তারপর সেই জনতা নগ্নপদে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী রায় পশুপতি নাথ বসু মহাশয়ের বাটীর দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল যে তাঁহার প্রাসাদে জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইবে। পূর্ব্ব হইতে ঐ সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্যর আশুতোষ চৌধুরী, জে চৌধুরী, অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়রা এবং আমি রাস্তার উপর দিয়া নগ্নপদে সভার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যখন আমরা পৌঁছিলাম তখন সমস্ত সভাস্থল লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। এত অধিক জনসমাগম হইয়াছিল যে আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছিলাম না। চতুর্দ্দিক হইতে লোকে আমার পদধূলি লইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

সেইদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৭০০০০৲ সত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের সামান্য সামান্য দান হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হয়। গৃহশিল্প ও বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য এই অর্থ ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হয়। কিছু পরিমাণ অর্থ একটী বয়ন বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল কিন্তু বিদ্যালয়টী শেষ অবধি স্থায়ী হয় নাই। অবশিষ্ট অর্থ ট্রাষ্টীগণের তত্ত্বাবধানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে এবং ইহার সুদ হইতে গৃহশিল্প সমিতি (Home Industries Association) নামক প্রতিষ্ঠান মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের শিল্প শিক্ষার জন্য আর একটী বিদ্যালয়কেও ইহা হইতে সাহায্য করা হয়। *

১৯০৫ খৃঃ ১৬ই অক্টোবরের পরের মাসগুলি দেশের পক্ষে অত্যন্ত উত্তেজনাময় ছিল। সরকারের নীতি বিশেষতঃ স্যর বামফিল্ড ফুলারের (Sir Bampfylde Fuller) পূর্ব্ববঙ্গ সংক্রান্ত অনুসৃত

* সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখুন।

নীতি অবস্থাকে আরও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছিল। রহস্যের ছলে অথচ বাস্তবিকতার সহিত তিনি একদা বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দুই পত্নী বিদ্যমান—হিন্দু ও মুসলমান—এবং মুসলমানই তাঁহার প্রিয়পত্নী। যে শাসক এইরূপ অপ্রীতিকর রহস্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না তিনি তাঁহার দায়িত্বশীল পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ তাঁহার উক্ত রহস্য হইতে যে নীতির সন্ধান পাইলেন তাহাই তাঁহারাও অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এমন কি ইহার বিষময় প্রতিক্রিয়া বিচার বিভাগেও দেখা গিয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কুমিল্লা দাঙ্গা মামলার আসামীগণের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত করিবার সময় কলিকাতা হাইকোর্ট নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ—

"বিজ্ঞ বিচারক যে ভাবে সাক্ষীগণকে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ও এক শ্রেণীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ অপর শ্রেণী অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক তীব্র সমালোচনার যোগ্য।"

পূর্ব্ববঙ্গে অনুসৃত নীতি দ্বারা কেবল জাতিগত বৈষম্যই প্রকট হইতেছিল তাহা নহে, পরন্তু বঙ্গবিচ্ছেদের পর হইতে দমননীতি এরূপ ভাবে সরকার কর্ত্তৃক চালিত হইতেছিল যে অবস্থা তাহাতে আরও গুরুতর হইয়া উঠে। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি পথে ঘাটে নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং সাধারণ স্থানে সভা আহ্বান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। † শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণের মধ্যে সামরিক পুলিশ বসান হইয়াছিল এবং তাহারা হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর অত্যাচার করিতেছিল। মাননীয় নাগরিকগণকে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করা হয় এবং বরিশালের জননায়ক অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়কেও উক্তরূপে অপরাধী করা হইয়াছিল। উহা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে পুলিস যখন বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিগণকে মারপিট করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেয় তখন এই দমন নীতির চূড়ান্ত হয়।

† সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখুন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

রাখিবন্ধন দিবস — ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

("No Police-man was to be seen." A Nation In Making. P. 214)

৩০শে আশ্বিন পুলিশের অনুপস্থিতির কারণ।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরের বিরাট মিছিল ও মহাসভার সমস্ত কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তা ও জনসাধারণের সংযমই ইহার প্রধান কারণ। সেদিন যে ঐ অঞ্চলে একটিও পাহারাওয়ালা দেখিতে পাওয়া যায় নাই তাহার কারণ এখন বলা যাইতে পারে। সভার পূর্ব্বের দিনে কলিকাতার নানাস্থানে সভা সমিতি করে, পর দিনের ব্যবস্থা করে, সায়ংকালে যখন আমরা ঘরে ফিরি, তখন একটি ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে এসে সুরেন্দ্র বাবুর সহিত কোথায় দেখা হ'তে পারে জানিতে চাইলেন। সুরেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত অম্বিকা মজুমদার মহাশয় আমার বাটীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা খিদিরপুরে একটি সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন তখনও বাড়ীফেরেন নাই। সেই ভদ্রলোকটি বল্‌লেন যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারি কারলইল সাহেব দার্জ্জিলিং থেকে এসে কীড ষ্ট্রীটে পুলিশ কমিশনারের বাড়ীতে আছেন ও সুরেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা কর্‌তে চাহেন, আমি বারাকপুরে তাঁর বাড়ীতে পর্য্যন্ত খোঁজ করে এসেছি তাঁর দেখা পাই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আমি কি জান্‌তে পারি কি জন্য দেখা কর্‌তে চান। ভদ্রলোকটি বল্‌লেন কার্লাইল সাহেব জান্‌তে চান যে কাল কোন শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে কি না ও সে জন্য পুলিশের কোন ব্যবস্থা করতে হবে কি না। আমি বল্‌লাম যে আপনার আর অপেক্ষা কর্‌তে হবে না। তিনি ফির্‌লেই আহারান্তে তাঁকে কার্লাইল সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে বল্‌ব। সুরেন্দ্রবাবু ও অম্বিকাবাবু ফির্‌লে তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হ'ল যে পরের দিনের সভাসমিতি মিছিল প্রভৃতির কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার ভার আমরা নিতে সক্ষম, সুতরাং পুলিশের কোন তত্ত্বাবধানের আবশ্যক হবে না। আহারান্তে প্রায় রাত্রি ১০টার সময় সুরেন্দ্রবাবু কার্লাইল সাহেবের সঙ্গে দেখা

করে স্থির করে এলেন যে পুলিশ বা একটী পাহারাওয়ালাও সভাস্থলে বা সে অঞ্চলে থাকবে না। তবে পুলিশ কমিশনার যদি রিজার্ভ পুলিশ রাখ্‌তে চান, তা হ'লে নাতিদূরে সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানার ভিতর রাখ্‌তে পারেন, পথে ঘাটে কি সভাস্থলে রাখ্‌বার কোন আবশ্যকতা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেদিন বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, বেলঘরে, আগরপাড়া, সোদপুর, বারিপুর, বারাসত, বজবজ প্রভৃতি কলিকাতার চারি পাশের যে সব মিছিল নানাবিধ পতাকা উড়িয়ে স্বদেশী গান গাইতে গাইতে আসে তাহারা এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সার্কুলার রোডের উপর দাঁড়ায় ও এমনভাবে সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের সহায়তা করে যে সভার কার্য্য ও সর্ব্ব প্রকার অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। রাজপুরুষরাও দেখ্‌লেন যে এরূপ বিরাট সভা সমিতি ও জনবাহিনী তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত সুশৃঙ্খলরূপে আমরা পরিচালনা করতে পারি।

ন্যাসানাল ফণ্ড (National Fund).

১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাটীতে যে National Fund উঠেছিল সে টাকা কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে খরচ করা হয় নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রমুখনেতারা স্থির করেন যে এই অর্থ স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে। টেওটার জমিদার পার্ব্বতি শঙ্কর রায় মহাশয় যিনি ভারতীয় শিল্প সমিতির সম্পাদক রূপে এদেশে শিল্প উন্নতির আজীবন চেষ্টা করেন তাঁহার নেতৃত্বে সঙ্গীত সমাজের এই অর্থের দ্বারা একটী বস্ত্র বয়ন বিদ্যালয় খোলা হয়। সেখানে তাঁতিদের Fly-shuttle Loom (খট্‌ খটে তাঁত) দ্বারা কাপড় বোনা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, গালিচা ইত্যাদি বুনিবার তাঁত বসান ও বুনন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মতিলাল ঘোষ মহাশয় ঘরে ঘরে যাতে চরকার সুতা কাটার ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হন। এই বিদ্যালয়ে চরকায় সুতা কাটাও শিক্ষা দেওয়া হয়। গান্ধিজি যে এদেশে চরকায় সুতা কাটার পুনঃপ্রচলনের অগ্রণী তা ঠিক নয়। মতি বাবুকে এবিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। মতি বাবুর কল্পনা গান্ধিজি পরে কার্য্যে পরিণত করার সবিশেষ চেষ্টা করেন।

ন্যাশনাল ফাণ্ড (National Fund) এর টাকা রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র

কুমার মন্মথ নাথ মিত্রের নামে কোষাধ্যক্ষরূপে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে (Imperial Bank) কলিকাতায় জমা থাকে। বস্ত্র বয়ন বিদ্যালয়ের কার্য্যে কতক টাকা ব্যয় হইয়া যায়। পরে স্থির হয় একটি বিদ্যালয় না চালিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যা-লয়ে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হবে সেগুলিকে এই ফাণ্ডের উপস্বত্ব থেকে সাহায্য দেওয়া হবে।

কুমার মন্মথ নাথ মিত্রের মৃত্যুর পর রাজা প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর ঐ ফাণ্ডের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ঐ ফাণ্ডের কোম্পানীর কাগজ ও টাকা Imperial Bank-এ তাঁহার নামে জমা থাকে। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় বাৎসরিক ইহার হিসাব অডিট্‌ করাইয়া মুদ্রিত করিয়া কমিটির নিকট পেস করিতেন। রাজা প্রফুল্ল ঠাকুরের মৃত্যুর পর ঐ ফাণ্ডের ট্রাষ্টি নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ভারত সভার সম্পাদক অধ্যাপক নিবারণ চন্দ্র রায় মহাশয় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। নিবারণ বাবু অল্প দিন হল মারা গিয়েছেন। রাষ্ট্রগুরুর এই ফাণ্ড তোলায় সাহায্য ব্যতীত এই ফাণ্ডের সহিত বিশেষ কোন তাঁহার সংস্রব ছিল না। এই National Fund, Societies Registration Act অনুযায়ী National Fund Society নামে রেজিষ্টারি করা আছে। রাষ্ট্রগুরুর একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি কোন সাধারণের অর্থ (Fund) সম্বন্ধে নিজের দায়িত্ব রাখতেন না। সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত ট্রাষ্টীদের জেম্বায় তার যাতে কোন ক্ষতি বা অপব্যয় না হয় তার ব্যবস্থা করতেন। এই প্রসঙ্গে এটাও বলা যেতে পারে যে বঙ্গ ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে ১৯০৫ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত সদরে বা মফঃস্বলে কোন চাঁদার খাতা বাহির হয় নাই কারণ সকলেই স্বার্থত্যাগ করে দেশসেবা করিতেন।

ভারত সভার ন্যাসানাল ফাণ্ড।

রাষ্ট্রগুরু ভারত সভার প্রতিষ্ঠার পর তাহার পরিচালনার জন্ম একটি ন্যাসানাল ফাণ্ড উঠান, তাহাও ট্রাষ্টির জিম্বায় আছে। ভারত সভার ৬২ নং বহুবাজারের জমি ও বাটি বিজন গ্রামের মহারাজা সুরেন্দ্র নাথের নামে খরিদ করিয়া দেন, ঐ বাটীটিও সুরেন্দ্র নাথ ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নামে সমর্পণ করেন। পরে পুরাণ বাড়ী ভাঙ্গিয়া ভারত সভার ন্যাসানাল ফণ্ড হইতে কতকটা ঋণ লইয়া নূতন বাটী প্রস্তুত করা হয় সে ঋণও পরে পরিশোধ করা হয়। সেখানে সাধারণেরও সভা সমিতি হয়। ভারতসভার National

Fund এর উপস্বত্ব দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলনাদি ও সভারঅন্যান্য কার্য্য পরিচালিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্যস্থানে সাধারণের জনসভা করিবার নিষেধাজ্ঞা ও Passive Resistance অর্থাৎ "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" বা "অহিংস অসহযোগিতা"।

('A Nation in Making' পুস্তকের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের ২১৮ পৃষ্ঠার শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য)।

Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুধু যে বরিশালে বন্দেমাতরং উচ্চারণ বিরুদ্ধে ইস্তাহার সম্বন্ধে অনুষ্ঠানকরা হয় তাহা নহে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কালে পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্টের এইরূপ সব অবৈধ ইস্তাহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপে তাহা তৎপূর্ব্বেও অনুষ্ঠিত হয়। এই গভর্ণমেণ্টের একটি ইস্তাহারে Public place বা প্রকাশ্য স্থানে Public Meeting বা সাধারণের জনসভা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা দেন। প্রকাশ্যভাবে সাধারণের জনসভা করা সাধারণের ও ব্যক্তি মাত্রেরই একটি সঙ্গত অধিকার। আবশ্যক হইলে ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাশ করিয়া ইহা বন্ধ করা যেতে পারে কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহার দ্বারা সাধারণের এই সঙ্গত অধিকার হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা যায় না। সুতরাং রাজসাহি হইতে যখন সংবাদ আসিল যে এই ইস্তাহার অনুযায়ী সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে সাধারণের একটি সভা বন্ধ করিয়াছেন তখন কলিকাতায় আমরা স্থির করিলাম যে কলিকাতা হইতে আমরা গিয়া এই ইস্তাহারের বিরুদ্ধে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও স্বদেশী প্রচার সম্বন্ধে রাজসাহিতে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিব, দেখা যাক পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেণ্ট কি করেন। আমাদের যদি গ্রেপ্তার করেন তাহা হইলে এই ইস্তাহার আইনসঙ্গত কি অবৈধ তাহার আদালতে বিচার হইবে। আমি তখন বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও রাজসাহি বিভাগেরই প্রতিনিধি, সুতরাং আমি সেখানে গিয়া সভা আহ্বান করিব স্থির হইল। যে রাত্রে যাত্রা করিব সেইরাত্রে Mrs. P. K. Roy (অধ্যাপক প্রসন্ন কুমার রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর) বাটিতে আমার রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল, Mr. S. K. Radcliffe ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ও আরও কয়েকটি বিশিষ্ট ভদ্রলোকও

নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁহারা যখন জানিলেন যে আমি পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহারের বিরুদ্ধে সভা আহ্বান করিবার জন্য রাজসাহি যাত্রা করিতেছি তখন সকলেই আমার সম্বন্ধে সবিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ও নিরাপদে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিয়া বিদায় দিলেন। আমি কতকগুলি Anti-Circular Society-র স্বেচ্ছাসেবক ও আবদুল্লা প্রভৃতি স্বদেশী প্রচারক সঙ্গে করিয়া রাজসাহি পৌছিলে সেখানকার আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের আতিথ্য-গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাহাদের ধন্যবাদ দিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিলাম না। স্বেচ্ছাসেবক ও আবদুল্লার থাকিবার ব্যবস্থা তাহারা করিলেন। আমি তাহাদের বুঝাইলাম যে এই সভা আহ্বান করার দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের উপর লইব, আমি অন্য কাহাকেও ইহার জন্য দায়ী করিতে চাহি না, সুতরাং আমি ডাকবাঙ্গলায় গিয়া উঠিলাম। রাজসাহির নেতাদের বলিলাম যে বৈকালে প্রকাশ্য খোলা মাঠে সভা করিব কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহা আমি এখনই গিয়া জানাইয়া আসি। Cuming সাহেব যিনি কুমিল্লার স্বদেশী দাঙ্গার খুনি মামলার বিচার করেন ও পরে হাইকোর্টের জজ হন, তিনি তখন রাজসাহির ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি দেখা করিতে গেলে আমার রাজসাহি আসিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। যে টেবিলে তাঁহার অপর পার্শ্বে আমি বসিলাম, তার উপর rifle ও revolverএ বোধ হয় গুলি পোরা ছিল। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে আমিও গভর্ণমেণ্টের অঙ্গভুক্ত তবে তাহার ও আমার সহিত এইটুকু প্রভেদ যে তিনি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, আমি তাহা নই। আমি রাজসাহি বিভাগের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি। এই ইস্তাহারে সাধারণের একটি মূল্যবান অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। আমার মতে এই ইস্তাহার বে-আইনী। সুতরাং সাধারণের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আমি সভা আহ্বান করিতে আসিয়াছি ও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। আপনি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, আপনি গভর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, আপনি যদি ইহার জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা সঙ্গত মনে করেন তাহা হইলে সে বিষয়ে আমি আপনাকে কোন দোষারোপ করিব না। কিন্তু আমার কার্য্যের জন্য সহায়ক কি সাধারণের আর কাহাকেও দায়ী করিবেন না। তিনি বলিলেন সভা করিলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সম্ভাবনা। আমি বলিলাম

রাজসাহি বিভাগে আমরা পুরুষানুক্রমে অনেক শতাব্দী বাস করিয়া আসিতেছি। আপনি এখানে নব আগন্তুক, আপনাকে সাধারণের পক্ষ হইতে জানাইতেছি এসব আশঙ্কা অলীক। পুলিশ বা চৌকিদারের রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি আমার সঙ্গে আইন ও স্বদেশী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া সভা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া বিদায় দিলেন। আমি শেষকথা বলিলাম আমি আমার কর্ত্তব্য করিব ও আপনি আপনার কর্ত্তব্য করিবেন ইহাতে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ মন মালিন্য ঘটিবে না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় সরকারের অবৈধ হুকুমসম্বন্ধে আমরা তাহা অমান্য করিবার সঙ্কল্প করিলে আমরা কোন বল প্রয়োগ বা ব্যক্তিগত কাহারও উপর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতাম না, ইহা "অহিংস অসহযোগিতা" ব্যতীত আর কি?

আমরা ঐ দিন অপরাহ্নে পদ্মার বাঁধের সন্নিকট একটি মাঠে সমবেত হয়ে সভা করে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ ও স্বদেশীগ্রহণ ও বিদেশীবর্জ্জন সম্বন্ধে মন্তব্য পাশ করলাম। রাজসাহির অনেক বিশিষ্ট নাগরিক তাহাদের বাটীর আঙ্গিনায় সভা আহ্বান করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু আমাদের মতে বাড়ীর আঙ্গিনায় বা ভিতরে সভা ডাকা হইলেও সেখানে যদি সাধারণের অবাধ গতি থাকে তাহলে সভাস্থলও Public Place হয় ও সভাটিও Public Meeting হয়। সুতরাং রাজসাহির কাহাকেও এবিষয়ে জড়িত না করে খোলামাঠে সভা করা স্থির হয়েছিল। রাজসাহির নেতাগণ ও জন সাধারণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আবদুল্লা প্রভৃতি স্বদেশী প্রচারক সুন্দর বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। কিন্তু একটিও পাহারাওয়ালা সভার ত্রিসীমানায় ছিল না; ইহার কারণ আমার মনে হয় যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বা পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ইস্তাহারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে সেটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলে কাহাকেও গ্রেপ্তার বা আদালতে বিচারসাপেক্ষ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ কলিকাতা হাইকোর্ট তখন পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন খাতির রাখিতেন না।

রাজসাহির এই ঘটনাটির পর সিরাজগঞ্জে এই ইস্তাহার জারিকরে সভা বন্ধ করা হয়েছে—কলিকাতায় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট খবর আসে। তিনি Anti-Circular Societyর সভাপতি ছিলেন। তিনি সিরাজগঞ্জে গিয়া মিটিং করা স্থির করলেন। আমাকে সঙ্গে যাইবার অনুরোধ করিলেন। কারণ আমি তখনও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার রাজসাহি বিভাগের মিউনিসিপালিটির

প্রতিনিধি স্বরূপে সদস্য ছিলাম। আমরা সিরাজগঞ্জে পৌছিলে সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের অক্লান্ত কর্ম্মী বঙ্কিম চন্দ্র রায় ও তাঁহার সহকর্ম্মী ও জনসাধারণ আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাহাদের বাটীতে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি ও কৃষ্ণবাবু কাহারও আতিথ্যগ্রহণ না করিয়া ডাক বাঙ্গলায় গিয়া উঠিলাম। ভারজার মন্মোহম চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন সিরাজগঞ্জে সর্ব্বোচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কাহারও তিনি খাতির রাখিতেন না। সরকারি হুকুম অকুণ্ঠিত ভাবে পালন করিতেন। তাহাতে তাঁহাকে আমরা কোন দোষারোপ করি নাই। তিনি আমাদের মিটিং না করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। আমরা তাঁহাকে জানাই যে অপরাহ্নে আমরা সিরাজগঞ্জ বাজারের উপর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ ও স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন সম্বন্ধে মিটিং করিব। তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তিনি করিতে পারেন। বৈকালে বাজারের উপর সভা হইল। পুলিশ বাধা দেওয়া দূরে থাকুক উপস্থিত হইল না। আমরা সভান্তে যখন বাজার হইতে সিরাজগঞ্জ সেতু পার হইয়া সহরে ফিরি তখন সেইপথে রায় মহাশয়ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা থানায় গিয়া মন্মোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে কৃষ্ণবাবু ও চৌধুরী সাহেবকে যে গ্রেপ্তার করিবেন বলিয়াছিলেন তাহা করিলেন না কেন? তাহাতে তিনি বলেন তিন খানা জরুরী তার গভর্ণমেণ্ট Chief Secretary র নিকট করিয়াও কোন উত্তর পান নাই। ইহাতে বুঝা গেল যে সার্কুলারের বলে সভাবন্ধ বা তাহা অমান্য করিলে গ্রেপ্তার করা বা আদালতে এই ইস্তাহার আইনসঙ্গত বা বে-আইনি বিচার সাপেক্ষ করিতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত ছিলেন না। এখন ইহাও বুঝাগেল যে রাজসাহিতে ও ম্যাজিষ্ট্রেট Cuming সাহেব আমাদের সভা করায় কেন বাধাদেন নাই বা আমাদের গ্রেপ্তার করেন নাই। বরিশালে বন্দেমাতরং ইস্তাহার (Circular) সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর পক্ষ থেকে আমরা যে Passive resistance (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অহিংস অসহযোগিতায়) দ্বারায় প্রতিবাদ করি তাহা পরে বর্ণিত আছে। ১৭৭ ও ১৭৮ পৃষ্ঠায় "আবরুজায়" পরিবর্ত্তে "মৌলবী আবুল হোসেন" পড়ি

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বরিশাল।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি কয়েক জন বন্ধুর সহিত আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে কয়েকটী বিচার্য্য বিষয় মীমাংসার জন্য ঢাকায় গিয়াছিলাম। আমাদের কার্য্য শেষ হইলে আমরা ষ্টীমারে করিয়া ঢাকা হইতে বরিশাল রওনা হই এবং সন্ধ্যায় তথায় পৌঁছিয়া দেখিলাম যে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ পূর্ব্বেই আসিয়াছেন বটে কিন্তু কয়েকটী সমস্যা সমাধান না করিয়া তাঁহারা নামিবেন না বলিয়া ষ্টীমারেই অবস্থান করিতেছিলেন। বরিশাল এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য সহরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা উক্ত আদেশ অন্যায় বলিয়া গণ্য করিয়াছিলাম এবং এই স্বৈরচারের নিকট মস্তক অবনত করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু বরিশালের নেতাগণ আমাদের অভ্যর্থনাকালে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিবে না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা আমরা আবদ্ধ ছিলাম কি না ইহাই সমস্যার বিষয় ছিল। প্রতিনিধিগণের মধ্যে তরুণ দল এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। বরিশালের নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনাকালে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি না করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; অন্য সময় সম্বন্ধে কোনরূপ বাগ্‌দান করেন নাই। আমরা সেইজন্য ঠিক করিলাম যে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতিমত অভ্যর্থনাকালে কেহ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিবেন না কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য সময় করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইলে প্রতিনিধিগণ সন্ধ্যায় বরিশালে নামিলেন।

আমি লাকুটিয়ার জমিদার ও আমার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়ের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলাম। বিহারী

লাল বাবু স্বীয় বিস্তীর্ণ জমিদারী লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; সাধারণের কার্য্যে কোনও দিন যোগদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিও বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধী আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করেন।

১৪ই এপ্রিল শনিবার প্রাদেশিক সম্মেলন আরম্ভ হইবার কথা ছিল। ঐ দিবস প্রাতঃকালে বিহারীলাল বাবুর বাটীতে একটী সভা হয়। নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদের সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর যে সকল নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন সেই সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রতিবিধান করিবার জন্য কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে যে সভার সৃষ্টি হয় (Anti-Circular Society) তাহার প্রতিনিধিগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ইহা স্থির হইয়াছিল যে প্রতিনিধিগণ রাজার হাভেলির (Haveli) প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হইয়া তথা হইতে প্রাদেশিক-সম্মেলন-মণ্ডপে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রাপূর্ব্বক যাইবে। পুলিস বলপ্রয়োগ করিলেও প্রতিনিধিগণ কোনওরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে না—এমন কি লাঠি অথবা ভ্রমণকালীন ছড়ি ব্যবহারও নিষেধ ছিল। বি, সি, চ্যাটার্জ্জী মহাশয় যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ছড়ি সঙ্গে লওয়া যাইতে পারে কি না, তখন আমি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছিলাম যে এমন কি ছড়িও লওয়া হইবে না। আমার এই উপদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

বেলা ২টার সময় শোভাযাত্রা বাহির হইবার ঠিক হয়। আমি নির্দ্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ স্থানে পৌঁছাই। মিষ্টার এ, রসুল (Mr. A. Rasool) এবং তাঁহার স্ত্রী শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন। রসুল সাহেবের স্ত্রী একজন ইংরাজ মহিলা। প্রথম সারিতে আমি, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ এবং ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় ছিলেন। যুবকবৃন্দ পিছনে ছিলেন। চতুর্দ্দিকে পুলিস দেখা যাইতেছিল। তাহাদের হাতে রেগুলেসন লাঠি। একজন পুলিসের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন। এই সমস্ত পুলিস বাহির করিবার কোন কারণই ছিল না।

আমাদের নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন Anti-Circular Society-র যুবক প্রতিনিধিবৃন্দ বাহির হন তখনই পুলিস আক্রমণ আরম্ভ করে। রেগুলেসন লাঠির দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করা হয় এবং বন্দেমাতরম্ প্রতীকগুলি যাহা তাহারা ধারণ করিয়াছিল সেইগুলি ছিঁড়িয়া দেওয়া হয়। অনেকেই আহত হইয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ স্বদেশী কর্ম্মী মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহকে একটী পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করা না হইলে নিশ্চয় সে ডুবিয়া যাইত।

যুবকগণ কিন্তু কোন অপরাধই করে নাই। পুলিস তাহাদের প্রহার করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা বন্দেমাতরম্ ধ্বনিও করে নাই। তাহাদের একমাত্র অপরাধ এই ছিল যে তাহারা রাজপথ দিয়া শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের প্রহার করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে থাকে। তখন তাহাদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ হয় তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু এই নির্য্যাতন দ্বারা আন্দোলন দমনের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ইহা স্বদেশিকতার ভাবকে দৃঢ়তর করিয়াছিল মাত্র।

যখন যুবকগণের উপর এই অত্যাচার চলিতেছিল তখন আমরা কিন্তু ইহা জানিতে না পারিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। কলিকাতার অন্যতম প্রতিনিধি ললিত মোহন ঘোষাল আমাদের নিকট দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া যখন আমাদের ঐ সংবাদ জানাইল তখন আমরা পিছনে ফিরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই সময়ে পুলিস Superintendent Mr. Kemp সাহেবকে দেখি। আমি যখন তাঁহাকে বলিলাম যে কেন তিনি আমাদের লোকদের প্রতি অন্যায় ভাবে মারপিট করিতে আদেশ দিয়াছেন তখন তিনি আমাকে বলেন যে আমি তাঁহার হস্তে বন্দী। সেই সময় মতিলাল ঘোষ মহাশয় আসিয়া বলেন যে তাঁহাকেও যেন বন্দী করা হয়। কেম্প সাহেব

(Mr. Kemp) তখন বলেন যে তিনি কেবল আমাকে বন্দী করিতেই উপদেশ পাইয়াছেন।

বন্দী অবস্থায় আমি ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়কে সম্মেলনের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। আমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল এবং কোনওরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পায় নাই। এইরূপ অবস্থায় আত্মসংযম স্বায়ত্তশাসনলাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে কেম্প সাহেব (Mr. Kemp) আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে লইয়া চলিলেন। বিহারী লাল রায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, পণ্ডিত কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও আমি একখানি ঠিকা গাড়িতে করিয়া চলিলাম। কেম্প সাহেবও গাড়ির ভিতরে বসিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের সকলের গাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেইজন্য গাড়ির পিছনে সহিসের স্থানে দাঁড়াইয়া চলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ এমার্সন (Mr. Emerson) সাহেবের কুঠীর বারান্দায় আমাদের লইয়া যাওয়া হয়। কয়েক মিনিট পরেই আমাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। আইনভঙ্গ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বন্দী হিসাবে আমি প্রবেশ করিলাম। এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নিকট নূতন নয়। আমার অন্য বন্ধুরা ঘরে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিবার পর আমিও যখন একখানি চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলাম তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন "যেহেতু আপনি বন্দী আপনি আসন গ্রহণ করিতে পারেন না; আপনাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে"। উত্তরে আমি বলিলাম "আমি আপনার কুঠীতে অবমানিত হইবার জন্য আসি নাই। আমি আপনার নিকট ভদ্র ব্যবহার পাইব আশা করি"।

এমার্সন সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনয়ন করিযা আমাকে আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া আমার যাহা বক্তব্য বলিতে আদেশ দিলেন। আমি

নিজেকে নির্দ্দোষ বলিলাম এবং পক্ষ সমর্থনের জন্য সময় চাহিলাম। ঐ সময় নোয়াখালির তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ লীস সাহেব (Mr. Lees) সেইস্থানে বসিয়াছিলেন। তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটী মিটাইয়া লইতে উপদেশ দিলেন। আমি বলিলাম "ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার মত আমি কিছুই করি নাই"। যাহা হউক আমার ২০০৲ শত টাকা জরিমানা হইল। তারপর পুলিসের অভিযোগটীর বিচার আরম্ভ হইল। কেম্প সাহেব (Mr. Kemp) একলা সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অনুমতি গ্রহণ না করিয়া শোভাযাত্রা পরিচালনা এবং নিষিদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করার অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। আমি নিজেকে নির্দ্দোষ বলিলাম এবং কেম্প সাহেবকে (Mr. Kemp) জেরা করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিলাম। আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছিল। আমাকে পুনরায় দুই শত টাকা জরিমানা করা হইল। আমার নিকট অর্থ ছিল না। কেম্প সাহেব (Mr. Kemp) বরাবর আমার সহিত ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ঐ অর্থ আনিবার সময় তিনি আমার সহিত যান।

জরিমানার টাকা দেওয়া হইলে আমি সম্মেলনে ফিরিয়া যাই। যখন আমি বন্ধুগণের সহিত সভাস্থলে ফিরিয়া যাই তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে থাকে। কয়েক মিনিট ধরিয়া সম্মেলনের কার্য্য স্থগিত থাকে এবং আমরা আসন গ্রহণ করিলে পর পুনরায় আরম্ভ হয় বটে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসূচি অনুযায়ী আর কাজ হয় নাই।

শীঘ্র সভামণ্ডপে বাবু মনোরঞ্জন গুহ তাঁহার আহত পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহের সহিত উপস্থিত হইয়া পুলিসের নির্ম্মম অত্যাচারের বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পুলিস রেগুলেসন লাঠি দ্বারা চিত্তরঞ্জনকে আক্রমণ করে এবং তারপর তাহাকে একটী পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেয়। সেই অসহায় অবস্থায় তাহার উপর লাঠির আক্রমণ চলিতে থাকে কিন্তু প্রত্যেক আঘাতের বিনিময়ে ঐ যুবক কেবল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি

ব্যতীত আর কোনওরূপ বাধা দেয় নাই। অহিংসার এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অবর্ণনীয়। পিতা ও পুত্রের ঐ দৃশ্য ভুলিবার নয়। ১৯০৬ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে ঐ দৃশ্য অঙ্কিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

সন্ধ্যায় যখন সম্মেলন ভঙ্গ হয় তখন আবার ঐ নিষিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি বরিশালের আকাশ বাতাসকে বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল কিন্তু পুলিস তখন আর কোনরূপ বলপ্রয়োগ করে নাই।

কিন্তু এইখানেই এই দমনের সমাপ্তি হয় নাই। পরদিন যখন সম্মেলনের কার্য্য চলিতেছিল তখন কেম্প সাহেব (Mr. Kemp) সভাপতিকে জানান যে যদি তিনি তাঁহাকে নিশ্চয়তা দেন যে সভাভঙ্গের পর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি হইবে না তাহা হইলে সভার কার্য্য চলিতে পারে নচেৎ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুযায়ী সভা ভঙ্গ করিতে হইবে। সভাপতি প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জানাইলেন যে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে অক্ষম। তখন কেম্প সাহেব সভা ভঙ্গ করিবার আদেশটী পাঠ করিলে সমস্ত সভাস্থলে ঘৃণাসূচক ধ্বনি উত্থিত হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিগণ কেহই এই অন্যায় আদেশ অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে রাজী ছিলেন না। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ নেতাগণ সরকারের আদেশ স্বেচ্ছাচারমূলক ও অবৈধ হইলেও প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি না দিয়া সভা বন্ধ করিতে বুঝাইয়া বলায় তাঁহাদের সেই আবেদন সকলেই মানিয়া লন। * সেই সঙ্কটকালে জনসাধারণেরা যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও নেতৃবৃন্দের প্রতি আস্থার পরিচয় দেন তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। যাহা হউক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিনিধিগণকে কোনওরূপে সভা ভঙ্গ করিতে রাজী করিতে সক্ষম হইলেও 'সঞ্জিবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় কিছুতেই সভা ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। ব্রেনাস (Brennus) যখন তাঁহার বর্ব্বর অনুচরবৃন্দকে লইয়া রোম নগরীতে প্রবেশ করিতে-

* সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

ছিলেন তখন যেমন রোমের শাসন সভার বয়োবৃদ্ধ সদস্যগণ স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন সেইরূপ দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণ কুমার বাবুও স্বীয় আসনে বসিয়া রহিলেন। ঘৃণায় আরক্তমুখ কৃষ্ণ কুমার তখন যে কোনও অবস্থার জন্য প্রস্তুত। অতিকষ্টে এবং অনুনয় বিনয় দ্বারা অবশেষে তাঁহাকে সম্মত করান হয়।

সভাস্থলে প্রায় তিনশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সেই প্রখর রৌদ্রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আমরা সকলেই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিম্নোক্ত আদেশটীতে ক্ষুব্ধ হই ঃ—

"যেহেতু পুলিশ রির্পোট হইতে দেখা যাইতেছে যে সম্মেলনের একটী সভা—যাহা এক্ষণে সহরে বি, এম্ কলেজের বিপরীত দিকে অনুষ্ঠিত হইতেছে—ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় জনতার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের এবং নিষিদ্ধ শোভাযাত্রার সম্ভাবনা আছে সেইজন্য আমি জনসাধারণকে প্যাণ্ডেলে কিংবা অন্যত্র ঐ উদ্দেশ্যে মিলিত হইতে এবং রাস্তায় ভিড় করিতে নিষেধ করিতেছি। যেহেতু আরও প্রকাশ যে জনতা রাজা বাহাদুরের হাভেলিতে সমবেত হইতে পারে সেইজন্য আমি তাহা করিতেও নিষেধ করিতেছি"—

পাণ্ডেল হইতে আমরা অনেকেই বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব রজনীকান্ত দাস * মহাশয়ের গৃহে সমবেত হই, তথায় কাব্যবিশারদ মহাশয়, বিপিন পাল ও আমি বক্তৃতা করি এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে ও স্বদেশী ব্রত পালন করিতে শ্রোতৃবৃন্দকে আবেদন করি।

---

* রজনীকান্ত দাসের বাটীতে সভা হয় নাই। নিবারণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গনে সভা হয়।
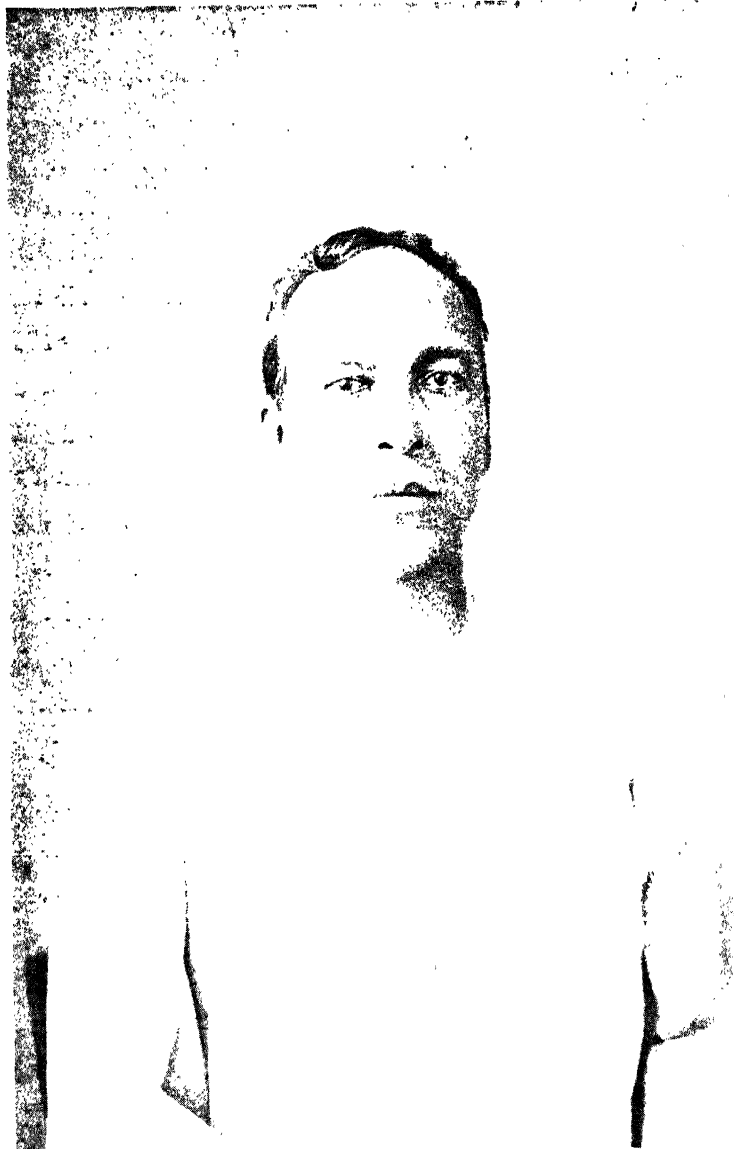
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

সম্পাদক

ত্রয়বিংশ অধ্যায় সম্বন্ধে

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বরিশালে বন্দেমাতরং ইস্তাহার সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ
বা
অহিংস অসহযোগিতা।

বরিশাল কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বে স্থির হইল যে আমরা জনকতক রাষ্ট্রগুরুর সহিত ঢাকা গিয়া শ্রীযুক্ত আনন্দ রায় মহাশয় ও আর আর সেখানকার ডেলিগেটদের সহিত সম্মিলিত হইয়া বরিশাল যাইব। আমরা কলিকাতা হইতে ঢাকা যাত্রা করিলে লোহাজঙ্গ আসিয়া আমাদের ষ্টিমার থামিল। সেখানে বহুলোক নৌকাযোগে আমাদের সহিত ষ্টিমারে দেখা করিতে আসিল এবং ফল ফুল ও নানারূপ খাদ্য আমাদের জন্য উপঢৌকন দিল। কাব্যবিশারদ মহাশয়, আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা ও অন্যান্য যাত্রীবর্গ তাহার সদ্ব্যবহার করিলেন। যাহারা নৌকাযোগে আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক যুবকের দল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাময় স্বেচ্ছাসেবকের দল সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা স্বদেশী ক্রীড়া ও ব্যায়ামচর্চ্চা করিত। প্রায় পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে আখড়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেখানে সাধারণ ব্যায়াম ব্যতীত লাঠিখেলা শিক্ষা দেওয়া হইত। লোহাজঙ্গের স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের নিকট জানিতে চাহিল যে কিরূপে তাহারা এই জাতীয় আন্দোলনের সহায়তা করিতে পারে। আমরা তাহাদের বলিলাম যে বিনা বলপ্রয়োগে স্বদেশীগ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জন প্রচার করিবে। স্থানীয় শিল্পের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিবে। স্বদেশী বস্ত্রাদি যেখানে পাওয়া যায় না তাহা তাহাদের নেতাদের সাহায্যে আনাইয়া সাধারণ লোকের মধ্যে লাভ না করিয়া যত স্বল্পমূল্যে সম্ভব বিক্রয় করিবে। গ্রামের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ মনযোগ দিবে। পানীয় জল সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দিবে।

লাঠি খেলা সম্বন্ধে তাদের আমরা বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দেই যে আত্মরক্ষার জন্য তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করবে ও শান্তি রক্ষার সহায়তা করবে কিন্তু কোনরূপে যেন শক্তির অপব্যয় বা অপব্যবহার না করে। লোহজঙ্গের যুবকদের যাহা বলিয়াছিলাম বাঙ্গালার সব স্বেচ্ছাসেবকদের এই আদেশ ও উপদেশ আমরা দিতাম।

ঢাকা পৌঁছে স্থানীয় নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হল যে বরিশালে যদি কন্‌ফারেন্‌সের কার্য্যে সরকার পক্ষ হতে বাধা দেওয়া হয়, তা হলে সংযতভাবে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করব। ঢাকা থেকে ডেলিগেট ও স্বেচ্ছাসেবকদের দল আরও পরিপুষ্ট হয়ে আমরা নারায়ণগঞ্জ থেকে ষ্টিমারে বরিশালে যাত্রা করলাম। বরিশালে পৌঁছিবার পূর্ব্বে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী নদীবক্ষে যে দৃশ্য দেখেছিলাম জীবনে তাহা আর কখন দেখবও না, ভুলবও না। ষ্টিমার যেখানে যেখানে থেমেছিল সেখানে অসংখ্য ডিঙ্গি ও পানসী নৌকা নানা রঙের পাল ও পতাকা উড়িয়ে ফল ফুল নিয়ে স্বদেশী গান গাইতে গাইতে নানা-দিকের পল্লিবাসীরা এসে আমাদের ষ্টিমারকে ঘিরে ফেলেছিল ও রাষ্ট্রগুরুর দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। সারং তাদের অনুনয় বিনয় করে ষ্টিমারে উঠ্‌তে বারণ করেছিল, কারণ ষ্টিমারে তাদের স্থানও হত না ও সারং আশঙ্কা করেছিল যে নৌকা থেকে একদিক দিয়ে অত লোক ষ্টিমারে উঠতে গেলে ষ্টিমার উলটে যেতে পারে ও অনেক লোকের প্রাণহানি হতে পারে। রাষ্ট্রগুরু ষ্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়াতে নৌকা থেকে বন্দেমাতরম্‌ ও জয়ধ্বনি করে তাঁহাকে বিশাল নদীবক্ষ হতেই তারা অভ্যর্থনা করেছিল ও পতাকা উড়িয়ে জয়ধ্বনি করে ষ্টিমার ছাড়বার সময় বিদায় দিয়েছিল। নদীবক্ষে এরূপ নৌকায় মিছিল আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তাহা বর্ণনার অতীত একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য।

এইরূপ করে বরিশাল পৌঁছতে রাত্র প্রায় এক প্রহর হয়ে গেল। আমরা আসবার পূর্ব্বেই কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের ডেলিগেট, ও স্বেচ্ছাসেবকের দল প্রেসিডেন্ট রসুল সাহেব সহ ষ্টিমারে খুলনা হতে আমাদের আগেই এসে পৌঁছে-ছিলেন। আমাদের ষ্টিমার আসতে সেই ষ্টিমারের ভোঁ বাজিয়েও পুনঃপুনঃ সিটি দিয়ে আমাদের ষ্টিমারকে অভ্যর্থনা কর্‌ল। খুলনার ষ্টিমার আগে পৌঁছিলেও আমরা পৌঁছিবার পূর্ব্বে কেহ নামেন নাই। আমরা পৌঁছিলে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়, শ্রীমান শচীন বসু ও ফণি বাঁড়ুয্যে আন্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভাপতি ও সদস্যরূপে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের সহকারে আমাদের ষ্টিমারে এসে উপস্থিত হলেন ও রাষ্ট্রগুরুকে জানালেন যে ডেলিগেটরা ষ্টিমার থেকে নামবার সময় বন্দে-মাতরম্‌ বলা হবে কি না এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য তাহারা অপেক্ষা কর্‌ছেন। অশ্বিনী দত্ত মহাশয় জানালেন যে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ডেলিগেটরা বরিশাল পৌঁছিলে তাদের বন্দেমাতরম্‌ বলে অভ্যর্থনা করা হবে না। রাষ্ট্রগুরু, আনন্দ রায় ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্য নেতারা

স্থির করলেন যে তাহারা বরিশালের নেতাদের অতিথি তাঁহারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা সে রাত্রে তারা ভঙ্গ করবেন না। সে রাত্রে বন্দেমাতরম্ বলা বন্ধ থাকবে। কিন্তু তাহাদের মতে পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তাদের বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করার বিরুদ্ধে আদেশ অবৈধ, সুতরাং পরের দিন বরিশালের পথে ও কনফারেন্সে বন্দেমাতরম্ বলবেন ও তার পরিণাম ফল যাই হোক তার দায়িত্ব নিজেদের উপর নেবেন। স্বেচ্ছাসেবকদের একথা বুঝতে অনেক বেগ পেতে হল। তাহার পরিচালনার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আমি তাদের বুঝাইলাম যে ঐ গভীর অঁাধার রাত্রে গভীরতর নদীর পাড়ে শত শত বালক বালিকা ও যুবক সমবেত হয়েছে এবং বহু পুলিশের প্রহরি রেগুলেসান লাঠি হাতে মোতায়ন রয়েছে। তাঁহারা যদি বন্দেমাতরম্ বলে নামেন ও পুলিশ আক্রমণ করে তাহা হলে বরিশালের অনেক বালক বালিকা নদীগর্ভে প্রাণ হারাতে পারে। আমরা বরিশালে তাদের জনক জননীদের কাঁদাতে আসি নাই। আমরা যাদের অতিথি হয়ে এসেছি তাদের এরূপ দারুণ অনিষ্ট সাধন না করে আজিকার রাত্রের মত নীরবে নেমে যাই। দিবাভাগে নেতাদের আদেশ মত দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য যদি অত্যাচার সহ্য করতে হয়, তা' আমরাই করব। স্থানীয় লোকের আতিথ্যের দরুণ তাদের কোনরূপে অনিষ্ট বা বিপদগ্রস্ত করব না। সে রাত্রে নীরবে নেমে গিয়ে সহরের লোকের আতিথ্যগ্রহণ করলাম। পরদিন রাজা বাহাদুরের হেভেলিতে ডেলিগেট ও স্বেচ্ছাসেবক সকলে সমবেত হয়ে স্থির হল যে প্রেসিডেন্ট সস্ত্রীক, রাষ্ট্রগুরু প্রভৃতি নেতারা ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা শোভা যাত্রার অগ্রণী স্বরূপে পদব্রজে কন্‌ফারেন্স মণ্ডপে যাবেন, তাদের পশ্চাতে ডেলিগেটরা যাবেন ও সব শেষে স্বেচ্ছাসেবকেরা বিশেযতঃ আন্টিসার্কুলার সোসাইটির দলটি আসবে। এদের পর্য্যাবেক্ষণের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ ও নির্ভীক নেতা আনন্দরায় মহাশয় ও তাহার সহকারী স্বরূপে আমি নিযুক্ত হলাম। আমাদের সঙ্গেও অনেক ডেলিগেটও ছিলেন। সকলের উপর আদেশ হয়েছিল যে, কেহ হাতে ছড়ি কি ছাতা পর্য্যন্ত রাখতে পারবেন না। রাজা বাহাদুরের হাভেলিতে সমবেত হবার সময়ই দেখেছিলাম তার সামনে রেগুলেসান লাঠিহাতে অনেক পুলিশ রাজপথের পার্শ্বে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদল বন্দুকধারি পুলিশও উপস্থিত ছিল। সহকারি পুলিশ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে তাদের পরিচালনা করছিলেন। সাহেবের নাম হেনস্ বলে আমার স্মরণ হয়। ডেলিগেট ও স্বেচ্ছাসেবকদের মিছিল বেরিয়ে যাবার অল্পক্ষণ পরেই,

আমরা তখনও হাভেলির মধ্যেই আছি, কতকগুলি ডেলিগেট ছুটে এসে বল্‌লেন পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের লাঠি দিয়ে মারছে। আমি আনন্দ বাবুর অনুমতি নিয়ে বাহিরে ছুটে বেরিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখি বেচারাম লাহিড়ী নামে কৃষ্ণনগরের একটি উকিল ভূমিসাৎ হয়ে আছেন, মাথায় রক্ত পড়ছে, গায়ক ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীও লাঠির ঘা খেয়ে পড়ে আছেন ও তাহার কিছু দূরে বড় রাস্তার উপর খুব একটা কোলাহল হচ্ছে। পুলিশ আন্টিসার্কুলার সোসাইটির মেম্বারদের উপর লাঠি চালাচ্ছে। যে স্থানে এই হাঙ্গামা হচ্ছে তার এক পাশে নালা, অপর পাশে পুকুর, মাঝে সদর রাস্তা। বরিশালের সদর রাস্তার পাশে নালাগুলিতে সচরাচর জল থাকে, জোয়ার ভাটাও খেলে। পুকুরটিও গভীর। দেখলাম শচীন, ফণি ও অন্যান্য ঐ সোসাইটির মেম্বারদের জামাতে যে বন্দেমাতরম্ লেখা ব্যাজ ছিল, তা' পুলিশে ছিড়ে দিচ্ছে ও ধাক্কাদিয়ে বা লাঠির গুতো দিয়ে তাদের নর্দ্দমায় ফেলে দিচ্ছে। তার বিপরীত দিকে কতকগুলি লোক "মারা যাবে," "মারা যাবে" বলে চিৎকার করছে ও মাঝে মাঝে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উঠছে। অনতিদূরে দেখলাম হেনস্ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে হাজির আছেন। আমি ছুটে গিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বল্লাম যে "আপনি ত দেখছি ইংরাজ, এই যে নিরস্ত্র, নির্ব্বিবাদী, নিরপরাধি ছেলেদের জোয়ান জোয়ান পাহারাওয়ালা মোটা মোটা লাঠি দিয়ে পিঠছে সেটা কি আপনার অত্যন্ত কাপুরুষতা বলে মনে হয় না? আপনি নির্ম্মমভাবে তাই দেখছেন। আপনি ওদের বিরত করুন, ডেকে নিন।" সাহেব অল্পবয়স্ক ও অল্প দিন বিলাত থেকে এসেছেন মনে হল। আমি এইরূপ লজ্জা দিতে মুখটা লাল হয়ে উঠল, সিটি দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে পাহারা-ওয়ালাদের ডেকে নিলেন। স্বেচ্ছাসেবক ও ডেলিগেট যারা মিছিলের শেষভাগে আসছিলেন অনেকেই অল্প বিস্তর লাঠির ঘা খেয়ে ছিলেন কিন্তু নেতাদের আদেশ মত কেউ পুলিশের গায়ে হাত তোলেননি।

অহিংস অসহযোগিতা বা সত্যাগ্রহ কথার তখনও সৃষ্টি হয় নাই কিন্তু কার্য্যতঃ শাসনকর্ত্তাদের অবৈধ আদেশের বিরুদ্ধে এরূপ সংযতভাবে প্রতিবাদ আর কোন স্থানে করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। সে যা হোক মুখে মুখে শুনলাম যে কেম্পসাহেব পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, যিনি আগে বলে গিয়েছিলেন, তিনি সুরেন্দ্র বাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছেন। আমরা তাতে বিচলিত না হয়ে যাঁহারা আহত হয়েছিলেন তাদের ব্যবস্থা করলাম। যাহারা অধিক আহত হন নাই তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের জিম্মায় দিলাম। চিত্তরঞ্জন

গুহঠাকুরতা যার মাথা থেকে রক্ত তখনও পড়ছিল ও সর্ব্বাঙ্গে লাঠির আঘাতে কালশিরে পড়ে গিয়েছিল তাকে আমি, আনন্দ রায় মহাশয় ও ঐ বালকের পিতাকে খবর দিয়ে একটা ঠিকে গাড়ি আনিয়ে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলাম। এই যুবককে পুলিশ লাঠি মেরে পুকুরে ফেলেছিল এবং সে প্রতি লাঠির ঘায়ে "বন্দে মাতরম্" বলে চিৎকার করেছিল। সময় মত পুলিশকে বিরত না করলে তার প্রাণনাশ হবার আশঙ্কা ছিল। হাসপাতালে যে ডাক্তার ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তার ক্ষত স্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন ও তার কর্দ্দমময় শরীর ধুইয়ে মুছিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করলেন। আমার মনে আছে যখন ডাক্তার তার শরীরের উত্তাপ নিলেন, দেখা গেল মারের ফলে উত্তাপ ১০০° উপরে উঠেছে। তিনি এই সব বিবরণ হাসপাতালের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করবার পর আমরা চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে থানায় গেলাম। সেখানে দারগার নিকট কেম্পসাহেব ও কতকগুলি অজানিত যষ্টিধারী পাহারাওয়ালার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে এই যুবক ও অন্য অনেক লোককে আহত করবার জন্য এজাহার দিলাম। দারগাবাবু তা ডায়রিতে লিখতে চান না আমরা জোর করাতে একটা ফাস কাগজে লিখলেন। আমরা জানি বিচার পাব না তথাপি জনসাধারণের নিকট শাসনকর্ত্তাদের এই কু-কীর্ত্তি ঘোষণার জন্য কেম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বরিশালে ও খুলনায় ট্রান্সফার (transfer) করে অনেক দিন চালিয়েছিলেন। পুলিস ষ্টেসনে এইরূপে ডায়রি করার পর আমরা চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে কন্‌ফারেন্স প্যাণ্ডেলে আসিলে সভাস্থ সকলে দাঁড়িয়ে উঠে সমঃস্বরে বন্দে মাতরম্ বলে অভ্যর্থনা করলেন। পরে তাঁরা প্রকৃতস্থ হলে কেহ কেহ পুলিস ও শাসনকর্ত্তাদের এরূপ কুব্যবহারের অতি তীব্র সমালোচনা করলেন তার মধ্যে ভূপেন্দ্র বসু মহাশয় যিনি সচরাচর অতি ঠাণ্ডা মেজাজের লোক "বৃটিশ রাজের আজ শেষদিন" বলে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা যদি সংবাদ পত্রে সব প্রকাশিত হত তা হলে রাজদ্রোহী বলে তাঁকে বিচার সাপেক্ষ হতে হত। সুতরাং সভাভঙ্গের পর সেই বক্তৃতার নোট যাহারা নিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে বসে অনেক কথা বাদ ছাদ দিয়ে কাগজে পাঠাতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। ঐ দিন পুলিশ ও শাসন-কর্ত্তাদের এই জুলুমের ফলে সকলের এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছিল যে সেদিন কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গার পর ডেলিগেট, স্বেচ্ছাসেবক, দর্শকবৃন্দ, দলে দলে পথে বেরিয়ে সহরময় সমঃস্বরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করতে করতে স্ব স্ব স্থানে ফিরে গিয়েছিলেন, তাতে পথের লোক ও ছেলে মেয়েরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যোগদান

করেছিল, পুলিশ ও তাদের কর্ত্তারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বোকা বনে গিয়েছিলেন। দিনের বেলায় লাঠি খেয়ে সায়ংকালে বন্দেমাতরম্ এস্তাহার এই ভাবে বরিশালে জনসাধারণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। বলপ্রয়োগ বা দাঙ্গা হাঙ্গামা না করে আমরা পূর্ব্ব বঙ্গের শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে এইরূপে জয়লাভ করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে ষ্টেটস্‌ম্যান সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জোনস্ সাহেব (পরে যিনি ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক হন) তখন আমার সহিত কলিকাতায় ফিরিবার পথে যা বলেছিলেন তা আমি এই প্রসঙ্গে বলতে পারি। ফেরবার পথে যেখানে ষ্টিমার থামে সেই খানেই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ ঘাটে এসে সমঃস্বরে বন্দেমাতরম্ বলে আমাদের অভ্যর্থনা করে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তখন সাম্প্রদায়িক কোন বিরোধ ছিল না। জোনস্ সাহেব এই দেখে বলেন যে 'বন্দে মাতরম্' বলা যদি অপরাধ হয় তাহলে দেখছি সমগ্র বঙ্গবাসীকে জেলে পুরতে হয়। ষ্টেটস্‌ম্যানে একথা লেখা হয়েছিল কি না মনে পড়ছে না। তবে এই কারণেই বরিশালের পুলিশ বন্দে মাতরম্ সম্বন্ধে আদেশ অমান্য হওয়াতে প্রথমে বলপ্রয়োগ করে, পরে হতবুদ্ধি হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে। বন্দেমাতরম্ ইস্তাহারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এইরূপেই বরিশালে সাধিত হয়েছিল। রাষ্ট্রগুরুর নেতৃত্বে আমাদের আন্দোলনের ফলে পরে পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেণ্টও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সম্বন্ধে আমার যা স্মরণ আছে তাই এখন বলব। কন্‌ফারেন্সের কার্য্যারম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরে আমি মঞ্চের উপর থেকে দেখি প্রবেশ দ্বারের সামনে লাল পাগড়ি, বন্দুকের নল ও পুলিশ হেলমেট টুপির চূড়া চক্‌চক্ কচ্ছে। চকিতে আমার মনে হল আবার পুলিশ কোন হাঙ্গামা বাধাতে এসেছে। সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি দ্রুতবেগে প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হলাম। দেখি কেম্প সাহেব কতকগুলি বন্দুকধারী প্রহরী নিয়ে দ্বাররক্ষকদের কি বলছেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে কেম্প সাহেব বল্লেন যে গভর্ণমেণ্টের একটি আদেশ সভাপতিকে তার জানাতে হবে। আমি বললাম বেশ আপনি আমার সঙ্গে আসুন কিন্তু প্রহরীদের আপনি বাহিরে রেখে দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সেটা কি নিরাপদ হবে, আমি বললাম সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ কোনরূপ আশঙ্কা নাই।

পুলিশ প্রহরি নিয়ে কেম্প সাহেব সভাস্থলে প্রবেশ করলে দারুণ গোলযোগ হতে পারত বলে, তাকে একা আসতে বলেছিলাম। তিনি সেটা বুঝলেন ও আমার সঙ্গে একাই আসতে সম্মত হলেন, সঙ্গে তার একজন মাত্র সঙ্গী ছিলেন।

তিনি খুলনার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নাম ডাক বলে পরিচয় দিলেন। কেম্প সাহেব মঞ্চের উপর আসিলে সভাপতি রসুল সাহেবকে বললাম যে কেম্প সাহেবের আপনাকে কিছু বলবার আছে। কেম্প সাহেব তখন রসুল সাহেবকে বললেন যে তিনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে সভা ভঙ্গ হলে পথে কেহ বন্দেমাতরম্ বলবে না তা হলে কন্‌ফারেন্সের কার্য্য চলতে পারে, তা না হলে কন্‌ফারেন্স অবৈধ বলে বন্ধ করবার আদেশ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দিয়েছেন। রসুল সাহেব রাষ্ট্রগুরু ও অন্য নেতাদের সহিত পরামর্শ করায় তাঁহারা এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে না বলিলেন। কেম্প সাহেবের প্রস্তাবটি আমদের অতি হাস্যস্পদ ব্যাপার বলে মনে হল। কারণ কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গলে পথে কেহ বন্দে-মাতরম্ বলতে পারবে না, তা না হলে কন্‌ফারেন্স বেআইনী হবে এ কি রকম কথা। বুঝাগেল যে গত সন্ধ্যায় কন্‌ফারেন্স অধিবেশনের পর পথে পথে দলে দলে যে সকলে বন্দে মাতরম্ বলে বেড়িয়েছে তাই বন্ধ করবার জন্য বেআইনি ও হাস্যস্পদ একটি হুকুম জাহির করতে এসেছেন। তখন কেম্প সাহেবকে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমটি পড়তে বলা হল। আমার গলাটা খুব জোর ছিল সুতরাং সভ্যগণকে আমাকে জানাতে বলা হল। আমি দেখলাম ব্যঙ্গচ্ছলে এই হাস্যকর ব্যাপারের অবতারণা করলে সভ্যগণ ভাল মেজাজে কেম্পের প্রস্তাবটা শুনবেন। আমি সভ্যদিগকে সম্বোধন করে বললাম যে এখন কন্‌ফারেন্সের কার্য্য স্থগিত রাখা হচ্ছে কারণ কেম্প সাহেব, "ফুল-আর" তস্য তদ্রূপ কর্ম্মচারিদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করবেন। কেম্প সাহেব হুকুমনামা হাতে নিয়ে পড়তে গিয়ে যেমন তাঁর হাত কাঁপে তেমনি তাঁর গলা কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে পাঠ শেষ করলেন। তখন আমরা হুকুমটি বাঙ্গালায় ব্যঙ্গচ্ছলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলাম। হুকুমটি স্থানান্তরে ভাষান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। কন্‌ফারেন্সে অনেক মহিলা ও বালক বালিকা উপস্থিত ছিল। অস্ত্রধারী পুলিশ ভিতরে এসে গোলযোগ করলে একটি বিভ্রাট হত। সুতরাং সভ্যদের আমরা অনুরোধ করলাম সভাস্থল তারা ত্যাগ করে মনের সুখে বন্দে মাতরম্ বলে মায়ের সেবায় দৃঢ় সঙ্কল্প হউন। সভাভঙ্গ হল কিন্তু সভাস্থল থেকে কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয়কে স্থানান্তরিত করতে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি বল্‌লেন, গুলি করে করুক আমি ও হুকুম মানি না আমি সভা ত্যাগ করব না। পরে বরিশালের খ্যাতনামা উকিল নিবারণ রায় মহাশয়ের

নাটোর অঙ্গনে অধিকাংশ ডেলিগেট সমবেত হয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ, স্বদেশী গ্রহণের ও বিদেশীবর্জ্জনের মন্তব্য সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গ্রহণ করলেন। বন্দে-মাতরম্" ধ্বনি বন্ধ করবার শাসনকর্ত্তাদের সব চেষ্টা বিফল হল। মাতৃভূমিকে "বন্দে মাতরম্" বলে সম্বোধন করতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খৃষ্টান কাহারও ধর্ম্মবিরুদ্ধ হতে পারে না। ইহার সহিত স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস জড়িত থাকায় ইহা স্বদেশ-বৎসল ভারতবাসী মাত্রেরই জয়ধ্বনি স্বরূপে প্রচলিত হয়েছে।

১৯৩ পৃষ্ঠা ২৯ লাইন "নিবারণ রায়" পরিবর্ত্তে "নিবারণ দাশগুপ্ত" পড়িতে হইবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

বরিশাল সম্মেলনের পর।

স্বদেশী ব্রত সম্বন্ধে এই স্থানে দু-একটী কথা বলিব। স্বদেশী আন্দোলনে এই ব্রত একটী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। আমিই ইহার উদ্দীপনা যোগাইয়াছিলাম। মগরার নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে স্বদেশী সভায় বক্তৃতা প্রদান কালে আমার মনে এই ব্রত সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। একটী মন্দির প্রাঙ্গনে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে সভা হইতেছিল এবং ঐ স্থানটীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল কারণ সে সময় স্বদেশীভাব আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল। পুরোহিতগণ বিদেশী দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে পৌরহিত্য করিতে অস্বীকার করিতেন। বিদেশী বস্ত্র, খাদ্য দ্রব্য, চিনি এবং লবণ সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছিল। ধর্ম্মভাব আমাদের জীবনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। মন্দির প্রাঙ্গনে দেবমূর্ত্তির দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বক্তৃতা প্রদান কালে হঠাৎ ভাবাবেগে আমি শ্রোতৃবৃন্দকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিমার নিকট নিম্নোক্ত শপথ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি:—

"সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এবং ভবিষ্যবংশীয়গণের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আমরা এই শপথ করিতেছি যে যথাসম্ভব আমরা স্বদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব এবং বিদেশী দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিব। শ্রীভগবান আমাদের সহায় হউন"।

পূর্ব্বে আমি কখনও এই ব্রত সম্বন্ধে চিন্তা করি নাই। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার গুণে হঠাৎ আমার এই প্রেরণা আসিয়াছিল। যাহা হউক পরদিবস বরিশালে এক সাহিত্য সভা হইবার কথা ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে ঐ সভায় গিয়াছিলেন কিন্তু সভা না হওয়ায় তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত ফিরিয়া আসেন। পরদিবস বরিশাল হইতে কয়েক মাইল দূরে রহমৎপুর নামক স্থানে একটী স্বদেশী

সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমি আমন্ত্রিত হই। আমরা স্থানীয় জমীদার চক্রবর্ত্তীদের আতিথ্য স্বীকার করি। প্রাতর্ভোজনের পর সভা আরম্ভ হয়। সভার কার্য্য শেষ হইবার পর পুলিস রেগুলেসন লাঠি লইয়া তথায় উপস্থিত হয় বটে কিন্তু সভা শেষ হইয়া যাওয়ায় পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

একদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া আমরা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করি। প্রত্যেক ষ্টেশনে বহু জনতা সমাগম হয় এবং সকলেই আমার পদধূলি লইবার জন্য ব্যগ্র হয়। রেলে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ আমার নিদ্রা বা কোনও বিশ্রাম হয় নাই এবং যখন আমি প্রত্যুষে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখন এক বিরাট জনতা আমাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। এণ্টিসার্কুলার সোসাইটীর (Anti Circular Society) বালকগণ তাহাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সহিত ঐ রেলেই ছিলেন।

কলেজ স্কোয়ারে যখন আমরা পৌছিলাম তখন দেখি হাজার হাজার লোক আমাদের দেখিবার ও বাণী শুনিবার জন্য পূর্ব্বেই সমবেত হইয়াছে। আমার জীবনে ইহা এক পরম মূহুর্ত্ত। যদিও আমার গলা ধরিয়া গিয়াছিল তথাপি এক নূতন প্রেরণার বশে আমি পুনরায় বক্তৃতা করি এবং শ্রোতৃবৃন্দকে স্বদেশীব্রত দৃঢ়ভাবে পালন করিতে এবং বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে উৎসাহিত করি।

স্বদেশ প্রেমিক লিয়াকৎ হোসেন সেদিন সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন। তিনি বলেন যে আমার গ্রেপ্তারের সংবাদে তিনি সমস্ত দিন উপবাস করেন। বাস্তবিক লিয়াকৎ এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বহুবার তিনি পুলিসের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন কিন্তু সকল অবস্থাতেই সেই নির্ভীক পুরুষ নিজ কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই। বিহার হইতে আগত এই মহাপ্রাণ স্বদেশসেবী বাঙ্গালা দেশকে ও

বাঙ্গালী জাতিকে আপনার করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যদিও সকল সময়ে তাঁহার সহিত আমার মতের মিল হয় নাই তথাপি স্বদেশের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ লিয়াকৎ হোসেন আমার হৃদয়ের এক বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া আছেন।

বরিশাল সম্মেলনের সভাপতি রশুল সাহেবের (**Mr. A. Rusool**) সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায় এই স্বদেশভক্তের জন্ম হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে অল্পসংখ্যক মুসলমান যোগদান করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। হিন্দু মুসলমান মিলনের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং বঙ্গবিচ্ছেদ এই মিলনের অন্তরায় হইবে বলিয়া তিনি ইহাকে জাতীয় বিপত্তি বলিয়া মনে করিতেন। এক সময়ে এই জন্য তিনি স্বধর্ম্মীদের নিকট অপ্রিয় হইয়াছিলেন কিন্তু পরে তাঁহার প্রতি এ মনোভাব দূরীভূত হয় এবং মুসলমানদের অবিসম্বাদী নেতারূপে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

বরিশাল সম্মেলনের সময় কর্ত্তৃপক্ষের আচরণ সমস্ত বঙ্গদেশ ও বাহিরেও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে এক মহতী সভায় দশ সহস্রের অধিক লোক সমবেত হয়। মন্দ শাসকগণ পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে এক প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। নিদ্রিত সিংহকে জাগরিত করিয়া তাহারা জাতীয়তাবোধ ও একতা বৃদ্ধির সহায়তা করে। মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুরের প্রস্তাব ক্রমে ঐ সভায় বরিশাল কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করা হয়।

কলিকাতা নগরী কিন্তু এই সমস্ত বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। প্রত্যহ কলেজ স্কোয়ারে সভা আহূত হইত। মফঃস্বলেও অনুরূপ সভার অনুষ্ঠান হইতেছিল। বাস্তবিক বরিশালে পুলিশের অত্যাচারের কথা শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া জনসাধারণকে চঞ্চল করিয়া

তুলিয়াছিল। এমন-কি গণ-আন্দোলনে উদাসীন ব্যক্তিরাও স্বদেশীব্রত গ্রহণ করতঃ দৈনিক জীবনে তাহা পালন করিতে আরম্ভ করেন। পশুপতি নাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে যে বিরাট সভা আহূত হয় তাহাতে মডারেট্ (নরম পন্থী) দলের বিশিষ্ট নেতা রায় নরেন্দ্রনাথ সেন পৌরহিত্য করেন। তিনি তাঁহার সভাপতির ভাষণে বলেন যে সংবাদ-পত্র ও বক্তৃতামঞ্চই জনসাধারণের অসন্তোষ প্রকাশের উপায়। যখনই এই অসন্তোষ চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা হয় তখনই বিপ্লবাত্মক কার্য্যের প্রকাশ পায়।

সত্যই শীঘ্র বাঙ্গালাদেশে বিপ্লবাত্মক কার্য্যের প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গজনিত ব্যাপক বিক্ষোভের ইহাই চূড়ান্ত প্রকাশ এবং সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতির দ্বারা ইহা আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বঙ্গভঙ্গ কেবল শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য করা হইয়াছিল তাহা নয়; পরন্তু ইহা ব্রিটিশ রাজ কর্ত্তৃক অনুসৃত এক নূতন নীতির নিদর্শন। ইহা দমন নীতি। স্বদেশসেবকগণকে নিগৃহীত করা, জন সভা বন্ধ করা ও সামরিক পুলিশ নিরীহ অধিবাসীদের মধ্যে স্থাপন করা—এই নীতিরই অঙ্গ ছিল। বরিশাল জেলার বানারিপাড়া নামক স্থানে বহু গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছিল বলিয়া সেখানকার অধিবাসীরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার মতলব করিতেছিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হইতেছিল এবং বরিশালের মাননীয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কেও ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

বরিশালে প্রতিনিধিগণকে মারপিট করিয়া পুলিস যখন সম্মেলন ভঙ্গ করিয়া দিল তখন ব্যাপারটী চরমে উঠিল এবং দেশে বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া পড়িল। তরুণ মন সর্ব্বত্রই কোমল ও নমনীয় এবং সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহ তাঁহাদের মনে নৈরাশ্য আনয়ন করিয়াছিল। আমার জীবনের একটী ঘটনা হইতে এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের উৎপত্তিকাল নির্ণীত হইতে পারে। ইহা

নিশ্চিত যে বঙ্গভঙ্গ এবং তৎপরবর্ত্তী-কালে অনুসৃত সরকারী নীতিই বাঙ্গালাদেশে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের মূল কারণ, যদিও ইহা সত্য যে অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ইহা সুদৃঢ় হইয়াছিল।

বরিশাল সম্মেলনের কয়েক মাস পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা দুইজন যুবক আমার বারাকপুরস্থ ভবনে আসিয়া আমার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতে চায়। আমরা তিন জনে ঘরে বসিলে পর একটী যুবক আমাকে বলিলেন "আমরা একটী গুরুতর ব্যাপারে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমরা স্যর বামভিল্ড ফুলারকে (Sir Bampfylde Fuller) হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছি এবং অদ্য রাত্রেই সেই কার্য্য সমাধা করিতে যাইতেছি। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?" আমি অকস্মাৎ এই অভূতপূর্ব্ব প্রস্তাবে বিচলিত হইয়া পড়ি কিন্তু তারপরেই বলিলাম "তোমরা কেন তাঁহাকে হত্যা করিবে? তিনি কি করিয়াছেন?" যুবকটী তখন বলিলেন "বানারিপাড়ায় তাঁহার গুর্খা সৈন্যেরা আমাদের স্ত্রীলোকদের মর্য্যাদা হানি করিতেছে; আমরা ইহার প্রতিশোধ লইতে চাই।" আমি বলিলাম "তোমরা জান যে তোমরা ধরা পড়িবে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" ইহার উত্তরে তাঁহারা বলিলেন "চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমরা স্ত্রীলোকদের মর্য্যাদার জন্য মৃত্যুকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

আমি মুস্কিলে পড়িলাম। ন্যায় বিচারে কোন প্রতিকার পাইবে না জানিয়া স্ত্রীলোকদের মর্য্যাদাহানির জন্য প্রতিহিংসা গ্রহনে দৃঢ়সংকল্প এই যুবক দুইটীকে কিভাবে তাহাদের উদ্দেশ্য হইতে নিরস্ত করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে একটী গুজব রটিয়াছিল যে স্যর বামফিল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller) পদত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাহাদের বলিলাম "তোমরা কি জান যে স্যর বামফিল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller) পদত্যাগ করিয়াছেন? মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া কি লাভ? পরন্তু তোমাদের

এই চেষ্টা জাতীয় কল্যানের পরিপন্থী হইবে। যদি তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় পদত্যাগ করিবেন না। ইহা কি দেশের মঙ্গলের কারণ হইবে ?”

আমার ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারা উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইবার মনস্থ করিলেন। আমি কিন্তু আমার পা স্পর্শ করাইয়া তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলাম। তাঁহারা বলিলেন যে সেই রাত্রেই রেলে তাঁহাদের যাইতে হইবে এবং সমস্ত আয়োজন বন্ধ করিতে হইবে কিন্তু ভাড়ার টাকা তাঁহাদের নিকট ছিল না। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দিলাম। তাঁহারা কে তখন আমি জানিতাম না—এখন পর্য্যন্ত জানি না কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল যে আমি তাঁহাদের বিশ্বাস করিতে পারি এবং যে অর্থ তাঁহারা লইয়াছিলেন তাহা ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনা হইতে বেশ বোঝা যায় যে বাঙ্গালাদেশের কতিপয় তরুণমনে অলক্ষ্যে কি ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। অরাজকতা কেহই পচ্ছন্দ করেন না। হত্যা যে উদ্দেশ্যেই সাধিত হউক না কেন কিংবা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন—সর্ব্বসময়েই ইহা এক গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নাই কিন্তু সেই সময়ে দেশের তরুণমনে যে অবিশ্বাস ও নিরাশার উদয় হইয়াছিল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের তাহা ভুলিলে চলিবে না।

উক্ত ঘটনার কিছু পরেই মেদিনীপুরের নিকট নরসিংগড়ে স্যর এণ্ড্রু ফ্রেসারের (Sir Andrew Fraser) রেল গাড়ি উড়াইবার চেষ্টা হয়। স্যর এণ্ড্রু ফ্রেসার (Sir Andrew Fraser) বাঙ্গালার ছোটলাট ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের অন্যতম উদ্যোক্তা বলিয়া অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশেই তাঁহার শাসন কার্য্যের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালার ছোটলাট হইবার পূর্ব্বে তিনি পুলিস কমিসনের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঠিক ঐ সময়েই মেদিনীপুর জিলা সম্মেলন পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা হয় এবং পণ্ডকারীদের মধ্যে কয়েকজন উক্ত সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের সহকারী বলিয়া সন্দেহ হয়। সম্মেলনের সভাপতি এবং মেদিনীপুরের জননায়ক কে, বি, দত্ত মহাশয় বক্তৃতার সময়ে বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমন্ত্রিত হইয়া তথায় আমি গিয়াছিলাম এবং ঐ অসাধারণ দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। দত্ত মহাশয় ও আমি চেষ্টা করিয়া অবশেষে সভার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত ঘটনা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। একমাস পরে সুরাট কংগ্রেসে যে অনুরূপ দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল তাহারই ইহা পূর্ব্বলক্ষণ। বৈধ উপায়ের প্রতি সাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়াছিল এবং উৎসাহী তরুণ দল নিরাশ হইয়া অবশেষে সন্ত্রাসবাদের বিপদসঙ্কুল আন্দোলনে আকৃষ্ট হইতেছিল।

এই উত্তেজনাপূণ আবহাওয়ার মধ্যে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। নাগপুর হইতে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন স্থানান্তরিত করিতে হয় কারণ উচ্ছৃঙ্খলতার এরূপ নিদর্শন দেখা যায় যে বোম্বায়ের নেতাগণ নাগপুরে অধিবেশন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। আমি যখন বক্তৃতা করিতে উঠি তখন শ্রোতৃবৃন্দের এক অংশ হইতে আপত্তিসূচক ধ্বনি উত্থিত হয়। মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতিরূপে স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করা আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল। আমার পক্ষে এরূপ অভিজ্ঞতা নূতন, কারণ যখনই আমি বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছি তখনই প্রথম আনন্দধ্বনির পর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত।

ঐ মহাসভায় একদল বালগঙ্গাধর তিলককে সভাপতি করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। স্যর রাসবিহারী সভাপতি হওয়া অপেক্ষা উক্তদল জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বন্ধ হওয়ার অধিক পক্ষপাতী ছিলেন এবং সত্যই সেবার অধিবেশন ঐ মনোভাবের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

স্যর ফিরোজসা মেটা এবং আর কয়েকজনের সহিত আমি পিছনের তাম্বুতে আসি এবং পুলিসকে ঘটনাস্থলে আসিতে হয়। এইরূপে ভারতের জাতীয় মহাসভার ইতিহাসে এক অধ্যায় শেষ হয়।

বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণ আমার প্রতি এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা একটী সভার আয়োজন করেন এবং তথায় আমার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বস্ততাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আরএকটী সভায় বহু আলোচনার পর যে প্রস্তাবটী গৃহীত হয় তাহাই পরে কংগ্রেসের মূল বিধিরূপে গণ্য হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্থির হয় যে বৈধ উপায়ে স্বায়ত্তশাসনই ভারতের জাতীয় মহাসভার লক্ষ্য। মহাসভার সদস্য হইবার পূর্ব্বে সকলকেই এই মূল বিধিটী স্বাক্ষর করিতে হইত। প্রথমে অনেক সদস্য ইহা স্বাক্ষর করিতে রাজি হন নাই কিন্তু পরে ১৯১৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সকল দল মিলিত হন। ঐ সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং উভয়ের নেতৃগণ কর্ত্তৃক দেশের রাজনৈতিক উন্নতির একটী ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ঐ যুক্ত অধিবেশনে আমি সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

জাতীয় দলের সমস্ত শাখা এক্ষণে মিলিত হইল এবং শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসের সহিত একযোগে কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু এই একতার আবহাওয়ার মধ্যেও বিভেদের অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল যখন ১৯১৪ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীমতী আনি বেশান্ত (Mrs Annie Besant) যোগদান করেন। তাঁহার বাগ্মিতা, ব্যক্তিত্ব, অদমনীয় উৎসাহ এবং গঠন শক্তি শীঘ্রই তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত করিয়াছিল। জাতীয় দলের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে যে মিলন সম্ভব হইয়াছিল তাহাতেও তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ভ্রমণ করিয়া সমস্ত নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতের জাতীয় মহাসভার বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠান হইতেছিল তখন তিনি হোমরুল লীগ্ Home Rule League (অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় মিলনকেন্দ্র) প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়া একটী সভা আহ্বান করেন। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় কার্য্য-কলাপের জন্য এই লীগের প্রস্তাব হইয়াছিল। আমি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। সে সময়ে সাধারণের ধারণা ছিল যে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। হোমরুল লীগ্ (Home Rule League) সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কিন্তু শ্রীমতী বেশান্ত উহার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন নাই এবং পরবর্ত্তীকালে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইহা সত্য যে জাতীয় দলের সমস্ত শাখা মিলিত হইবার পর এই লীগের প্রতিষ্ঠাই প্রথম কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। আমি

এবং আরও অনেক ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসের সভাপতি ইহাতে যোগদান করেন নাই এবং এজন্য আমি অনেকের অপ্রিয় হই। কিন্তু দেশের কল্যানের জন্য আমি আমার স্বর্গগত সহকর্ম্মীদের সহিত এই বিরাগ বরণ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই কারণ আমি জানি যে এই বিরাগ রাজনীতি ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী হয় না। ভারতের জাতীয় মহাসভা গঠনে আমি সাহায্য করিয়াছিলাম এবং এমন কোনরূপ কার্য্য আমার দ্বারা সম্ভবপর ছিল না যাহাদ্বারা জাতীয় মহাসভার মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল।

শ্রীমতী বেশান্তের অন্তরীণ হইবার পর হোমরুল লীগে যোগদানের জন্য আমাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হয়। আমি সেই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ প্রার্থী ছিলাম। লীগের সেক্রেটারি আমাকে জানান যে যদি আমি লীগে যোগদান করি তাহাহইলে আমাকে কলিকাতা শাখার সভাপতি করা হইবে এবং ব্যবস্থাপক সভায় আমার নির্ব্বাচনে কেহ প্রতিযোগিতা করিবেন না। কিন্তু আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি কখনও ভ্রূকুটিদ্বারা ভীত বা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হই নাই। যদিও ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁহার জনসেবামূলক কার্য্যের প্রশংসা করিতাম কিন্তু তথাপি তাঁহার অন্তরীণ হওয়ার পরেও আমি হোমরুল লীগে যোগদান করিতে পারি নাই। তাঁহার অন্তরীণের বিরুদ্ধে দুইটী প্রতিবাদ সভায় আমি সভাপতিত্ব করি এবং সরকারের উক্ত আদেশের প্রতিবাদ করি। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য যে আন্দোলন হয় তাহার মূল কারণ ছিল উক্ত আদেশ। জাতীয় দলের সদস্যগণের মধ্যে অনৈক্য দেখা যায় প্রথম হোমরুল লীগ সৃষ্টিতে ও দ্বিতীয়তঃ শ্রীমতী বেশান্তকে যখন সভাপতি করিবার আন্দোলন হয়।

শ্রীমতী বেশান্তের অন্তরীণ থাকিবার আদেশই নিস্ক্রিয় প্রতিরোধের আন্দোলনের সূত্রপাত করে। কে যে এই আন্দোলনের উদ্ভাবনা

করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বলা কঠিন। বোধ হয় ইহার ধারণা শ্রীযুক্ত গান্ধীর মস্তিস্কপ্রসূত। যাহা হউক, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুগণের এক সভায় এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তখন আমি রঁাচিতে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে বাঙ্গালার লোকেরা নিস্ক্রিয় প্রতিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিছুদিন পরে বোম্বাই নগরীতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তখন এই সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় আমি সভাপতিত্ব করি। একদল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধেব পক্ষপাতী ছিলেন বটে কিন্তু বাঙ্গালার রাজনৈতিকগণ ইহার বিরুদ্ধতা করেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া আমি ব্যাপারটী মুলতবি রাখিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতিতে পাঠাইবার জন্য প্রস্তাব করি।

প্রভাস চন্দ্র মিত্র মহাশয়কে উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনের ভার দেওয়া হইল। যখন শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রস্তাব করেন যে এই ব্যাপারটী আলোচনার জন্য একটী কমিটি গঠিত হউক তখন প্রভাস চন্দ্র তাঁহার প্রস্তাবটী উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইলেন। উক্ত প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করিলেন এবং এইরূপে ঐ গুরুতর ব্যাপারটীর মীমাংসা হইয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ কল্পে যে স্বদেশী আন্দোলন হয় সেই সম্পর্কে। আমরা উৎপীড়নের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এবং সেইজন্যই আমরা বুঝিয়াছিলাম যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বহু স্বদেশপ্রেমিকের প্রয়োজন যাঁহারা যে কোনও উৎপীড়ন সহ্য করিতে প্রস্তুত। দেশ তখন সেরূপ প্রস্তুত ছিল কি না তাহা আমরা জানিতাম না৷ বলিয়া উক্ত প্রস্তাব মুলতবি হওয়াতে আমরা সন্তুষ্ট হই কারণ আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ঘটনাচক্রে হয়তো আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের দরকার হইবে না।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালায় নিম্নোক্ত কারণে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি যে অন্যায় আদেশ দেওয়া হয়

তাহার প্রতিবাদকল্পে টাউন হলে কলিকাতার শেরিফের নেতৃত্বে একটী সভার উদ্যোগ হইতেছিল। উক্ত সভার দিন স্থির হইয়া গিয়াছিল এমন সময়ে হঠাৎ সরকার কর্ত্তৃক উহা নিষিদ্ধ হইল। এই নিষেধের কারণ স্বরূপ বলা হইল যে এক প্রদেশের সরকারের আদেশ অন্য প্রদেশের জনসাধারণ সমালোচনা করিতে পারেন না। কেহই এই হাস্যকর অজুহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। আমরা সে সময়ে বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একটী সভায় যোগ দিয়াছিলাম।

আমার কলিকাতায় ফিরিবার পর দিবস একটী সভার আয়োজন হয়। সভাস্থ সকলেই সরকারের আদেশের বিরুদ্ধতা করেন এবং সেজন্য কারাবরণ করিতেও প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানান। উত্তেজনা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে যদি সে সময় ঐ নিষিদ্ধ সভার অনুষ্ঠান হইত তাহা হইলে নিশ্চয় সভার অনুষ্ঠাতাগণের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ বাধিত। অবশেষে যথেষ্ট বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে আমাদের ছয় জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যে কার্য্যপন্থা ঠিক করিবেন তাহাই সকলে শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। স্যর রাসবিহারী ঘোষ, বাবু মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, ফজলুল হক ও আমি— এই ছয়জন বয়োবৃদ্ধের উপর উক্ত ভার ন্যস্ত হইল। আমরা প্রায় একঘণ্টা নিভৃতে আলোচনার পর ঠিক করিলাম যে আমরা ঢাকায় লর্ড রোণাল্ডসের (Lord Ronaldshay) সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহাকে সমস্ত বিষয়টী বুঝাইয়া উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিব। সরকার পক্ষকে প্রথমে একটী সুযোগ দান করা আমরা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলাম এবং আমাদের ঐ চেষ্টা বিফল হইলে আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আশ্রয় করতঃ নিষিদ্ধ সভার অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিলাম।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়া আমরা সভাস্থলে পুনঃ প্রবেশ করিলাম এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর আমাদের সিদ্ধান্ত বুঝাইবার ভার দেওয়া হইল। উত্তেজিত শ্রোতৃবৃন্দ আমাদের যুক্তি মানিতে

অস্বীকার করিল এবং আমাদের প্রতি বহু কটাক্ষ করিতে লাগিল, কারণ উপস্থিত অধিকাংশই নিষিদ্ধ সভার অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন। বিশেষ কোনও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া সভা ভঙ্গ হইল বটে কিন্তু আমরা সভার যথাযথ অনুমোদন ব্যতীতই ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাতের স্থির করিলাম।

লর্ড রোণাল্ডসে (Lord Ronaldshay) ভদ্রতার সহিত আমাদের এই আবেদন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, ফজলুল হক্, ডাক্তার নীলরতন সরকার, সুরেন্দ্রনাথ রায় এবং আমি—এই ছয়জন মিলিয়া সাক্ষাৎ করি এবং আমি ইহাদের মুখপাত্র স্বরূপ কথাবার্ত্তা পরিচালনা করি।

ছোটলাট বাহাদুর ঐ বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে এক প্রদেশের লোকেরা অন্য প্রদেশের সরকারের কার্য্যাবলির সমালোচনা করিতে পারিবে না বলিয়া যে ওজর দেখান হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। সভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিবার যথার্থ কারণ ছোটলাট বাহাদুর আমাদের নিকট সম্পূর্ণ সরলতার সহিত ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন যে হোমরুল লীগের এক সভায় (যে সভায় আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে আমি উপস্থিত ছিলাম না) বক্তাগণ যে ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা সরকার ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং টাউন হলে প্রস্তাবিত সভায় সেই সমস্ত বক্তাই বক্তৃতা করিবেন বলিয়া সরকার ইহা অনুমান করিতেছিলেন যে বক্তৃতার ভাষা পূর্ব্বের ন্যায় হইবে এবং তরুণ শ্রোতৃবৃন্দের মনে তাহা যে প্রভাব বিস্তার করিবে তাহার ফল খারাপ হইবে।

আমি বলিলাম যে যখন স্যর রাসবিহারী ঘোষ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন তখন ইহা প্রায় নিশ্চিত যে সভার কার্য্য আইন শৃঙ্খলা মানিয়া চালান হইবে। ছোটলাট বাহাদুর যখন বলিলেন যে

তিনি ইহা জানিতেন না তখন আমি বলিলাম যে উক্ত ব্যাপার সহজেই নির্দ্ধারণ করা যাইত। গভর্ণর বাহাদুর আমাদের বলিলেন যে উত্তেজনা ও বিদ্রোহপূর্ণ ভাষা যদি ব্যবহার করা না হয় এবং সভার কার্য্য ঠিকভাবে পরিচালনা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবেন। আমরা উত্তরে বলিলাম যে অঙ্গীকার না করিলেও আমরা গভর্ণর বাহাদুরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব এবং সর্ব্বসময়েই জনসভার অনুষ্ঠাতাগণ সভা নিয়মানুগতভাবে পরিচালনা করিবার যে অলিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহা এই সভার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই আলোচনার ফলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল।

সাফল্য লাভ সত্ত্বেও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে আমরা জনসাধারণের অনুমোদন লাভ করিতে পারিব না। আমাদের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং আমাদেরই একজন যিনি নিজে ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তিনিই ঐরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এ জগতে সাফল্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ায় আমরা যে আমাদের দাবী পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

টাউন হলে উক্ত নিষিদ্ধ সভার অধিবেশন হইল। জনসাধারণের সভা আহ্বান করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার এইভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। স্যর রাসবিহারীর অনুপস্থিতিতে আমাকে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিতে হয়। কেবলমাত্র আমিই ঐ সভায় বক্তৃতা করি এবং এই সুযোগে ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎকারের বিষয় বর্ণনা করি। আমার বিশ্বাস সকলেই আমার নিম্নোক্ত বক্তব্য অনুমোদন করিয়াছিলেন ঃ—

"যখন সভার অনুষ্ঠান নিষেধ করিয়া সরকার আদেশ দিয়াছিলেন তখন আমি এবং বন্ধুবর মতিলাল ঘোষ বোম্বাই নগরীতে অবস্থান

করিতেছিলাম। আমরা শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটী সভার আহ্বান করিলাম এবং ঢাকায় লর্ড রোনাল্ডসের (Lord Ronaldshay) সহিত সাক্ষাৎকার করিবার ঠিক হইল। এই সাক্ষাৎ-কারীগণ সকলেই দেশের সেবার জন্য বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং সেই হিসাবেই তাঁহারা এই প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। জনসেবা, নির্দ্দোষ উদ্দেশ্য ও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা সাধারণের বিশ্বাসভাজন—ইহাই আমাদের উক্ত অধিকারের প্রধান কারণ। সাক্ষাৎকারের সময় আমরা কোনও প্রতিশ্রুতি দিই নাই—তাহা চাওয়া হয় নাই। আমরা বলিয়াছিলাম যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমরা সভা পরিচালনা করিবার চেষ্টা করিব। এইরূপ প্রতিশ্রুতি সর্ব্বসময়েই জনসভার আহ্বায়কগণ দিয়া থাকেন এবং ইহাতে আমাদের কোনও অধিকার বা ন্যায়সঙ্গত দাবী ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমরা আমাদের বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলাম এবং ছোটলাট বাহাদুরও আমাদের নিবেদন সুপ্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হইয়াছিল এবং এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের সরকারের কার্য্যের আলোচনা করিতে পারিবে না বলিয়া যে ওজর প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহাই ঢাকায় আমরা করিয়া আসিয়াছি, আমাদের কার্য্যে আমরা লজ্জিত নই পরন্তু ইহা সমর্থন করি।"

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটী সঙ্কট এইভাবে আমরা পরিহার করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্টের সহিত সঙ্ঘর্ষে আমি কোন দিন ভীত হই নাই কিন্তু ইহাও ঠিক যে আমি ন্যায়সঙ্গত কারণ এবং প্রবল জনমত ব্যতীত ও সহ্যের অতিরিক্ত উৎপীড়নের আশঙ্কা থাকিলে সঙ্ঘর্ষ এড়াইবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে সহ্যাতীত অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিয়াছিল তাহার ফলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের গতি ব্যাহত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

বাঙ্গালায় সন্ত্রাসবাদ।

মেদিনীপুর সম্মেলন ও সুরাট কংগ্রেসে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উগ্রতা রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহারই ফলে সুরাট কংগ্রেস যখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তখন আমাদের জাতীয় জীবনের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি ব্যাহত করিয়া এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল। শীঘ্রই এই অশুভ সূচনার পরিণতি দেখা গিয়াছিল। ১৯০৮ খৃঃ ১লা এপ্রিল প্রাতঃকালে সমস্ত কলিকাতা নগরী পূর্ব্বরাত্রে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের সংবাদে স্তম্ভিত হইয়াছিল। মজঃফর-পুরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব মিষ্টার প্রিংঙ্গল কেনিডির **(Mr. Pringle Kennedy)** স্ত্রী ও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা ইহার ফলে নিহত হন।

অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে কংগ্রেসের অল্পসংখ্যক ইংরাজ শুভানু-ধ্যায়ীগণের অন্যতম ছিলেন এই প্রিংঙ্গল কেনিডি সাহেব এবং একবার বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। মজঃফর-পুরের জেলা জজ মিষ্টার কিংস্‌ফোর্ডকে মারিবার উদ্দেশ্যে এই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল কারণ তিনি কলিকাতায় প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌রূপে স্বদেশী মামলায় অনেক তরুণকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

কয়েকটী সম্ভ্রান্ত যুবককে শারীরিক দণ্ড দিয়া তিনি আরও ঘৃণার পাত্র হন। এই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইয়া ষড়যন্ত্র-কারীগণ ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির উপর কার্য্যের ভারার্পণ করে। ফলে দুইজনকেই জীবন হারাইতে হয়—একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অপরে আত্মহত্যা করেন। ইহার পরই মুরারীপুকুরের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং বিচারে বহু তরুণ নেতা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

সন্ত্রাসবাদের এই আবির্ভাবে আমলাতন্ত্র রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়ে এবং দমননীতির সাহায্যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা আরম্ভ করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হয় এবং সভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পুরাতন তিন রেগুলেসনের **(Regulation III of 1818)** সাহায্যে বহু মাননীয় নেতাকে অবরুদ্ধ করা হয়। ১৯০৮ খৃঃ একদিন প্রাতঃকালে সমগ্র বঙ্গদেশকে ক্ষুব্ধ করিয়া সংবাদ প্রচারিত হইল যে বরিশালের শ্রদ্ধেয় নেতা অশ্বিনী কুমার, ব্রহ্ম সমাজের পূজনীয় আচার্য্য কৃষ্ণকুমার, স্বদেশী কর্ম্মী সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং স্বদেশভক্ত সুবোধ মল্লিক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। আমাকেও অনুরূপ দণ্ড দিবার আদেশ হইয়াছিল কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে স্যর এড্ওয়ার্ড বেকারের **(Sir Edward Baker)** মধ্যস্থতায় তাহা বাতিল হইয়াছিল।

লর্ড মর্লির (Lord Morley) 'জীবন স্মৃতি' নামক পুস্তক হইতে বেশ বোঝা যায় যে এই দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ কোনওদিনই বিনাবিচারে দণ্ডদানের পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু অবস্থার চাপে ও আমলাতন্ত্রের স্থানীয় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের জিদে তাঁহাকে এই বিষয়ে রাজী হইতে হইলেও তিনি ন্যায়ও বিবেকের মর্য্যাদায় যে রক্ষাকবচদ্বারা এই বিষয়টী আবৃত রাখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বোধহয় সব সময়ে ব্যবহৃত হয় নাই। ১৯০৮ খৃঃ ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি লর্ড মিণ্টোকে (Lord Minto) পত্রে লিখিয়াছিলেন "অপরাধীর অসাক্ষাতে যে কোনও ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের কার্য্য না হয় দেখিবেন। যতই আমরা ইহার স্বপক্ষে বলি না কেন এইরূপ বিচারের মধ্যে অষ্ট্রীয়া, রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে অনুসৃত নীতির গন্ধ পাওয়া যায়"।

১৯১৮ খৃঃ ১৯শে মার্চ্চ কেন্দ্রীয় আইন সভায় আমি যখন পরামর্শ-দানের জন্য একটী কমিটী নিয়োগের (Advisory Committee) প্রস্তাব উত্থাপন করি তখন লর্ড মর্লির উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া আমি ভারত-

সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে লর্ড মর্লির উক্ত উপদেশ তিন আইনের বন্দীগণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় কি না। এই প্রশ্নের কোনও উত্তর আমি পাই নাই, বোধ হয় উক্ত উপদেশ অনুসৃত হইত না বলিয়াই কোনও উত্তর দেওয়া হয় নাই।

১৯০৮ খৃঃ ২৩শে আগষ্ট লর্ড মর্লি কোনও এংলোইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম তিনি নিশ্চয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন যে কোনও ব্যক্তির রাজনৈতিক কার্য্যের ফলে অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যখন সুদৃঢ় কারণ ঘটে তখনই কেবল সেই ব্যক্তিকে তিন আইনে বন্দী করা হইবে।" লর্ড মর্লির এই উপদেশও অনুসৃত হয় নাই কারণ তাহা হইলে কৃষ্ণ কুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিগণকে দণ্ডিত হইতে হইত না। ইহারা সকলে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিক ছিলেন এবং সর্ব্বসময়েই নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা ইঁহাদের অবিচলিত ছিল।

স্বভাবতঃ লর্ড মর্লি দমননীতির বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু অবস্থার চাপে তাঁহাকে সময়ে সময়ে ইহার অনুমোদন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের যথার্থ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন কেন এ দেশের হৃদয় বিপ্লবের পক্ষপাতী না হইয়াও বিপ্লবকে বরণ করিয়াছিল। দেশের শাসনব্যবস্থার ত্রুটীর জন্যই বিপ্লবের প্রসার ঘটিতেছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই শাসনবিধি যাহাতে দেশীয় নেতাদের নিকট গ্রহণীয় হয় তজ্জন্য সংস্কারের মনোযোগী হন।

যিনিই এই শাসন সংস্কারের প্রধান উদ্যোক্তা হউন না কেন, ইহা সত্য যে লর্ড মর্লি (Lord Morley) ইহার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং তিনি লর্ড মিণ্টোকে এ বিষয়ে বিলম্ব করিতে নিষেধ করেন। লর্ড

মিণ্টোকে লিখিত তাঁহার প্রত্যেক পত্রে দূরদর্শী রাজনীতিকের উৎসাহ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। লর্ড মিণ্টো (Lord Minto) এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন। বড়লাটের ও প্রাদেশিক কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় ভারতীয় সদস্যের মনোনয়ন ও বিলাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের পরিকল্পনা লর্ড মর্লির মস্তিস্কপ্রসূত।

রিপণের ন্যায় ভারতবন্ধুও এ বিষয়ে মর্লির সহিত একমত হইতে পারেন নাই এবং এডওয়ার্ডের ন্যায় সহানুভূতিসম্পন্ন সম্রাট এই নূতন সংস্কারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হন। কিন্তু লর্ড মর্লি এই সংস্কার সম্বন্ধে ও লর্ড কিচেনারকে (Lord Kitchener) বড়লাট পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবের প্রতিদ্বন্দিতায় বিশেষ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মর্লি মিণ্টো প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্কার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্য মাত্র অগ্রগতি আনিয়াছিল। কেহই ইহাতে অসামান্য কিছু দেখে নাই কারণ ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল যে ইহা বেসরকারী সদস্যদের জনস্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা দিয়াছিল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন নূতন ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্ত্তন হইল তখন ইহার প্রথম সভায় বড়লাট বাহাদুর ঘোষণা করিলেন যে তিন আইনের (Regulation III) বন্দীদের আবদ্ধ রাখিবার কোন হেতু নাই এবং তাহাদের শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হইবে। বাস্তবিক কৃষ্ণকুমার ও অশ্বিনী কুমারের ন্যায় ব্যক্তির কারাদণ্ড আমলাতন্ত্রের এক বিরাট ভুল ব্যতীত কিছুই নয়। ১৯০৯ সালে গ্রীষ্মকালে যখন ইণ্ডিয়া আফিসে আমার সহিত লর্ড মর্লির সাক্ষাৎ হয় তখন কৃষ্ণ কুমার মিত্র ও অশ্বিনী কুমার দত্তের মুক্তির জন্য আমি বিশেষভাবে বলিয়াছিলাম। যদিও ঐ সময় উক্তবিষয় আলোচনার উপযুক্ত ছিল না তথাপি লর্ড মর্লি আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঠিক ঐ সময়েই স্যর

ইউলিয়ম কার্জ্জন উইলি (Sir William Curzon Wyllie) নিহত হন এবং সেইজন্য ঐ সময় সমস্ত বিলাতে রাজনৈতিক অপরাধীগণের বিরুদ্ধে এক সন্দেহজনক মনোভাব বিদ্যমান ছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত শাসনবিধি অনুযায়ী কোন পদচ্যুত সরকারী কর্ম্মচারী ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য পদ প্রার্থী হইতে পারিতেন না যদিও পূর্ব্বের শাসনব্যবস্থায় এ নিয়ম ছিল না। নূতন নিয়মানুসারে আমি প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিতাম না। স্যর এডওয়ার্ড বেকার (Sir Edward Baker) সে সময় বাঙ্গালার ছোটলাট। তিনি আমাকে বিশেষভাবে জানিতেন কারণ অনেকদিন আমরা একত্রে কার্য্য করিয়াছিলাম এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি স্বেচ্ছায় আমার সম্বন্ধে নির্ব্বাচনের প্রতিবন্ধক দূর করিয়া সরকারের আদেশের একখানি প্রতিলিপি আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ইহাতে আমি এক মুস্কিলে পড়িলাম কারণ আমি পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে বঙ্গবিচ্ছেদ রদ না হইলে আমি আইন সভায় প্রবেশ করিব না। নূতন আইন সভার সম্বন্ধেও বাঙ্গালার নেতৃস্থানীয় সকলকেই বলিয়াছিলাম যে যতক্ষণ বঙ্গভঙ্গ রহিত না হয় ততক্ষণ আমরা কিছুই করিব না। আমি মনে করিতাম যে এই নূতন আইন সভায় যোগদান না করিয়া আমরা আরও ভালভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারিব। সকলে এই অসহযোগ শুভদৃষ্টিতে না দেখিলেও আমি এসম্বন্ধে আমার দৃঢ় মত জানাইয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে স্যর এডওয়ার্ড বেকারের ন্যায় উদার বন্ধুর আহ্বান উপেক্ষা করাও কষ্টকর হইল কারণ তাঁহার ন্যায় মহৎ উদারস্বভাব ও সহৃদয় বন্ধুর সহিত একযোগে কার্য্য করা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া আমি মনে করিতাম।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের

পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। সকলেই আমাকে আইন সভায় সদস্য-পদপ্রার্থী হইতে নিষেধ করিলেন কারণ তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ পশ্চিম বঙ্গের নেতাদের প্রতি আস্থা হারাইত এবং তাহাতে বঙ্গভঙ্গরহিত করিবার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন হইতেছিল তাহা ব্যাহত হইত।

মডারেট্ পার্টির আরও অনেক বিশিষ্ট সদস্য রেগুলেসানের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে অপারগ ছিলেন। সেই সমস্ত বন্ধু ও সহকর্ম্মী-দের ছাড়িয়া আমি একলা নূতন সভায় প্রবেশ করা অসম্ভব মনে করিয়াছিলাম। সেইজন্য দলের মতানুযায়ী আমি আমার বন্ধু বেকারের আহ্বান বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিলাম যদিও ইহাতে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমার বিলাত গমন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিলাতে ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে সাংবাদিকগণ এই কন্‌ফারেন্সে মিলিত হইবার জন্য আমন্ত্রিত হন। এই আমন্ত্রণে আমি সম্মানিত বোধ করিলেও বিলাত গমন তখন আমার পক্ষে অসুবিধা ছিল কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুযায়ী রিপনকলেজের পরিচালনা ব্যবস্থা সেই সময় ঠিক হইতেছিল। সবে মাত্র সেই সময়ে এই কলেজের আইনবিভাগ সংক্রান্ত ব্যাপার লইরা একটী মিটমাট হইয়াছিল। তখনও বিপদ সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই বলিয়া আমি স্যর এডওয়ার্ড বেকারের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমাকে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিলেন এবং আমার অনুপস্থিতিতে কলেজের কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া আশ্বাস দান করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্‌চেন্সেলার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে অনুরূপ ভরসা দিয়াছিলেন। এইরূপে আশ্বাস লাভ করিবার পর আমি মে মাসের মাঝামাঝি বিলাতযাত্রা করিয়াছিলাম।

জীবনে বহুস্থানে ভ্রমণ করিতে হইলেও আমি গৃহ ছাড়িয়া দূরদেশে থাকিতে কখনই ভালবাসিতাম না। গৃহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চিরকাল আমার আকর্ষণ ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন আমি বিলাতে ওয়েল্‌বি কমিশনে (Welby Commission) সাক্ষ্য দিতে যাই তখন সভাপতি লর্ড ওয়েল্‌বিকে (Lord Welby) সত্বর আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মহারাণীর হীরক জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমার সহকর্ম্মীগণ বিলাতে থাকিলেও আমি সত্বর গৃহে

ফিরিয়া আসিয়াছিলাম কারণ আড়ম্বর ও সমারোহ আমার চিত্তকে কোনওদিন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। আমি আমার গৃহে ফিরিয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিয়া সুখী হইয়াছিলাম।

১৫ই মে যাত্রা করিয়া ৩রা জুন আমি বিলাতে পৌছাইয়াছিলাম। প্রায় মধ্যরাত্রে যখন ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে রেলগাড়ি প্রবেশ করিল তখন বন্ধুবর মিষ্টার কটন্ (Mr. H. E. A. Cotton) আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি মোটরে করিয়া আমাকে ওয়ালর্ডফ হোটেলে লইয়া গেলেন কারণ ঐ স্থানেই সাংবাদিকগণ সমবেত হইয়াছিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হইলে ডেলি টেলিগ্রাফ্ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী অশীতিবর্ষীয় লর্ড বার্ণহাম্ (Lord Burnham) এবং তদানীন্তন জীবিত ইংরাজ বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লর্ড রোসবেরি (Lord Rosebery) সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

৭ই জুন সম্মেলনের প্রথম সভানুষ্ঠানে টেলিগ্রাফ মাশুল কমাইবার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থার উন্নতিবিধান ও ইহার খরচ কমাইবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছিল এবং এতদুদ্দেশ্যে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। আমি উক্ত প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলাম যে ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের সংবাদসমূহ যথাযথভাবে বিলাতের জনসাধারণ জ্ঞাত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সংবাদপত্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনা প্রধানতঃ সামুদ্রিক রক্ষা সম্বন্ধেই হয়। কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির একটী সভায় যাইব বলিয়া আমি উক্ত সভা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম এমন সময়ে অকস্মাৎ বিনা কারণে লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) এরূপ একটী মন্তব্য

করিয়া বসিলেন যে আমি তাহাতে মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি বলিলেন যে কোনও কোনও ভারতীয় সংবাদপত্রের দায়িত্বশূন্য মন্তব্যদ্বারা ভারতের সাম্প্রতিক বিপ্লব পুষ্ট হইতেছিল বলিয়া তিনি মনে করেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীর একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া এই মন্তব্য আমাকে বিশেষভাবে মর্ম্মাহত করিয়াছিল এবং মৌন থাকা আমি কোনওরূপে যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই কারণ তাহা হইলে ঐ দোষারোপ মানিয়া লওয়া হইত। আমি যে ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"সম্মেলনের বর্ত্তমান আলোচনায় আমাকে কয়েকটী অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করিতে হইতেছে বলিয়া আমি দুঃখিত কিন্তু লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) আমাদের নিকট এই বিষয়টীর অবতারণা করিয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে বাঙ্গালা দেশে সম্প্রতি যে বিদ্রোহ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে তাহার জন্য একদল সংবাদপত্রের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য উক্তি দায়ী কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি দৃঢ়ভাবে 'না' বলিব। সত্য বটে ভারতীয় সংবাদপত্রে যাহা বলা হয় সমস্তই আমি সমর্থন করিতেছি না। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে যে সমস্ত সাংবাদিক আসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের পরিচালিত সংবাদপত্রে লিখিত সমস্ত গুরুতর বিষয়গুলি সমর্থন করেন কি না আমি জানি না। আমরা কি অভ্রান্ত? কখনই নয়। ভ্রান্তি এবং বিশেষ ভ্রান্তিও সময়ে সময়ে আমরা করিয়া থাকি। সেইজন্য আমি প্রথমেই বলিতে চাই যে দুর্ভাগ্যক্রমে যে দায়িত্বশূন্য মন্তব্য ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমি সমর্থন করিতেছি না কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে সেইরূপ সংবাদপত্র অতি অল্প—তাহাদের প্রচার সামান্য এবং জনসাধারণের উপর তাহাদের প্রভাবও নগণ্য। আমাকে আপনারা যেন ভুল বুঝিবেন না কারণ বাঙ্গালাদেশে আধুনিক সময়ে যে সমস্ত অরাজকতার ঘটনা দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটিয়াছে সে গুলি আমি সমর্থন করি না। বাঙ্গালার তথা ভারতের শুভবুদ্ধির প্রতিধ্বনি করিয়া আমি বলিতেছি যে আমরা

সকলেই ঐ সমস্ত ঘটনার জন্য দুঃখিত (আনন্দধ্বনি)। আমি এবং আমার ভারতীয় সহকর্ম্মীগণ সকলেই সংবাদপত্রে ইহার তীব্র নিন্দা করিয়াছি। বিপ্লবের এই মনোভাব কিছুতেই সেই সুদৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না যাহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব। অরাজকতা প্রাচ্যের নহে—ইহা পাশ্চাত্যের। পাশ্চাত্য হইতে এই বিষবৃক্ষ প্রাচ্যে রোপিত হইয়াছে বটে কিন্তু আমরা আশা করি যে লর্ড মর্লির (Lord Morley) প্রসন্ন ব্যবহারে শীঘ্রই প্রাচ্যে ইহার অস্তিত্ব নষ্ট হইবে। এই অশুভ আন্দোলনের পরিপুষ্টির কারণ-গুলি আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলেও এই সভা রাজনৈতিক সভা নয় বলিয়া সে ইচ্ছা আমি দমন করিতেছি ও প্রাচ্যের সংযম অবলম্বন করিতেছি (আনন্দধ্বনি)। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রকে আমরা ব্রিটিশ রাজত্বের একটী প্রধান দান বলিয়া মনে করি। রাজনৈতিক কারণেই কেবল ইহা আমাদের দেওয়া হয় নাই পরন্তু জ্ঞান ও তথ্য প্রচারের জন্য ইহা প্রদান করা হইয়াছিল। অন্ততঃ ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ধারকর্ত্তার মনে ইহাই আশা ছিল। লর্ড মেটকাফ্ (Lord Metcalfe) এক সময়ে বলিয়াছিলেন "আমরা কেবল ভারতবর্ষে শান্তি রক্ষা, কর-সংগ্রহ ও ঘাট্‌তি পূরণ করিতেই আসি নাই; ইহা ব্যতীত এক মহত্তর উদ্দেশ্যও আমাদের আছে—তাহা হইতেছে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকীরণ।" আমার দেশবাসীর তরফ হইতে আমি ইহাই বলিতে চাই যে আমরা এই দানের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছি (আনন্দধ্বনি)।

সভায় আমার এই বক্তৃতার কি ফল হইল তাহা আমার নিজের পক্ষে বলা সঙ্গত নয়। যখন আমি বলিয়াছিলাম যে আমি রাজনৈতিক বিতর্কে প্রবেশ করিব না পরন্তু প্রাচ্যের সংযম অবলম্বন করিব তখন সমস্ত সভাস্থল হইতে প্রশংসাসূচক ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। Sir Hugh Graham বলিয়াছিলেন যে ইহা এক আদর্শ বক্তৃতা।"

আমাদের কার্য্যসূচি অনুযায়ী প্রত্যহ সভানুষ্ঠান হইত এবং তাহা ব্যতীত ভোজের মজলিসও হইত। এইরূপে আমোদ আহ্লাদের দ্বারা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যধারা অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন ইংরাজচরিত্রের বিশেষত্ব নয় কিন্তু তাহারা সত্যই আতিথ্যপরায়ণ এবং তাহারা তাহাদের আন্তরিকতা অভ্রান্তরূপে প্রকাশ করিতে জানে। সেফিল্ড (Sheffield) নামক স্থানে আমাদের প্রত্যেককে ঐস্থানের বিখ্যাত ছুরী একখানি করিয়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল এবং ডেম্পষ্টারে (Dempster) মোটর কারখানা পরিদর্শনের পর ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একখানি করিয়া সুন্দর পকেটবই পাইয়াছিলাম।

বার বৎসর পরে বিলাত গিয়া আমি কয়েকটী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মদ্যাদির সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন ও নিরামিষ আহারের প্রচলন ক্রমে ক্রমে হইতেছিল এবং পরোক্ষভাবে ইহার প্রভাব মাংসাহার ও মদ্যপানের উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছিল।

সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে লর্ড মর্লি (Lord Morley) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল 'সংবাদপত্র ও সাহিত্যসেবা।' ঐ সভায় আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং পার্লামেণ্টের সদস্য মিষ্টার টি, পি, ও-কোনার (Mr. T. P. O'Connor) আমার পরে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া আমার বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতেই বোধহয় মর্লি সাহেব সাহিত্যকে কলা এবং সংবাদপত্রসেবাকে ব্যবসায় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আমরা অল্ডারসটে (Aldershot) নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম এবং তথায় চৌদ্দহাজার সৈন্য পরিদর্শন করিয়াছিলাম। এইস্থানেই লর্ড হ্যালডনের (Lord Haldane) সহিত আমার পরিচয় হয়; তিনি তখন সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ওয়ার (Secretary of State for War) এবং সংবাদপত্র সম্মেলনের প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা

করিবার জন্য লণ্ডন হইতে আসিয়াছিলেন। অল্প কথাবার্ত্তার মধ্যে আমি তাঁহাকে বঙ্গবিচ্ছেদ এবং ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনিয়া শেষে বলিয়াছিলেন "মর্লি এই ব্যবস্থা বাতিল করিতেছেন না কেন?" বাস্তবিক ঐ সময়ে আমি যে সকল বিশিষ্ট ইংরাজ রাজনৈতিকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম সকলেরই এই এক মনোভাবের পরিচয় পাই।

লণ্ডনে আমাদের কার্য্য শেষ হইলে আমরা ১৪ই জুন ভ্রমণে বাহির হই। স্পেশ্যাল ট্রেনে আমরা কভেন্ট্রি (Coventry) নামক স্থানে যাই এবং তথায় মোটর কারখানা পরিদর্শন করি। তৎপরে মোটরে করিয়া আমরা ওয়ারউইক্ প্রাসাদে (Warwick Castle) গমন করি। সেখানকার Earl এবং তাঁহার পত্নী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। Countess একটী ক্ষুদ্র কিন্তু মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দ্বারা আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে আমরা যেখানে বসিয়া ভোজন করিতেছিলাম ঠিক সেইখানেই ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত সেই বিশাল কক্ষ ছিল যেখানে বসিয়া ব্যারণগণ তাঁহাদের স্বনামধন্য নেতা Warwick the King-maker এর নেতৃত্বে সামরিক অভিযানে বাহির হইবার পূর্ব্বে আলোচনা করিতেন।

ওয়ারউইক্ প্রাসাদ হইতে আমরা মোটরযোগে অক্সফোর্ডে যাই। পথে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড অন্ এভোন্ (Stratford-on-Avon) নামক স্থানে অবতরণ করিয়া সেক্সপীয়ারের (Shakespeare) জন্মস্থান পরিদর্শন করি। আমরা এই স্থানটী তীর্থের ন্যায় দেখিয়াছিলাম। ৪০বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭১ খৃঃ যখন লণ্ডনে ছাত্ররূপে ছিলাম তখনই আমি কবির গৃহ ও স্মারকচিহ্নগুলি, তিনি যে কক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কক্ষটী, কবিবর বায়রণ (Byron) ও প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের লিপি প্রভৃতি দেখিয়াছিলাম। কবির একখানি অয়েলপেণ্টিং ব্যতীত নূতন

কিছুই দেখিলাম না। ঐ স্থানে একটী Shakespeare Theatre প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিলাম। ঐ গৃহে মেয়র তাঁহার বিশেষ পোষাক পরিধান করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করেন এবং আমাদের মধ্যে একজন প্রতিনিধি তাঁহার অভ্যর্থনার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

ইংরাজ জাতি তাঁহাদের মৃত মনীষীদের স্মৃতি রক্ষা বিষয়ে কত সচেতন! জীবদ্দশায় কবিবর অমরতা লাভ করেন নাই কিন্তু তথাপি তাঁহার সমসাময়িকগণ কি নিষ্ঠার সহিত তাঁহার স্মৃতিচিহ্নগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন! ভারতবর্ষে ইহার বিপরীত! আমরা মৃত্তিকার দেবদেবীর মধ্যে শ্রীভগবানকে দেখিতে পাই কিন্তু যে জীবন্ত দেবতারা আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আমাদের ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যান তাঁহাদের প্রতি আমাদের সমাদরের একান্ত অভাব। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা তাঁহাদের নির্য্যাতন করিতে কুণ্ঠিত হই না এবং স্বদেশপ্রীতি ও পবিত্র ধর্ম্মের নামে স্বীয় বিদ্বেষ গোপন করিতে চেষ্টা করি। মহাত্মা রামমোহন আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুর সহিত যখন ব্যক্তিগত দ্বেষ ও হিংসা অন্তর্হিত হইল তখনই বিচার বুদ্ধির দ্বারা আমরা তাঁহার মহৎ দানের যথার্থ পরিচয় পাইয়া তাঁহার জন্মস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ তুলিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। যে জাতি প্রতিভার পূজা করিতে জানে না সে জাতির মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর আবির্ভাবও হয় না।

সেই গোধূলির অন্ধকারে আমরা কবির জন্মস্থান হইতে অক্সফোর্ডের দিকে অগ্রসর হইলাম। রাত্রি আগতপ্রায়, তখন সকলেই সুপ্তির শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র। আমরাও ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম এবং সেইজন্য হোটেলের নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামের আয়োজন করিলাম। পরদিনের কার্য্যসূচি নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্যর হেনরী ব্রিটেন্ (Sir Henry Brittain) আমাদের চালক, বন্ধু ও উপদেশকরূপে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় দক্ষ

ব্যবস্থাপক আর আমি দেখি নাই। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমের পরও তাঁহার মুখে কেহ ক্লান্তির রেখা দেখিতে পাইত না। সাংবাদিক সম্মেলনের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করেন। ইহার পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, ইহার সম্পাদনও তিনিই করেন।

আমাদের কার্য্যসূচি অনুযায়ী পরদিন আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের হোটেলের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত নিউ কলেজ (New College) প্রথম পরিদর্শন করি। আমরা কলেজ ভবনের প্রত্যেক অংশ দেখিয়াছিলাম। বাস্তবিক আমার ন্যায় ভারতীয় শিক্ষাবিদের নিকট তথায় ধূমপান প্রকোষ্ঠ ও মদ্যভাণ্ডারের দৃশ্য পীড়াদায়ক হইয়াছিল। হয়ত ইহাতে নীতিদুষ্ট কিছুই নাই কিন্তু আমাদের শিক্ষার আদর্শ প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কঠোরতা ও তপস্বীসুলভ সংযমের অনুকূল। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি দারিদ্র্য, পবিত্রতা ও পার্থিব ভোগে সম্পূর্ণ অনাসক্তিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

জীবনে কখনও আমি ধূমপান করি নাই। প্রায়ই আমার বন্ধু স্বর্গীয় টার্ণবুল সাহেব (Mr Turnbull) তাঁহার সহিত ধূমপান করিতে বলিতেন কিন্তু কখনও তিনি সফল হন নাই। অবশেষে তিনি এক কৌশল করিয়া প্যারী প্রদর্শনী হইতে ক্রীত একটী সুন্দর সিগারেটদানি আমাকে উপঢৌকন দিলেন। তাঁহার ন্যায় সদাশয় বন্ধুর দান আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না এবং ঐ সিগারেটদানিটী পাইয়া ধূমপান আরম্ভ করিলাম। কিন্তু তিন চার দিনের অধিক ধূমপান আমি সহ্য করিতে পারি নাই কারণ প্রতি লোমকুপ হইতে যেন আমি তাম্রকূটের তীব্র গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলাম। সিগারেটদানিটী পরিত্যাগ করিলাম এবং পরে আমার একটী ভৃত্য ঐটী চুরি করিয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

অক্সফোর্ডে অল্ সোলস্ কলেজের (All Soul's College) লাইব্রেরী প্রকোষ্ঠে আমাদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। বিশ্ব-

বিশ্বালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সলর লর্ড কার্জ্জন (Lord Curzon) কলেজের উদ্যানে আমাদের অভ্যর্থনা করেন। অক্সফোর্ড হইতে আমরা সেফিল্ড যাই। সেখানকার মেয়র মহোদয় আমাদের আপ্যায়িত করেন ও বিখ্যাত অস্ত্রপ্রস্তুতকারক মেসার্স ভিকার্স, মাক্সিম এণ্ড কোম্পানির (Messrs Vickers, Maxim & Co.) বিরাট কারখানা দেখান্।

১৮ই জুন আমরা ম্যান্‌চেষ্টার পৌঁছাই। হোটেলের প্রবেশদ্বারে উত্তর ভারতের অধিবাসী মিষ্টার ডিউব্ (Mr. Dube) প্রমুখ আমার কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা যখন আমাকে মাল্য বিভূষিত করেন তখন সম্মেলনের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ কৌতুহল বোধ করিয়াছিলেন।

ম্যান্‌চেষ্টার সহরে লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে যে ভোজসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে আমি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন লাভের আকাঙ্খাই সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের সংযোগ সূত্র হইবে এবং সম্মিলিত ভারতের সহযোগই সাম্রাজ্যের প্রবল শত্রুরও ভীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। বক্তৃতার শেষভাগে আমি বলিয়াছিলাম ঃ—

"স্বরাষ্ট্র শাসনে অধিকারী, উন্নতিশীল ও সুখী ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের একটী মূল্যবান সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্নঅংশ সমান শাসনাধিকার লাভকরতঃ যখন একত্রিত হইবে তখন তাহার প্রবলতম শত্রুও তাহাকে আঘাত করিতে সঙ্কুচিত হইবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যে সমস্ত শক্তি নৈতিক আদর্শ লঙ্ঘন করিয়া পশুবলের উপর আস্থাবান তাহারা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নষ্ট হইতে বাধ্য কিন্তু নৈতিক আদর্শে একাঙ্গীভূত হইলে এই বিশাল সাম্রাজ্য ঐরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে সমর্থ হইবে।"

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক প্রবল শত্রু দাঁড়াইয়াছিল তখন আমাদের

শাসকবর্গ বুঝিয়াছিলেন যে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র পরিচালিত ও পরিতুষ্ট ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের কত বড় সম্পদ। যদি এই সত্য পূর্ব্বে উপলব্ধি হইত তাহা হইলে সাম্রাজ্যের সেবায় আরও শক্তি ও সম্পদ ভারতবর্ষ নিয়োজিত করিতে পারিত।

শ্রোতৃবৃন্দ আমার পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার পাশেই সংবাদপত্রের একজন প্রতিনিধি বসিয়াছিলেন। আমি যখন বক্তৃতা অন্তে আসন গ্রহণ করিলাম তখন তিনি বলিয়াছিলেন "মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, আপনার ন্যায় দুইশত ব্যক্তি যদি ভারতবর্ষে থাকেন তাহা হইলে আগামী কল্যই স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করা উচিত।" আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম যে "দুইশতের দ্বিগুণ আমার ন্যায় ব্যক্তি ভারতবর্ষে আছেন"। অনুষ্ঠান অন্তে যখন আমি চলিয়া আসিতেছিলাম তখন ঐ টাউন হলের রক্ষক মহাশয় আমার নিকট আসিয়া একটী পুস্তকে আমার নাম লিখিতে অনুরোধ করেন। যখন আমি আমার নাম লিখিতেছিলাম তখন তিনি বলেন "মহাশয়, আমি বলিতে পারি যে হলটীর প্রতিষ্ঠাদিবস হইতে এরূপ বক্তৃতা কেহ করেন নাই।"

ম্যান্‌চেষ্টারের সংবাদপত্র সমূহের প্রতিনিধিগণ সকলেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমার বক্তৃতার সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়াছিলেন। এমন কি রক্ষণশীলদলের মুখপত্র ও ভারতের আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশূন্য ম্যান্‌চেষ্টার কুরিয়ার (Manchester Courier) নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছিল "সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের ম্যান্‌চেষ্টার নগরী পরিদর্শন এক নাটকীয় ব্যাপারের ন্যায়। . . . . যে সমস্ত নাগরিকগণ লর্ড মেয়র কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া অতিথিগণের অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই উক্ত বক্তৃতা দ্বারা অভিভূত হন। জন্মগত বক্তার ভাবপ্রবণতা ও স্বচ্ছন্দতার সহিত একজন ভারতীয়কে অনর্গল বিদেশীভাষায় বক্তৃতা করিতে দেখিবার সুযোগ জীবনে একবারই ঘটে।"

যখন আমি সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিরূপে বিলাত গমন করিয়াছিলাম তখন বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত করিবার উদ্দেশ্যে আমার দায়িত্ব ভুলি নাই। বিলাতে আসিবার প্রাক্কালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান্ আমার সম্মানার্থ যে সান্ধ্যসভার আয়োজন করেন তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে সাংবাদিক সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে আমার কর্ত্তব্যের পরই বঙ্গ-বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমি অবহিত হইব। এক্ষণে আমি সেই কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ বিলাতে কার্য্য সমাপনান্তে স্কটলণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ক্লিমেণ্টস্ ইন্ (Clement's Inn) নামক স্থানে কয়েকখানি ঘর লইলাম।

মিষ্টার পারেখের (Mr. Parekh) সভাপতিত্বে ভারতীয়গণের এক সমিতি আমার সম্মানার্থে যে ভোজসভার আয়োজন করেন তথায় আমি প্রথম বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্যালেস হোটেলে Westminister Palace Hotel) এই অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হয় এবং স্যর হেনরি কটন্ (Sir Henry Cotton), মিষ্টার মাকারনেস্, মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি বিলাতের মহাসভার বহু সদস্য এই সভায় যোগদান করেন।

রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য দমননীতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে এক বিশিষ্ট প্রতিবাদের সুর ঐ সভায় শুনা যায়। বিচার ব্যতীত শাস্তিদান, তাহা যতই অল্প হউক না কেন, ইংরাজ ঘৃণা করে। লর্ড মর্লি যদিও অবস্থার চাপে রাজনৈতিক অপরাধীগণের নির্ব্বাসন ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার Recollections নামক পুস্তক হইতে বেশ বোঝা যায় যে তিনি ইহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমার বক্তৃতায় উক্ত দমননীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম "বিফলতার এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে দমননীতি কবে সফল হইয়াছে?"

আমার পর স্যর হেনরী কটন্ বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন যে ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিতে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান অমূল্য। ভায়তবর্ষের বিশিষ্ট বন্ধু মিষ্টার হার্ডি (Mr. Keir Hardie) বলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব তাঁহার প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা বিরাট। এরূপ ভারতীয়ের সংখ্যা অত্যল্প। মিষ্টার মাকারনেস্ বলেন যে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা কেবল বাগ্মিতার দিক হইতেই শ্রেষ্ঠ নয় পরন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিকের উপযুক্ত। মিষ্টার সুইফ্ট ম্যাকনীল (Mr Swift McNeill) সর্ব্বশেষ বক্তৃতা করেন। তিনি মহাসভার একজন আইরিশ সদস্য ছিলেন এবং ভারতের আশা আকাঙ্খার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "ভারতীয়গণ সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় নেতা-লাভে সত্যই সুখী। আমি বহু বক্তৃতা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি কিন্তু অদ্য সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যে প্রতিভার পরিচয় পাইলাম তাহা আমাকে যেরূপ মুগ্ধ করিয়াছে সেরূপ আর পূর্ব্বে হয় নাই"।

ইহার পর স্যর উইলিয়াম্ ওয়েডারবার্ণ (Sir William Wedder-burn) এক প্রাতর্ভোজের আয়োজন করেন। মহাসভার বহু সদস্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্যর উইলিয়াম আজ আর ইহজগতে নাই। মিষ্টার এলেন হিউম্ (Mr. Allen Hume), স্যর হেনরি কটন্ (Sir Henry Cotton) এবং স্যর উইলিয়াম্ ওয়েডারবার্ণ (ir Wil iam Wedderburn ভারতবর্ষের যথার্থ বন্ধু ছিলেন। তাহাদের তিরোধানে ভারতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হওয়া শক্ত। দেশের এই বিপদের দিনে তাঁহাদের উপদেশ সত্যই অমূল্য গণ্য হইত। শিক্ষিত ভারতবাসীর উপর তাঁহাদের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট, কারণ তাঁহাদের ন্যায় আর কোন ইংরাজ ভারত-বর্ষকে অত গভীরভাবে ভালবাসিতে পারেন নাই। স্যর চার্লস ডিলকে (Sir Charles Dilke) এবং মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড (Mr. Ramsay

Macdonald) প্রমুখ মহাসভার বিশিষ্ট সদস্যগণ ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তথায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। আনন্দানুষ্ঠানে বক্তৃতা করিবার ইংরাজি ব্যবস্থা আমার তেমন পছন্দ হয় না। ভারতবর্ষে আমরা যখন কোনও ভোজসভায় যাই তখন স্বচ্ছন্দভাবে খোসগল্প করিয়া আহার করা হয় কারণ ভোজনই সেখানে মুখ্য ব্যাপার বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ইংরাজ সমাজে ঐরূপ সভায় আলোচনাই প্রধান এবং আহার গৌণ ব্যাপার। ইহার ফলে এই হয় যে যাঁহারা বক্তৃতা করেন তাঁহাদের পক্ষে ভোজের আনন্দ নষ্ট হইয়া যায় কারণ তাঁহাদের সমস্ত মন ও চিন্তা ঐ আলোচনার বিষয়ে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ থাকে। অবশ্য এইরূপ বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। লর্ড মেয়রের ভোজ সভায় যদি বক্তৃতাগুলি বাদ দেওয়া হইত তাহা হইলে ইহার সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিমত কারণ উক্ত সভায় আমাকে যে সকল বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল তাহাদের চিন্তায় উৎসবের পূর্ণ আনন্দ আমি উপভোগ করিতে পারি নাই। বক্তৃতা প্রদান বিশেষ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। যত্নসহকারে প্রস্তুত না হইলে বক্তৃতা শ্রবণযোগ্য হয় না। সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের শ্রেষ্ঠবক্তা ডিমস্থিনিস (Demosthenes) রাত্রি জাগরণ করিয়া বক্তৃতাগুলি প্রস্তুত করিতেন বলিয়াই এথেন্সবাসীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত।

যাহা হউক স্যর উইলিয়মের (Sir William Wedderburn) অনুষ্ঠিত ভোজন সভায় আমি বঙ্গবিচ্ছেদ ও বিনা বিচারে নির্ব্বাসন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

স্যর চার্লস ডিলকে (Sir Charles Dilke), মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ (Mr. Ramsay Macdonald) এবং স্যর হেনরি কটন্ (Sir Henry Cotton) পরে বক্তৃতা করেন ও তীব্র ভাষায় নির্ব্বাসন ব্যবস্থার নিন্দা করেন। মিষ্টার হিউম্ (Mr Allen Hume) উক্ত সভায় অন্যতম

বক্তা ছিলেন। ব্যক্তিগত স্মৃতি হইতে তিনি আমার সম্বন্ধে বহু উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয় যে তিনি পুনরায় বিলাতে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতে পারিতেছেন। তিনি বলেন যে তাঁহার স্মৃতির পটে এখনও সেই দিনগুলির কথা ভাসিতেছে যখন তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও মিষ্টার মুধোলকারের (Mr. Mudholkar) সহিত প্লাইমাউথ হইতে এবারডিন্ পর্য্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনের সর্ব্বত্র ভারতবর্ষের ন্যায্য দাবি সমর্থন করিতে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে সে দিনের স্মৃতি চিরকাল তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে কারণ তাঁহাদের সে সময়ের চেষ্টা বিফল হয় নাই।' এবার্ডিনে তাঁহাদের শেষ সভানুষ্ঠানের কথা তাঁহার বেশ মনে ছিল। সুরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যবহারিক জ্ঞান কারাপ্রাচীরের অন্তরালেও—যে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আজ আর একজন ভারতীয় ধীরে ধীরে মৃত্যুর-দিকে যাইতেছে—তাঁহাকে শক্তি দিয়াছিল ও তাহারই বলে তিনি ঐ সুমহান্ চেষ্টা সফলতার দিকে লইয়া যাইতে সক্ষম হন (আনন্দধ্বনি)।

স্যর উইলিয়ামের অনুষ্ঠিত প্রাতর্ভোজের অনুষ্ঠান ২৪ শে জুন তারিখে সম্পন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে বিলাতে এমন একটী ব্যাপার ঘটে যাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ যুগপৎ স্তম্ভিত হয়। ১লা জুলাই রাত্রে ন্যাসানাল্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ধিংড্‌়া (Dhingra) নামে একজন ভারতীয় কর্ত্তৃক তদানীন্তন ভারতসচিবের পার্শ্বচর স্যর উইলিয়াম্ কার্জ্জন উইলি (Sir William Curzon Wyllie) এবং ডক্টর লালকাকা (Dr. Lalkaka) নিহত হন। ঠিক যে সময়ে এই হত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছিল সেই সময়ে লর্ড ষ্ট্রাথ্‌কোনা (Lord Strathcona) সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে সান্ধ্য সভায় আপ্যায়িত করিতেছিলেন। আমি ন্যাসানাল্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম এবং তথায় একবার যাইব কি

না ভাবিতেছিলাম কিন্তু সেই রাত্রে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম বলিয়া তথায় না গিয়া আমার বাসায় ফিরিরা যাই।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতর্ভোজের পর একজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন "স্যর উইলিয়াম কার্জ্জন উইলির হত্যা সম্বন্ধে আপনি বিশেষ যাহা জানেন দয়া করিয়া বলুন।" আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম "স্যর উইলিয়ামের হত্যা! আমি কিছুই জানি না; এই প্রথম আমি শুনিতেছি যে তিনি নিহত হইয়াছেন।" তিনি তখন যাহা জানিতেন সব আমাকে বলিলেন এবং আমাকে ধিংঙড়া (Dhingra) সম্বন্ধে কিছু জানি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে নাম হইতে বুঝা যায় যে তিনি বাঙ্গালী নহেন তবে কোন প্রদেশের অধিবাসী তাহা বলা শক্ত। এই হত্যা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ও সমগ্র ভারতবর্ষ এই ব্যাপারে ঘৃণা বোধ করিবে ইহা ব্যতীত রিপোর্টার আমার নিকট হইতে আর কিছুই পান নাই। ইহার পর সংবাদপত্রের বহু প্রতিনিধি আমার ঘরে আসিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাত্রি পর্য্যন্ত ইহা চলিতে থাকে। বহু ভারতীয় ছাত্রও তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার উপদেশ লইতে আসেন কারণ একজন ভারতীয় ছাত্র একজন ইংরাজ রাজপুরুষকে হত্যা করিয়াছিল। ভারতীয় ছাত্রগণ যদি তৎপরতার সহিত তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ না করিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে হয়ত ইংরাজ জনসাধারণ সমস্ত ভারতীয় ছাত্র সমাজকেই উক্ত মনোভাব সম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিত। মিষ্টার ডি, সি, ঘোষ এবং মিষ্টার বোস (Mr H.M Bo.e) তখন বিলাতে আইনপাঠ করিতেছিলেন। তাঁহারা নিউ রিফর্ম্ম ক্লাবের (New Reform Club) ঘরে পরদিন এক সভার উদ্যোগ করিলেন এবং আমাকে উক্ত সভায় সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। ইহা ব্যতীত বিলাতের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আমি একখানি চিঠি লিখিয়া সেইদিনই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। উক্ত সভায় আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহা বিলাতের সংবাদপত্র মহল ভালভাবেই গ্রহণ

করিয়াছিলেন তবে আমার বক্তৃতায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলিতেছিল বলিয়া প্রধান মন্ত্রী (Mr. Asquith) যে মন্তব্য করেন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। টাইমস্ (The Times) পত্রিকা প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্য সমর্থন করিলেও পরে দেখা যায় যে ধিংড়া (Dhingra) কোন দলভুক্ত ছিলেন না এবং নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী এই হত্যানুষ্ঠান করেন। স্যর উইলিয়াম্ কার্জ্জন উইলির (Sir William Curzon Wyllie) হত্যা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছিল। এইরূপ অপরাধ জাতীয় অভাব অভিযোগগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে সক্ষম সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার দ্বারা রক্ষণশীল মনোভাবের বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে ইহারা রাজনৈতিক উন্নতির অন্তরায়রূপে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল।

Eighty Club নামক উদারনৈতিক দলের এক প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক সভা স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং আমি বক্তৃতাও করিয়াছিলাম বটে কিন্তু আন্তরিক-ভাবে কিছুই হয় নাই। লেডি কার্জ্জন উইলির নিকট একটি শোকসূচক প্রস্তাব পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু আমি যে প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে উদারনৈতিক দলের নেতাগণের নিকট বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা করিয়া-ছিলাম অবস্থার বিপর্য্যয়ে তাহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এইরূপে একটী সুযোগ হারাইতে হইল।

কাক্সটন্ হলে (Cuxton Hall) স্যর চার্লস্ ডিলকের (Sir Charles Dilke) সভাপতিত্বে আমি শেষ বক্তৃতা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ডিলকের জ্ঞান ছিল এবং ভারতের আশা আকাঙ্খার তিনি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন। ঐ সভায় আমি বঙ্গ বিচ্ছেদ ও মর্লি-মিণ্টো স্কিম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম :—

"মর্লি-মিণ্টোর উদ্ভাবিত শাসনতন্ত্র সংস্কার ব্যবস্থাতে এমন কিছুই

নাই যাহা আমরা পুনঃ পুনঃ চাহি নাই। সে হিসাবে দেখিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে ইহাতে আশাতিরিক্ত কিছু ত দেওয়া হয়ই নাই বরং অনেক বিষয়ে ইহা আমাদের আশানুরূপ হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বলা যায়। অন্ততঃ রাষ্ট্রের কয়েকটী বিভাগে—যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকারী পূর্ত্তকার্য্য—আমরা অর্থনৈতিক অধিকার চাই। আপনারা কি জানেন না প্রতিবৎসর আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া ও কলেরার ন্যায় নিবার্য্য ব্যাধি হইতে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় ? বাঙ্গালার গ্রাম সমূহ যে ভয়াবহ মৃত্যুহারের জন্য শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহার কিয়দংশ আমরা প্রতিরোধ করিতে পারিতাম যদি আমাদের হাতে অর্থনৈতিক অধিকার থাকিত। শিক্ষাখাতে যে ব্যয় তাহা অকিঞ্চিৎকর। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যত কম বলা হয়, ততই ভাল। আমরা সেইজন্য অর্থনৈতিক অধিকার ও যথার্থ স্বায়ত্তশাসন চাই। তাহা আমরা পাই নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে এই মর্লি মিণ্টো ব্যবস্থায় আমরা সরকারের উপর অপ্রত্যক্ষভাবে নৈতিক প্রভাব বিস্তারের অধিকার মাত্র লাভ করিব।"

বঙ্গ-ভঙ্গরহিতকরণ ও ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন দান—এই দুইটী বিষয়েই আমি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রধানতঃ বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং আমার বক্তৃতাগুলি বিলাতে যেরূপ অনুমোদন লাভ করিয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে শীঘ্র ঐ দুইটী বিষয়েই কিছু করা হইবে।

ইউরোপ মহাযুদ্ধ উক্ত কারণগুলিকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিল এবং বঙ্গবিচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যে জাতীয় জাগরণের বিকাশ দেখা গিয়াছিল তাহাও দমননীতির প্রচণ্ডতা স্বরাজলাভের আকাঙ্খাকে স্পষ্টতর করিয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট বিলাতের মহাসভা হইতে ভারতশাসন সম্বন্ধে যে ঘোষণা হয় তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই কয়েকটী প্রদেশে জাতীয় ভাবকে পিষ্ট করিবার এক বৃথা চেষ্টা হইয়াছিল।

এইস্থানে মিষ্টার ষ্টেড্ (Mr Stead) কর্ত্তৃক বিলাতে আহূত সভাটীর সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। মিষ্টার ষ্টেড্ ছিলেন মানবজাতির স্বাধীনতার উপাসক এবং সেইজন্যই ভারতের অনেকে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে টাইটানিক্ (Titanic) ডুবিয়া যাওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়া ভারতবর্ষ মর্ম্মাহত হইয়াছিল।

উক্ত সভায় মিষ্টার ষ্টেড্ (Mr. Stead) একটী নাটকীয় ব্যাপার করেন। তিনি একটী চাবুক লইয়া সভায় আবির্ভূত হন এবং আমাকে ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট আমার শেষ বাণী নিবেদন করিতে বলেন। তাঁহার নির্দ্দেশের বাহ্যিক নিদর্শন ছিল ঐ চাবুক কিন্তু তাঁহার প্রীতিই আমাকে যথার্থ অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। মহদাশয় ঐ ইংরাজের ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার জন্য সহানুভূতি আমার মনে এক গভীর ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দও ঐ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমি তাঁহারই ভাষায় আমাদের কথাবার্ত্তার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকাশ করিতেচি ঃ—

"মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আপনি যদি ঘাতকের তরবারির সম্মুখে নীত হন এবং তখন যদি আপনাকে বলা হয় যে ইংরাজ জনসাধারণের নিকট আপনার মাতৃভূমির সম্বন্ধে আপনার শেষ বাণী কি হইবে তখন আপনি কি বলিবেন ?"

এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন ;

"আমি তাহা হইলে বলিব (১) বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করুন, (২) স্বদেশপ্রাণ রাজবন্দীগণকে মুক্তি দান করুন এবং বাঙ্গালা দেশে হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus) (অর্থাৎ রুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করিবার আইন) বাতিল করিয়া যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা তুলিয়া দিন (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষমা করুন (৪) ভারতবর্ষকে নিজের করের উপর অধিকার প্রদান করুন এবং

(৫) ভারতবর্ষকে কানাডার (Canada) আদর্শে এক শাসনব্যবস্থা প্রদান করুন। ইহাই আমার শেষ বাণী রূপে গ্রহণ করিতে পারেন।"

তিনি বলিলেন "আচ্ছা, এইবার আমরা বিশদভাবে আলোচনা করি। আমি মনে করিয়াছিলাম যে আপনি বঙ্গবিচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে রদ করিতে চান।"

"আমার আন্তরিক ইচ্ছা তাহাই কিন্তু আমি জানি লর্ড মর্লি এক্ষণে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে অবস্থা হইতে নিবৃত্ত হওয়া শক্ত। আমি বাস্তবজগতের লোক সেইজন্য আমি বঙ্গবিচ্ছেদের প্রত্যাহার না চাইয়া পরিবর্ত্তন চাই।"

"আমার মনে হয় আপনি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী—যে পরিবর্ত্তন প্রত্যাহারেরই নামান্তর হইবে ?"

"আমি চাই বাঙ্গালাদেশ একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকে। যতক্ষণ বাঙ্গালীজাতি অস্বাভাবিক ভাবে লর্ড কার্জ্জনের তরবারি কর্ত্তৃক বিভক্ত থাকিবে ততক্ষণ দেশে অশান্তি ও বিক্ষোভ চলিতে থাকিবে।"

"নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আপনি কি বলিতে চান ?"

"বিনা বিচারে তাঁহাদের নির্ব্বাসিত করা কোনও প্রকারে উচিৎ হয় নাই। শীঘ্রই তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া কর্ত্তব্য কারণ তাঁহারা সৎ নাগরিক।"

"আচ্ছা, এক্ষণে শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য বলুন।"

"কানাডার আদর্শে শাসনব্যবস্থাই আমাদের কাম্য। তবে প্রথম সোপান হিসাবে আমরা ভারতীয় করদাতাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থের উপর অধিকার চাই।"

"সৈন্য এবং রেলওয়ে বাবদ যে ব্যয় হয় তাহার সম্বন্ধে কি বলেন ?"

"আপোষের জন্য বর্ত্তমানে আমরা এই দুইটী ছাড়িতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পূর্ত্ত কার্য্যের উপর অবশ্যই আমরা অধিকার দাবী করিব।"

"ভারতবর্ষের জন্য আপনারা কি 'ডুমা' (Duma) চান ?"

"ইহার দ্বারা যদি আপনি প্রতিনিধিমূলক পরিষদ বুঝেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহা চাই।"

"ইহাই মিষ্টার ব্যানার্জ্জির অভিমত এবং কার্য্যসূচি। সুরেন্দ্রনাথ ও 'সারেণ্ডার নট্' (অর্থাৎ হার বা পরাজয় স্বীকার না করা) উচ্চারণ প্রায় একপ্রকার। আমার মনে হয় যে তিনি তাঁহার দাবীর একটীও ত্যাগ করিবেন না। 'Pall Mall Gazette' পত্রিকার জন মর্লি (John Morley) বোধ হয় সমস্তই অনুমোদন করিবে কিন্তু লর্ড মর্লি (Lord Morley) কি করিবেন তাহা অন্য ব্যাপার।"

আমি উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলাম—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের তিন বৎসর পূর্ব্বে এবং মিষ্টার মণ্টেগুর (Mr. Montagu) ভারতবর্ষকে ডমিনিয়ান ষ্টেটাস্ দিবার প্রতিশ্রুতির আটবৎসর পূর্ব্বে। আমার বাণীর একাংশ সফল হইয়াছে। জীবনে আমি বহু স্বপ্ন দেখিয়াছি—তাহাদের কতকগুলি সত্য হইয়াছে এবং কতকগুলি যথা কালের অপেক্ষায় আছে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সহিত সমমর্য্যাদাসম্পন্ন এক অংশরূপে ভবিষ্যতে গণ্য হইবে বলিয়া আমি আশা করি। 'রিভিউ অব্ রিভিউ' (Review of Review) পত্রিকার মিষ্টার ষ্টেড্ (Mr Stead) আমার সম্বন্ধে যে ব্যক্তিগত মন্তব্য করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"যখন সাম্রাজের সাংবাদিকগণ সাটন্ (Sutton) নামক স্থানে যান তখন আমি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তথায় যাই। তাঁহার তীক্ষ্ণধীশক্তি, ইংরাজিভাষার উপর আশ্চর্য্য অধিকার ও গভীর স্বদেশপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। বিলাতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্যালেস্ হোটেলে (West Minister Palace Hotel) তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে যে ভোজসভায় সম্বর্দ্ধনা করেন তথায় আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও

বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় তথায় পাইয়াছিলাম। আমার গৃহে কতিপয় বিভিন্ন জাতির বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তাঁহার সহিত নাটকীয় ভাবে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এই প্রবন্ধে পাঠকগন দেখিবেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুইবার ভারতে জাতীয় মহাসভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন, তিনি একবার দেশের জন্য কারাবরণ করিয়াছেন, তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রসিদ্ধ সম্পাদক এবং বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া তিনি এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন যে তাঁহাকে 'বাঙ্গালার মুকুটহীন রাজা' বলা হয়। ভারতীয় সাংবাদিকগণের তিনিই একমাত্র প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছেন এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে আগত সাংবাদিকগণের অপেক্ষা তিনি কোন অংশে কম নহেন।"

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমি সাদর অভ্যর্থনার মধ্যে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম এবং আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে ও অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসনের সোপানরূপে কিছু দেওয়া হইবে। শীঘ্রই অবস্থার গতি আমাদের দিকে ফিরিতে লাগিল। যিনি ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতে জানেন তিনি প্রার্থিত বস্তু লাভ করেন। ধৈর্য্য ও আশা জননায়কের প্রধান গুণ। ইহাই আমার অভিজ্ঞতা এবং আমি আমার স্বদেশবাসীগণের নিকট সস্নেহে এই অভিজ্ঞতা বর্ণন করিতেছি।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge) ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তারূপে আসেন। লর্ড মিণ্টোর সহিত আমি কয়েকবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। অমায়িক এই ইংরাজ ভদ্রলোকটী তাঁহার মতবাদে খানিকটা উদারনৈতিক ছিলেন বটে কিন্তু যে শক্তিবলে কোন কার্য্যের সূচনা হয় সে শক্তি তাঁহার ছিল না বলিয়া মনে হয়। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম মর্লির নামের সহিত একত্রিত থাকিবে বটে কিন্তু লর্ড মর্লির 'জীবনস্মৃতি' পাঠ করিলে বুঝা যায় যে কোথায় সত্যকার শক্তি নিহিত ছিল। লর্ড মিণ্টোই আইন সভায় পৃথক নির্ব্বাচনের প্রবর্ত্তক এবং এই ব্যবস্থার কুফল হইতে উদ্ধার হওয়া দেশের পক্ষে বহুসময় সাপেক্ষ। বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে ঐ ব্যবস্থা কিছুতেই রদ হইবে না।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না এবং সেইজন্যই তাঁহার নিয়োগে ভারতবর্ষে মিশ্রভাবের উদয় হয়। কিন্তু একবৎসর অতীত হইতে না হইতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তিনি বেণ্টিঙ্ক (Bentinck), ক্যানিং (Canning) ও রিপণ (Ripon) প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তাগণের পাশেই স্থানলাভ করিবেন। যাহা হউক, লর্ড হার্ডিঞ্জ শাসনভার গ্রহণ করিবার পর আমরা বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে তাঁহাকে জনসাধারণের মনোভাব জানাইবার জন্য টাউন হলে একটী জনসভার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই লাটপ্রাসাদ হইতে এক আমন্ত্রণ পাইলাম। সাধারণ সম্ভাষণের পর লর্ড হার্ডিঞ্জ আমাকে প্রস্তাবিত জনসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। আমি বলিলাম "বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে বাঙ্গালার অবস্থা আপনাকে জানাইবার জন্য উক্ত সভার উদ্যোগ করা হইতেছে।" তখন তিনি বলেন যে উক্ত উদ্দেশ্য লিখিত আবেদন পত্রের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম

যে যদি তিনি নিজে আমাদের আবেদন দেখেন ও দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাহা হইলে জনসভার কোনও প্রয়োজন হয় না। তিনি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন।

ফরিদপুরের জ্ঞানবৃদ্ধ অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের সাহচর্য্যে আমি আবেদন লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক জেলায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম যাহাতে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর গৃহীত হয়। আমলাতন্ত্রের স্থায়ী কর্ম্মচারীদের যাহাতে কর্ণগোচর না হয় সেজন্য ব্যাপারটী গোপন রাখা হইয়াছিল।

১৯১১ খৃঃ জুনমাসের শেষভাগে ১৮টী জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন পত্রখানি বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হয় এবং ঐ বৎসরেই ২৫শে আগষ্ট ভারতসরকার বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার সুপারিশ করিয়া এক বার্ত্তা প্রেরণ করেন। আমাদের বর্ণিত কয়েকটী কারণ ভারত সরকার এই সুপারিশের উপযুক্ত কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাটের ঘোষণায় বঙ্গ বিচ্ছেদব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। আমি এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই এই ঘোষণার কথা শুনিয়াছিলাম যদিও জনসাধারণ ইহার বিষয় জানিত না। অনেকেই এ সংবাদ পূর্ব্বে পান নাই এবং সেইজন্য অকস্মাৎ এই সংবাদে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। ঢাকার নবাব সুলিমূল্লা বরাবর সরকারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনিও এই সংবাদে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে কলিকাতার সকলেই দিল্লীর দরবারে কিছু হইবে বলিয়া আশা করিতেছিল। 'বেঙ্গলী' আফিসে সমস্ত দিন জনসমাগম হইতেছিল—দিল্লী হইতে কোনও সংবাদ আসিল কি না জানিবার জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে লাগিল কিন্তু কোনও সংবাদ না আসায় উপস্থিত সকলেই হতাশ হইতে লাগিলেন। বৈকালেও কোন

সংবাদ আসিল না। শেষ বেলায় "এসোসিয়েটেড প্রেস" দিল্লী হইতে একটী সংবাদ পাঠান কিন্তু তাঁহাতে বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ ছিল না। আমার ঘরে যে সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি পরদিনের জন্য একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া 'বেঙ্গলী' অফিস ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম এমন সময়ে টেলিফোনে সংবাদ আসিল যে বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সময় 'বেঙ্গলী' আফিসের সম্মুখে একটী জনতা হইয়াছিল। কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল এবং বহু লোক আমাকে জোর করিয়া তথায় লইয়া যান। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল— আমরা সেই বিরাট জনস্রোতে কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না। কেবল দু-একটী প্রশ্ন ও গোলমাল ব্যতীত কিছুই শুনা যাইতে-ছিল না। জনতার মধ্য হইতে হঠাৎ একটী প্রশ্ন শুনিলাম "দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় কিরূপ হইবে?" আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলাম যে ইহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। পরবর্ত্তী ঘটনাবলি প্রমাণ করিয়াছিল যে আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম। সেইরাত্রে সভাস্থল হইতে প্রসন্নচিত্তে আমি এই ভাবিতে ভাবিতে বাটী ফিরিলাম যে বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীদেয় একতা বজায় রাখিবার যে চেষ্টা আমরা এতদিন করিতেছিলাম তাহা অবশেষে সফল হইল। এই সাফল্যের কারণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়, অনিয়মতান্ত্রিকতা ও উচ্ছ্বাসের পরিহার আমাদের সফলতা আনিয়া-দিয়াছিল। পুলিস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করি নাই পরন্তু প্রত্যেক লাঠির আঘাতের পর 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিতাম। নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ আমরা অভ্যাস করিতাম এবং আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতাম কিন্তু আমরা ইহাও জানিতাম যে সংযমনিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতীত জাতীয় উদ্দেশ্যে এই আত্মিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র মতবাদেই কাজ হয় না, তাহার প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকা চাই—পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কেবলমাত্র

কোন বিধানের উপর নির্ভর করিলে যে অসাফল্যের সৃষ্টি হয় তাহার বহু দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়।

ইহা বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে যখন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মর্লি বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে যুগপৎ এই মন্তব্য করিলেন যে ইহা ভারতের অধিকাংশ লোকের অভিপ্রেত না হইলেও এই ব্যবস্থা অবধারিত—তখনই ইহা পরিবর্ত্তিত করা হয় নাই। উক্ত মন্তব্য কেবল জনসাধারণকে আরও রুষ্ট ও চঞ্চল করিয়াছিল। বঙ্গবিচ্ছেদ এবং ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই দমননীতি বাঙ্গালাদেশে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের মূল কারণ এবং আমার মনে হয় যে আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইত তাহা হইলে বাঙ্গালার তথা ভারতের ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হইত। এক্ষেত্রেও ঠিক মুহূর্ত্তটী অতিক্রম হইয়া যায় এবং যথার্থ সময়ের বহু পরে বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা সংশোধিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ রাজনীতির প্রতি পদে এবারেও 'বহু বিলম্ব' কথাটী লেখা হইল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর কথা এখানে না বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের কয়েকজন এখন পরলোকে। আনন্দ মোহন বসু, মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যচৌধুরী, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনন্দ-মোহন বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্বে মহারাজা সূর্য্যকান্ত রাজনীতিতে যোগ দেন নাই। শিকার তাঁহার একমাত্র বিলাস ব্যসন ছিল। স্বভাবতঃই তিনি উৎসাহী পুরুষ ছিলেন এবং একবার কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে তিনি তাহার জন্য চেষ্টার ক্রুটী করিতেন না। তখনকার দিনে তাঁহার ন্যায় ধনবান্ ভূম্যধিকারীর পক্ষে একটী গুরুতর ব্যাপার লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কম সাহস ও মানসিক শক্তির পরিচায়ক নয়। লর্ড কার্জ্জন যখন পূর্ব্ববঙ্গের জেলাসমূহে সফর

করিবার সময় মহারাজার আতিথ্য স্বীকার করেন তখন মহারাজা বড়লাট বাহাদুরকে অতিথির সমাদর দানে কুণ্ঠিত হন নাই বটে কিন্তু বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় প্রতিবাদসূচক মত প্রত্যাহার করেন নাই এবং সেইমত তাঁহার অতিথিকে জানাইতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই অনমনীয় দৃঢ়তা তিনি বরাবর পোষণ করিয়াছিলেন।

বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী এবং বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ তাঁহার পিতার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অশ্বিনী কুমারের নিষ্ঠা ও গঠনশক্তি এই কলেজটীকে প্রদেশের একটী বিশিষ্ট শিক্ষায়তনে পরিণত করিয়াছিল। কলেজের সহকর্ম্মী বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিনি সমগ্র জিলাকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। তাঁহার দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান বরিশালে দুর্ভিক্ষের সময় যথেষ্ট সেবা কার্য্য করিয়াছিল।

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার সমস্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যকল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়ের কৃতিত্বও এই আন্দোলনকে যথেষ্ট পুষ্ট করিয়াছিল। তিনি ছিলেন মৈমনসিংহের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব। স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি যথেষ্ট পুষ্ট করিয়াছিলেন এবং এজন্য তাঁহাকে সরকারের অপ্রীতিভাজন হইতে হইয়াছিল।

ফরিদপুরের জ্ঞানবৃদ্ধ নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদারের নাম এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধীশক্তি, বাগ্মিতা এবং স্বদেশপ্রেমের জন্য তিনি বাঙ্গালার নেতৃগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। শিক্ষকরূপে তিনি কর্ম্মজীবনের আরম্ভ করেন কিন্তু শীঘ্রই রাজনীতিতে যোগ দেন। ভারতের জাতীয় মহাসভার জন্ম হইতেই তিনি ইহার সহিত জড়িত হন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহাসভার সভাপতি হন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় কার্য্য।

বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা সংশোধিত হইবার পর আইনসভায় প্রবেশ করিতে আমার আর কোনও বাধা রহিল না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে আমি বাঙ্গালার ও কেন্দ্রীয় দুই আইন সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য দাঁড়াইলাম এবং দুই স্থানেই সদস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোটে নির্ব্বাচিত হইলাম।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হই এবং পরবর্ত্তী মাসেই আমি দেশের ফৌজদারি শাসন ব্যবস্থায় বিচার ও কার্য্যকরী বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। বিষয়টী পুরাতন এবং প্রথম প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব মনোমোহন ঘোষ মহাশয় উক্ত ব্যবস্থার কুফল জনসাধারণের নিকট জানাইয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন ভারতসচিবের নিকট এই ব্যবস্থা সংশোধনের জন্য আবেদন পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই আবেদনপত্রে বহু বিশিষ্ট ইংরাজ ভদ্রলোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যর হার্ভি এডামসন্ (Sir Harvey Adamson) ঘোষণা করেন যে সরকার সতর্কতার সহিত এবং ক্রমে ক্রমে ফৌজদারি শাসনে উক্ত ব্যবস্থা সংশোধন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু সেই ঘোষণার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলেও কিছুই করা হয় নাই। আমার প্রস্তাবটী সেইজন্য সময়োচিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বেসরকারী ভারতীয় সদস্য ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু সরকারী ভোটাধিক্যে ইহা বাতিল হইয়া যায়।

ইহা ব্যতীত প্রেস্ আইন, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্প্রসারণ, রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে পরামর্শকমিটি গঠন, এবং মণ্টেগু চেমসফোর্ড (Montagu Chelmsford) ব্যবস্থায় যে সমস্ত সংস্কারের প্রস্তাব

করা হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে আমি কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম। আমি প্রেস আইনের বাতিল চাহি নাই কেবল ইহা সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এ ক্ষেত্রেও বেসরকারী সদস্যগণ একমত ছিলেন কিন্তু সরকারী ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটী নাকচ হইয়া যায়। কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য থাকা কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে ইহা একটী স্বায়ত্তশাসনাধিকার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইবে এবং বড়লাট বাহাদুরের পরিবর্ত্তে প্রদেশের গভর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হইবেন। ইহার দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়কে মাদ্রাজ ও বোম্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এক অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং আমার উক্ত প্রস্তাবটী শিক্ষামন্ত্রী স্যর শঙ্করন্ নায়ার (Sir Sankaran Nair) কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু আমি যখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আনন্দানুভব করিতেছিলাম, আমার কয়েকজন সহকর্ম্মী সেই সময়ে আমার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছিলেন। তাঁহারা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের কমিটীর একটী সভা আহ্বান করিয়া আমার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ প্রস্তাবটী স্থগিত রাখা হইয়াছিল বলিয়া সে যাত্রা আমি নিস্কৃতি পাইয়াছিলাম। কিন্তু যে সংস্কারের জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং যাহার জন্য সহকর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছিলাম এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাই এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। ভারতবর্ষে জনসেবার ইহাই পুরস্কার।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে আমি সর্ব্বদা বিশেষ ঔৎসুক্য বোধ করিতাম। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লর্ড রিপণের প্রস্তাবের পূর্ব্বেও আমি রাজনৈতিক উন্নতির সোপান বলিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন লইয়া আন্দোলন চালাইয়াছিলাম এবং ইহার সূত্রপাত অবধি ইহার কার্য্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতাম। সেইজন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে

সদস্য থাকাকালে ইহার প্রসারবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা আমি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আমি এইমর্ম্মে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম যে জিলাবোর্ড ও স্থানীয় বোর্ডের সভাপতিগণ নির্ব্বাচিত (Elected) হইবেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া স্থানীয় সরকারী বোর্ড (Local Govt. Board) প্রতিষ্ঠিত হইবে। বলা বাহুল্য যে সরকারের বিরুদ্ধতায় উক্ত প্রস্তাবটী তখন নাকচ হইয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু কালক্রমে সরকারী মনোভাব আমার প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইতেছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করেন যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসকল যেখানেই সম্ভব হইবে সেইখানেই গ্রাম্য বোর্ডগুলির সভাপতির নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিবেন এবং তদবধি বাঙ্গালায় সমস্ত জিলা ও স্থানীয় বোর্ডগুলির সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যখন আমি মডারেট দলের ডেপুটেসনে বিলাতে গিয়াছিলাম তখন ভারত সচিব আমাকে একটী কমিটির সদস্য নিযুক্ত করেন। ঐ কমিটি বিলাতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনাধিকার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তাহারা ভারতবর্ষে কতদূর কার্য্যকরী হইতে পারে সেই সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। আমি যথাসম্ভব বিলাতী আদর্শে প্রত্যেক প্রদেশে একটী স্থানীয় সরকারী বোর্ড (Local Govt Board) প্রতিষ্ঠার অনুকূলে মন্তব্য করিয়াছিলাম। আসামে ও মধ্যপ্রদেশে আমার মন্তব্যানুযায়ী কার্য্য হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গালার ও অন্যান্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইহা গ্রহণ করেন নাই।

সিন্ধুবালার ঘটনায় বাঙ্গালাদেশে এক বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাকুড়া জিলায় সিন্ধুবালা নাম্নী দুই জন পর্দ্দানসীন মহিলা ছিলেন। কোনও মামলায় একজন সিন্ধুবালার প্রয়োজন হওয়ায় পুলিস দুইজন মহিলাকেই প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায় এবং ১৩ দিন হাজতে রাখিবার পর কাহারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণাভাবে দুইজনকেই মুক্তি দেয়। ভদ্রমহিলার প্রতি এই

আচরণে বাঙ্গালায় এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আমি তখন কেন্দ্রীয় পরিষদ হইতে আমার প্রদেশের জনমত প্রকাশ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নিম্নোক্ত প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়াছিলাম :—

"এই আইন সভা সপরিষদ বড়লাট বাহাদুরকে প্রত্যেক প্রদেশে এমন একটী করিয়া কমিটি গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে যে, কমিটি প্রথমতঃ ভারতরক্ষা আইনে আটক বন্দীদের সম্বন্ধে, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইনে আটক ব্যক্তিদের ও অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ আইনে আটকবন্দীদের সম্বন্ধে এবং যে সমস্ত ব্যক্তিদের উক্ত আইনের আমলে আসিবার সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্বন্ধে ও এই সমস্ত বন্দীদের স্বাস্থ্য, ভাতা, আটকস্থান ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদনুযায়ী মন্তব্য করিবে।" তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিব আমার প্রস্তাবটী মূলতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী একটী কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। বিচারপতি বিচক্রফ্‌ট (Beachcroft) এবং পরলোকগত স্যর নারায়ণ চন্দ্রভারকর (Sir Narayan Chandravarkar) উক্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালাদেশে একশতজন রাজবন্দীর মধ্যে ছয়জনকে মুক্তি দিবার পরামর্শ উক্ত কমিটি দিয়াছিলেন।

রাউলাট এক্ট (Rowlatt Act) সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। দেশের সাধারণ ফৌজদারি আইন অতিক্রম করিয়া এই স্বৈর আইনটী চালান হয় বলিয়া দেশে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিষদে আমি উক্ত বিলটীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম যে সরকার যাহা করিতেছিলেন তাহার বিষময় ফল সম্বন্ধে সরকার বোধ হয় জ্ঞাত নহেন। আমাদের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল কারণ রাউলাট এক্টকেই অসহযোগ আন্দোলনের জনক বলা যায়।

কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেট আলোচনার সময় আমি যখন প্রদেশগুলির অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া

বক্তৃতা করিয়াছিলাম তখন তদানীন্তন অর্থসচিব স্যর উইলিয়াম মেয়ার (Sir William Meyer) আমাকে "অধীর আদর্শবাদী" বলিয়া উল্লেখ করেন। আমি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলাম যে আমি আদর্শবাদী বটে কিন্তু অধীর অথবা অবাস্তব আদর্শবাদী নয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে আমি পরাজিত হইয়াছিলাম এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও সীতানাথ রায় মহাশয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দীর্ঘ ৪০ বৎসর ব্যাপী যে কর্ম্মজীবন যাপন করিয়াছিলাম আর একবার সেই কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিলাম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল এবং বাঙ্গালার অধিবাসীগণকে এই যুদ্ধে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। আমি নগরে নগরে এই আবেদন প্রচার করিয়া দেশবাসীগণকে সাম্রাজ্যের বিপদে যুদ্ধে যোগদিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। প্রদেশের বিভিন্ন অংশে আমি ত্রিশটীর অধিক সভায় এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম যে স্বায়ত্তশাসন আত্মরক্ষার শক্তি আনয়ন করে এবং আমরা যদি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সহিত সমমর্য্যাদা দাবী করি তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিপদে তাহার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাও আমাদের কর্ত্তব্য। এই আবেদন সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল কারণ তখনও অসহযোগের চিহ্ন মাত্র ছিল না।

দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অসহযোগপদ্ধতি বেশ স্থায়ী স্থান করিয়াছিল কিন্তু আজ কাল দেখা যাইতেছে যে ক্রমে ক্রমে ইহা পরিত্যক্ত হইতেছে। অসহযোগ প্রকাশের বিভিন্ন পন্থাগুলি—একটী ব্যতীত—সবই আজ পরিত্যক্ত। বিদেশী বস্ত্র বয়কট ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বয়কটই প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এই আন্দোলনের নেতা ও উদ্যোক্তাগণ স্পষ্টই ইহার অসাফল্য স্বীকার করিয়াছেন। দেশবরেণ্য নেতাগণের মনে অসহযোগের উৎপত্তি হয় গভীর দেশভক্তি ও শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা হইতে কিন্তু জনসাধারণের মনে ইহার উৎপত্তি

কেবল শাসকবর্গের প্রতি ঘৃণা হইতে নয় পরন্তু ইহা ইংরাজ জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত। এই বিদ্বেষ সংক্রামক এবং সেইজন্যই ইহা কেবল শাসকগণের প্রতি আবদ্ধ না থাকিয়া অপর জাতি ও ধর্ম্মের প্রতি ও দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। গান্ধীজি এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে অসহযোগ বর্ত্তমানে জাতীয় কার্য্যপন্থা হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না কারণ জনসাধারণ নিজেদের মধ্যেই হিংসা দ্বেষ দ্বারা অসহযোগ আরম্ভ করিয়াছে। জনসাধারণ এই ঘৃণার ভাব প্রথমে শাসক সম্প্রদায়ের উপর পোষণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতিও পোষণ করিতে লাগিল এবং ইহারই ফলে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ও দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়া দেশের বর্ত্তমান জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। আমার মনে হয় যে, যে সমস্ত নেতারা অসহযোগ নীতির প্রচারক তাঁহারা আগুণ লইয়া খেলা করিতেছিলেন। গান্ধীজির হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের ঐকান্তিক চেষ্টার আমি বিশেষ প্রশংসা করি কিন্তু যখন আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসংবাদের কথা ভাবি—যাহার বিষবাষ্পে আজ বাঙ্গালার আকাশ আচ্ছন্ন—তখন আমি একথা ভুলিতে পারি না যে অসহযোগ আন্দোলন কিয়দংশে ইহার জন্য দায়ী।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শাসন সংস্কার ও চরমপন্থীদলের অভ্যুদয়।

বিলাতের প্রাকৃত সভা হইতে মিষ্টার মণ্টেগুর ঘোষণা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় ঘটনা। ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র ভারতবর্ষে প্রচলন করিবার প্রতিশ্রুতি এই ঘোষণার মর্ম্ম ছিল। অবশ্য ইহার দ্বারা দেশে মিশ্র ভাবের উদয় হয়—ইংরাজ জাতির প্রতিশ্রুতির উপর আস্থাশীল ব্যক্তিগণ ইহাতে আনন্দলাভ করেন কিন্তু অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইহার পর কিন্তু যখন মণ্টেগুসাহেব নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করিলেন যে তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষ পরিদর্শন ও নেতৃবৃন্দের সহিত দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন তখন কেহই তাঁহার ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন নাই।

নভেম্বর মাসে মণ্টেগুসাহেব ভারতবর্ষে আসেন এবং এখানকার সমস্যাগুলির বিশেষভাবে তদন্ত করেন। তিনি দেশের বহু স্থান পরিদর্শন করিয়া দেশীয় ও বিদেশীয়দের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক এক দলে তুই তিন ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং তাহাদিগকে তীব্র জেরা করা হয়। মধ্যপ্রদেশের মিষ্টার মুধলকারের (Mr. R. N. Mudholkar) সহিত আমাকেও জেরা করা হইয়াছিল। পরে যখন দ্বৈত শাসন (Diarchy) ব্যবস্থার কথা হইতেছিল তখন আমি একবার মণ্টেগু সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ কয়িয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস যে মিষ্টার লিওনেল কার্টিস্ (Mr. Lionel Curtis) এই দ্বৈতশাসননীতির উদ্ভাবক। তিনি এই সময়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং কয়েকটী সম্মেলন আহ্বান করেন। আমি এইরূপ কয়েকটী সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলাম। দার্জ্জিলিংএ এইরূপ এক সম্মেলনে চরমপন্থী কয়েকজন নেতা সহ চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তখনও অসহযোগের প্রবর্ত্তন হয় নাই এবং অবস্থা বেশ শান্ত ছিল। কার্টিস

সাহেবের প্রস্তাবে কেহই বিশেষ বাধা দেন নাই। বঙ্গীয় আইন পরিষদে ইউরোপীয় সভ্যগণ মডারেট দলের সহিত সাধারণতঃ একযোগে কার্য্য করিতেন। আমার স্মরণ আছে কেবল এক বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমাদের বিশেষ মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। বিষয়টী ছিল কলিকাতা পৌরসভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে। তাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন কারণ তাঁহারা ব্যাপারটী নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণ হিন্দু ও মুসলমান একদিন না একদিন একত্রিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইবে এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সেই একতার প্রধান অন্তরায়।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক গগনে এক প্রবল ঝড় উঠিয়া যে বিভেদের সৃষ্টি করিল তাহার ইতিহাস অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (Montagu Chelmsford Report) প্রকাশিত হয়। চরমপন্থী দল ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এমন কি শ্রীমতী বেশান্ত, যিনি অধুনা মডারেট মত পোষণ করেন,—তিনিও ইহা পরিত্যাগ করিলেন। বাল-গঙ্গাধর তিলক বলিয়াছিলেন যে ইহা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

এই উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হয় এবং আমরা স্থির করিলাম যে ঐ অধিবেশনে আমরা যোগদান করিব না। আমরা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর মডারেট দলের এক সম্মেলন বোম্বাই নগরীতে আহ্বান করিলাম। আমি এই সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। ইহাই প্রথম মডারেট সম্মেলন।

ঐ মতবিরোধ ঘটিবার পূর্ব্বে আমরা একটী মিটমাটের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা জানিতাম যে আমাদের মধ্যে এই বিভেদ আমাদেরই দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করিবে মাত্র। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের

তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি শ্রীমতী বেশান্ত ও কংগ্রেসের সম্পাদককে তার করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলাম যাহাতে ঐ বিশেষ অধিবেশন স্থগিত হয় কারণ তাহা হইলে হয়ত একটী মিটমাট সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই এবং শেষ মুহূর্ত্তে যখন চেষ্টা হইয়াছিল তখন অতি বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল !

পরবর্ত্তী ঘটনাবলি প্রমানিত করিয়াছে যে আমাদের সিদ্ধান্ত যুক্তি-যুক্ত হইয়াছিল কারণ আমাদের এই মডারেট দলই মণ্টেগু চেমসফোর্ড ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করিবার সুযোগ দিয়াছিল। তখন ইউরোপীয়ান্ এসোসিয়েসান্ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দলই ইহার বিরুদ্ধতা করিয়াছিল। এই তীব্র প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে একমাত্র মডারেট দলই কেবল ইহাকে যথার্থ সমর্থন করিয়াছিল। যদি তাহারা তখন কংগ্রেসের মধ্যে থাকিত তাহা হইলে তাহাদের সমর্থনসূচক প্রস্তাব নগন্য হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ শাসন তন্ত্র তাহা হইলে ভাবিত যে যখন ভারতবর্ষ ইহা চাহে না তখন ইহা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় এবং ইহার পরিবর্ত্তে আর কোন শাসনব্যবস্থা প্রস্তুত না থাকায় সম্ভবতঃ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লোপ পাইত। ভারতের জাতীয় মহাসভা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করা যে কত বেদনাদায়ক হইয়াছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না ; কিন্তু তথাপি আমাদের ইহা করিতে হইয়াছিল কারণ আমরা জানিতাম যে ইহা ব্যতীত ভারতে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বিলম্বিত হইবে। আমাদের রক্ত দিয়া যে প্রতিষ্ঠানটীকে শৈশব হইতে গড়িয়া তুলিয়াছিলাম সেই প্রতিষ্ঠান যখন পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া আমাদের কঠোর ও আজীবন শ্রমের পুরস্কার দিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়েই দেখিলাম যে জাতীয় একতার সেই পবিত্র মন্দির শুভবুদ্ধিকে হতাদর করিয়া বাদবিসংবাদের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা মর্ম্মান্তিক হইলেও আমাদের উপায় ছিল না কারণ যে দল মহাসভাকে সংখ্যাধিক্যে আয়ত্ত করিয়াছিল সেই দলের সহিত আমাদের

মতভেদ মূলগত ছিল। জাতীয় মহাসভা আমাদের চরম উদ্দেশ্য—স্বায়ত্ত-শাসন—লাভের উপায় মাত্র। চরম উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য আমরা উপায়কে ত্যাগ করিতে দ্বিধা করিলাম না।

হিন্দু যৌথ পরিবারে যেমন মারাত্মক কলহের ফলে বিচ্ছেদসৃষ্টি হয় সেইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা—উগ্রপন্থী ও নরমপন্থী—পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলাম। উগ্রপন্থীরা আমাদের তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন; তাঁহারা আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের সহযোগী বলিয়া প্রচার করিলেন এবং সভা সমিতিতে যে উচ্ছৃঙ্খলতার আমদানি করিতে লাগিলেন তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। এই সমস্ত সভায় প্রায় অহিংস অসহযোগ দ্বন্দযুদ্ধে পরিণত হইত এবং লজ্জাকর দৃশ্যের অবতারণা হইত। 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'ধিক্ ধিক্' কথা দুইটী স্বরাজ পার্টির একচেটে ও বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আত্মশক্তি ও নৈতিক শক্তি অপেক্ষা পশুশক্তির উপর তাঁহারা অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা দেশের তরুণদের এই অসংযত পরিবেষ্টনে আনয়ন করিয়াছিলেন। সংযম ও ধৈর্য্যের যে শিক্ষা ভারতবর্ষের চিরন্তন ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল।

যাহা হউক, ইহা ভুলিলে চলিবে না যে এই চরমপন্থার আবির্ভাব বাঙ্গালা দেশে অধিক দিন হয় নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন ইংরাজের অনুরক্ত। তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন দোষই দেখেন নাই। ইংরাজের সমস্তই তাঁহারা সমাদর করিতেন। কিন্তু নবীন বাঙ্গালার এই দৃষ্টিভঙ্গী অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। যথাকালে এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল এবং সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে পাশ্চাত্যের সমস্ত বস্তুর প্রতি অনুরাগ ক্রমে ক্রমে তীব্র বিরাগে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কারণ ভগবানের অদৃশ্য হস্ত মানব ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ক্রমবিকাশ ও উন্নতির যে নৈসর্গিক নীতি অঙ্কিত করিয়াছে এই

আন্দোলন সেই নীতির প্রতিকূল বলিয়া আমার মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা বলিতে হইবে যে ইংরাজের বিরুদ্ধে এই তীব্র বিরাগের ভাব অংশতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরই সৃষ্টি। ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসকগণ প্রথমাবধি বহু বার আশা ও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিন্তু সেগুলি রক্ষায় তৎপর হন নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার এক্ট (The Charter Act) ভারতীয়গণকে সমস্ত উচ্চপদে নিয়োগের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেও সে আইন কখনও কার্য্যকরী করা হয় নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর ঘোষণা বাণী সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের ঘোষণা করা হইয়াছিল বটে কিন্তু ইহা বহু বাধা নিষেধের দ্বারা সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। তারপর আসিলেন লর্ড কার্জ্জন এবং তাঁহার বহুনিন্দিত ব্যবস্থাবলি। নূতন প্রদেশে যে শাসনতন্ত্র চলিতে লাগিল তাহাতে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং অবস্থা চরমে উঠিল যে দিন বরিশাল সম্মেলন অন্যায়পূর্ব্বক কর্ত্তৃপক্ষ ভাঙ্গিয়া দিলেন। বরিশালে সমবেত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেদিন যেরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না। সে উত্তেজনার সময় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের আস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বরিশাল হইতে ফিরিয়া আমি সাময়িকভাবে অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বারাকপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্-রূপে যে কার্য্য করিতেছিলাম তাহা ইস্তফা দিলাম। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আমি সাতাশ জন সদস্যের সহিত কলিকাতা পৌর সভার সদস্যপদ ত্যাগকরিয়াছিলাম। সময় বিশেষে শাসক সম্প্রদায়ের কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ আমাদের অসহযোগ করা প্রয়োজন কিন্তু সব সময়েই বিশেষতঃ যখন শাসক সম্প্রদায় কোনও সংস্কারে উদ্যত তখন ঐরূপ মনোভাবের আমি পক্ষপাতী নই।

এইরূপ উগ্র মতবাদের মধ্যে, মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের আলোচনা হইয়াছিল। আমি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে এই সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম। এই প্রস্তাবদ্বারা মডারেট দলের

মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহা পরিষদে প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

মডারেট দল ও আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উগ্রপন্থীরা করিতে থাকেন যে আমি রাজনৈতিক জীবনে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিলাম। নূতন অবস্থার অনুকূলে মত পরিবর্ত্তন অন্যায় বা পাপ বলিয়া আমি মনে করি না! আজীবন এক মত সমর্থন করিলেই মহত্ত্ব বা বিশেষ গুণের পরিচয় হয় না। ইহাতে অনেক সময় ভুল আকড়াইয়া থাকা হয় মাত্র কারণ সজীব মন সময়ে সময়ে নূতন অবস্থানুযায়ী ভাবধারা পরিবর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে মূলনীতি আমি কোনওদিন পরিবর্ত্তন বা বর্জ্জন করি নাই; কেবলমাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত মূলনীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অন্যান্য ব্যাপারে মত পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধা করি নাই। নূতন সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের কোনওরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা হয় নাই; আমরা জানিতাম যে উহা সম্পূর্ণ নয়—জানিতাম যে ইহার বহু দোষ ত্রুটি আছে কিন্তু তথাপি সে অবস্থায় উহাকে আশ্রয় করিয়া আরও অধিক চাহিবার শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছিলাম। শান্তিপূর্ণ পরিবেষ্টনের মধ্যে ক্রমশঃ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র অধিকার করিবার ইহা এক সুযোগ বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম। ইহা ব্যতীত গঠনমূলক কার্য্য করিবার আর উপায়ই বা কি ছিল; আমাদের সম্মুখে দুইটী পন্থা ছিল—হয় ক্রমবিকাশের এই পথ, না হয় বিপ্লবের বিপদসঙ্কুল পথ। বাঙ্গালায় বিপ্লবাত্মক আন্দোলন কয়েকজন যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক কর্ত্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল কিন্তু তাহা সফল হয় নাই কারণ অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোন ফললাভ হয় না। বর্ত্তমানকালে সুশিক্ষিত সৈন্যদল ব্যতীত এই আন্দোলন সফল হয় না। মহামতি বার্ক (Edmund Burke) সত্যই বলিয়াছিলেন যে বিপ্লবাত্মক পন্থা চিন্তাশীলব্যক্তির শেষ আশ্রয়। প্রারম্ভ হইতেই ভারতের জাতীয়

মহাসভার মূলনীতি হইয়াছিল ক্রমবিকাশের নীতি এবং সে নীতি আমরা কোনদিন ত্যাগ করি নাই।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট দুইটী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রথমটী ফ্রান্‌চিষ্‌ কমিটী (Franchise Committee), দ্বিতীয়টী ফাংষন্‌ কমিটি (Functions Committee), প্রথমটী পৌর-জনাধিকার প্রদান, নির্ব্বাচকমণ্ডলী নির্দ্ধারণ, আইনসভায় সদস্য সংখ্যা স্থিরীকরণ, হিন্দু মুসলমানের প্রতিনিধিসংখ্যা নির্ণয় এবং ঐ সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপার ঠিক করিবার জন্য গঠিত হইয়াছিল। শাসনতন্ত্রের কোন্‌ কোন্‌ বিভাগ মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হইবে (Transferred) এবং কোন্‌ কোন্‌ বিভাগ গবর্ণরের হাতে থাকিবে (Reserved) তাহা ঠিক করিবার দায়িত্ব পড়িল ফাংষন্‌ কমিটির উপর (Functions Committ e)। আমি প্রথমোক্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম।

আমাদের কমিটিকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান স্থানে গিয়া সেখানকার অধিবাসীদের সাক্ষ্যগ্রহণ ও স্থানীয় সরকারের অভিমত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই আমরা সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলাম এবং কোথাও কেহ আমাদের কমিটির সহিত অসহযোগ করেন নাই। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কমিটি সাধারণ নির্ব্বাচন প্রথাই সমর্থন করিয়াছিল এবং তাহাই অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছিল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট কতকগুলি মূলগত নীতির উল্লেখ করিয়াছিল এবং আমাদের কমিটি সেইগুলির সবিশদ ব্যবহার নির্দ্দেশ করিবার জন্য গঠিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতির নিন্দা করা হয় কারণ ইহা জাতীয়তা বিকাশের প্রতিকূল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মর্লি মিণ্টো ব্যবস্থায় (Morley Minto Scheme) উক্ত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। সাম্প্র-

দায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু মুসলমানের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দ্ধারণের সমস্যা আমাদের কমিটির নিকট দেখা দিল এবং এ ব্যাপারে আমরা ১৯১৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের মধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালা দেশে স্বরাজ্য পার্টি পুনরায় এই সমস্যার উদ্ঘাটন করিয়াছে। এই দলের প্রস্তাব হিন্দুগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও মুসলমান কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া বিবাদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে যখন আমি বোম্বাই নগরীতে সাউথবারা কমিটির (South borough Committee) সদস্যরূপে যাই তখন দাদাভাই নৌরজীর প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি কন্‌ভোকেষন্ হলে গিয়াছিলাম এবং তরুণ ছাত্রদের নিকট একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলাম। সেই বক্তৃতায় আদর্শ ও বাস্তবের যে সংঘাত যুগে যুগে চলিতেছে তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"ভদ্রমহোদয়গণ, আদর্শবাদ উত্তম সন্দেহ নাই। আমি নিজে একজন বিশেষ আদর্শবাদী। আমরা বর্ত্তমান লইয়া কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। অসন্তোষ, সুষ্টু ভাবোচালিত ও সংযত হইলে, স্বর্গীয় সুখ দান করে। ভারতবর্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি বিগত হইয়া প্রভাতের আলোর রেখা দেখা যাইতেছে। বৈদিক ঋষিদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এই প্রাচীন ভারতে স্বাধীনতার সূর্য্য উদিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। দাদাভাই এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ, মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই মহান্ দিনের জন্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। অতএব আদর্শের উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কারণ আদর্শ মানবের কল্পনাকে জাগরিত করিয়া তাহাকে নব নব কর্ম্মে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। বাস্তবকে আদর্শের সহিত যুক্ত থাকিয়া অবস্থা ও পরি-

বেষ্টনানুযায়ী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে যাহাতে অবশেষে বাস্তব আদর্শের সহিত মিলিত হইতে পারে। ক্রমবিবর্ত্তন প্রকৃতির নীতি। নৈতিক জগতে ও প্রকৃতিতে হঠাৎ কিছুই হয় না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার ক্রমিক উন্নতির দ্বারাই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ পরবর্ত্তী কালে বাস্তবে পরিণত হয়। এই শিক্ষা আমরা দাদাভাইয়ের জীবন হইতে লাভ করি। জাতীয় মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে তিনি ভারতের স্বায়ত্তশাসনাধিকার সম্বন্ধে এই বাণীই আমাদের নিকট বহন করিয়াছিলেন।"

আমাদের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদগণ এইরূপে চিন্তা করিতেন এবং আমি আমার জীবনে ইহাই বিশ্বাস করিতাম। আমার যৌবনে, প্রৌঢ়কালে ও জীবন সায়াহ্নে আমি ঐ বিশ্বাস পোষণ করি। কবি টেনিসনের মত আমিও বিশ্বাস করি যে ক্ষিপ্রতা বিলম্বেরই নামান্তরমাত্র।

একত্রিংশ অধ্যায়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে মডারেট পার্টির ডেপুটেসন প্রেরণ।

যথাকালে ফ্রান্‌চিষ কমিটির (Frachise Committee) রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পর আমরা বিলাতে মডারেট পার্টির এক ডেপুটেসন্ প্রেরণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলাম। প্রথম মডারেট সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি আমার বক্তৃতায় ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। শাসনসংস্কারের ইতিহাসে এই সন্ধিক্ষণে আমরা দেখিলাম যে ভারতীয় রাজনৈতিক অগ্রগতির বিরোধী লর্ড সিডেন্‌হাম প্রভৃতির এবং তাঁহাদের সহায়ক ভারতের উগ্রপন্থীগণের অপচেষ্টাকে ব্যাহত করিতে হইলে বিলাতে এক শক্তিশালী প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিতে হইবে। আমি উক্ত দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলাম এবং মিষ্টার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিষ্টার সামর্থ (Mr. Samarth) মিষ্টার চিন্তামণি, মিষ্টার কামাথ, মিষ্টার পি সি রায়, মিষ্টার চেম্বার্স, মিষ্টার রামচন্দ্র রাও এবং এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মিষ্টার কে, সি, রায় প্রতিনিধিদলে ছিলেন। স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু পরে আমাদের সহিত মিলিত হন। উগ্রপন্থীরাও প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার পাটেল্ (Mr. Patel) কংগ্রেস ডেপুটেসনে সদস্য ছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক তখন বিলাতে স্যর ভেলেন্‌টাইন্ চিরোলের (Sir Valentine Chirol) বিরুদ্ধে এক মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ছিলেন এবং তিনিও জয়েণ্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহার মত সে সময় খানিকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কর্ণেল ওয়েজউড্ (Col. Wedgwood) প্রমুখ শ্রমিক-নেতাগণের সহিত আমাদের কয়েকটী আলোচনা হইয়াছিল এবং এগুলি শ্রীমতী বেশান্তের আন্তরিক চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল। শ্রীমতী বেশান্তের মতও যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সে সময় তিনি সংস্কার গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

টেমস নদীর সম্মুখে যে বিরাট কক্ষে জয়েণ্ট কমিটির অধিবশেন হইয়াছিল, প্রত্যহ সেখানে শত শত উদগ্রীব ভারতীয় নর নারী গমন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বী এই সকল ভারতীয়গণকে দেখিলে মনে হইত যেন উহা ক্ষুদ্রাকারে ভারতবর্ষ। লর্ড সেলবোর্ণ (Lord Selborne) ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। তাঁহার পর এই কমিটিতে আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন মিষ্টার মণ্টেগু। বহু ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল এবং কিছু-কাল পরে তিন বা চার ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক এক দলের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সাক্ষী প্রথমে মৌখিক একটী বিবরণ প্রদান করিতেন এবং তৎপরে কমিটির সদস্যগণ একের পর এক তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন। মিষ্টার মণ্টেগু বা লর্ডসিংহ আমাকে কোনওরূপ প্রশ্ন করেন নাই। শ্রমিক সদস্য মিষ্টার বেন্ স্পূর (Mr. Ben Spoor) আমাকে সামান্য জেরা করেন। কংগ্রেস ডেপুটেসনের কোনও সদস্য তাঁহাকে বোধহয় ইহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে আমি পূর্ব্বে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র লাভের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া কোনও প্রস্তাব করিয়াছিলাম কি না। আমি কমিটির নিকট সাক্ষ্যে এইরূপ সময়নির্দ্ধারণ অনুমোদন করি নাই এবং সেইজন্য আমার কথায় অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি ঐরূপ প্রশ্ন করেন। আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম "পূর্ব্বে যদি ঐরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া থাকি তাহা হইলেও নূতন অবস্থানুযায়ী আমার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার কি আমার নাই ?" ইহার পর ঐ বিষয়ে আর কিছু প্রশ্ন করা হয় নাই। মোটের উপর, আমাদের প্রতিনিধিদল এই তদন্তকালে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

প্রত্যেক ভারতীয় সাক্ষ্যদানকালে দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। আমার মনে হয় যদি এতদিন উক্ত অভিমতানুযায়ী সরকার কার্য্য করিতেন তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু অসুবিধা দূর হইয়া যাইত। কিন্তু

এক্ষেত্রেও সরকারের দূরদৃষ্টির অভাব দেখা যায়। যুক্তিযুক্ত সাহসিকতা কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয় ; ইহা শাসকবর্গের পক্ষেও এক সদ্‌গুণ। এই সদগুণের উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন লর্ড ডারহাম্ (Lord Durham) যখন তিনি কানাডার শাসনতন্ত্র সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মণ্টেগু চেমসফোর্ড ব্যবস্থাতেও আমরা সাহসিক অগ্রগতির নিদর্শন দেখিতে পাই।

বাঙ্গালা দেশে রাজস্বের অধিকাংশই সংরক্ষিত বিভাগগুলির (Reserved Departments) জন্য ব্যয়িত হয় এবং জাতিগঠন সম্বন্ধীয় বিভাগগুলির জন্য রাজস্বের সামান্যই রাখা হয়। ইহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে এবং এই শোচনীয় ব্যবস্থার জন্য প্রদেশের বহু প্রয়োজনীয় উন্নতি স্থগিত হইয়া গিয়াছে। প্রদেশের স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি এবং শিল্প উক্ত ব্যবস্থার জন্য উন্নতি করিতে পারে না।

জয়েণ্ট কমিটির প্রত্যেক সদস্য এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (অর্থাৎ কয়েকটী সংরক্ষিত বিভাগ গবর্ণমেণ্টের খাসে রাখিয়া কয়েকটী মাত্র মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে রাখার এই ব্যবস্থা) পছন্দ করেন নাই এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকটও ইহা উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমি একবার একজন বিশিষ্ট ইংরাজ সাংবাদিকের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র গঠন ভারতে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্যরূপে প্রচারিত হইয়াছে এবং ১৯১৭ খৃঃ ২০শে আগষ্টের ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে যে ক্রমে ক্রমে ভারতে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তিত করা হইবে। পরীক্ষামূলকভাবে কিছুকালের জন্য কয়েকটী বিভাগ আইনসভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে। হয় আংশিক দায়িত্বশীল শাসন নচেৎ কিছুই নয়—ইহাই উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম ছিল। মণ্টেগু সাহেব, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নামে, যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিবার জন্যই ব্রিটিশ জনসাধারণ ও জয়েণ্ট কমিটি এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু ঠিক যে সময়ে জয়েণ্ট কমিটি উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল সেই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ পাঞ্জাবে মাইকেল ও'ডায়ারের (Sir Michael O'Dwyer) অনুষ্ঠিত অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার কিচ্‌লু ও মিষ্টার সত্যপালের গ্রেপ্তার, অমৃতসরে গণবিক্ষোভ ও শান্তিভঙ্গ, সাময়িক আইনানুযায়ী বিচার ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস অত্যাচার ভারতবর্ষে যে অশান্তির বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ সেদিন এক তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়াছিল এবং মানসিক সেই অবস্থায় কেহই শাসন সংস্কারকে সুচক্ষে দেখিতে পারেন নাই।

এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদের দলের সহিত চরমপন্থীদের কোনওরূপ অনৈক্য ছিল না। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে আমরা সকলেই ঘৃণা ও ক্রোধ অনুভব করিয়াছিলাম। সময় সমস্ত দুঃখের অবসান করে কিন্তু এখনও সে বেদনার স্মৃতি ভারতবর্ষের নরনারীর মন হইতে মুছে নাই। অনুকূল ঘটনার সংঘাতে সেই পুরাতন স্মৃতি নূতন করিয়া দেখা দেয়।

ডেপুটেসনের কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য ও আমি সেই সময়ে করিয়াছিলাম। ভারত সচিব আমাকে একটী কমিটির সদস্য নিযুক্ত করেন যাহার কার্য্য ছিল বিলাতে স্বায়ত্তশাসনাধিকার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান-গুলির সম্বন্ধে আলোচনা এবং কতদূর ভারতবর্ষে তাহারা প্রযোজ্য তাহা নিরূপণ করা। সকলেই আমাকে এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করেন এবং আমি ইহার কয়েকটী সভায় যোগদান করিয়াছিলাম। আমি এই প্রসঙ্গে বার্মিংহাম সহরের মল-জলাদি নিকাশের উত্তম ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়াছিলাম। উক্ত ব্যবস্থায় দুই ক্রোর মুদ্রা (Stirling) খরচ হইয়াছিল। সমস্ত স্থানটী পরিদর্শন কয়িয়া আমরা একটুও দুর্গন্ধ পাইলাম না। ইহা পরিদর্শন কালে আমি ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের সহিত হুগলি নদীতে যে ময়লা নিঃসারিত করা হয় তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে ইহা জলকে দূষিত করে।

যথাসময়ে কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন। আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম বটে কিন্তু এক অতিরিক্ত মন্তব্য করিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া লোকাল গবর্ণমেণ্ট বোর্ড যেন গঠিত হয়। উক্ত মন্তব্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। আসাম ও মধ্যপ্রদেশের সরকার ব্যতীত সকল প্রাদেশিক সরকার এই প্রস্তাবের বিরোধী হন।

উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের প্রতি আচরণ ও তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা মণ্টেগু সাহেবের নিকট ডেপুটেসনে গিয়াছিলাম। সমুদ্রপারে উপনিবেশগুলিতে অবস্থিত ভারতীয়গণের অকৃত্রিম সুহৃদ্ পোলক্ সাহেব (Mr. Polak) ইহার ব্যবস্থা করেন। আমি নামে মাত্র ডেপুটেসনের মুখপাত্ররূপে গিয়াছিলাম। কার্য্যতঃ তিনিই স্বরচিত বিবরণটী পাঠ করেন। বলা বাহুল্য মণ্টেগু সাহেব এক্ষেত্রেও সহানুভূতিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন।

বিলাতে অবস্থানকালে আমি খিলাফৎ প্রসঙ্গে মুসলমান অধিবাসীগণের এক সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমি আমার কার্য্যব্যপদেশে বহুবার ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়াছিলাম। ১৮৭৪ খৃঃ বা ১৮৯৭ খৃঃ যেরূপ আবহাওয়া দেখিয়াছিলাম এবার যেন তাহার পরিবর্ত্তন দেখিলাম, কারণ কালচামড়ার প্রতি ঘৃণার ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা এবং মণ্টেগু সাহেবের উদারতাই ইহার প্রধান কারণ। ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কক্ষ সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি বিলাতে ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালীর রক্ষক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

১৯২৪ খৃঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূরণ হইবে না। তিনি তাঁহার যুগের নেতৃগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে তাঁহার আত্মবিশ্বাস, সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি এবং কার্য্যকুশলতার

জন্য সম্মান করিতেন। ১৮৮৬ খৃঃ কলিকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক রূপে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। তখন কে জানিত যে সেই তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে কি অসীম শক্তি লুক্কায়িত ছিল। ১৯১৪ খৃঃ তিনি জাতীয় মহাসভার সভাপতি হন। ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ যখন আমি বরিশালে গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম তখন তিনিই সম্মেলনের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ যখন আমি বিলাতে অবস্থান করিতেছিলাম তখন তিনি বয়কট আন্দোলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৬ খৃঃ তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং পর বৎসর লর্ডচেমসফোর্ড তাঁহাকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার কার্য্যকরী সভার সদস্য নিযুক্ত হন।

আজীবন তিনি রাজনীতিতে মডারেট ছিলেন এবং অসহযোগিতা দেশের অকল্যানকর বলিয়া মনে করিতেন। সে যাহা হউক, বাঙ্গালা দেশের তিনি গৌরবের ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং বাঙ্গালা যে দিন তাহার মৃত মহাত্মাদিগের সম্মানের ব্যবস্থা করিবে সেদিন ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নাম সেই মহাত্মাদিগের পূরোভাগে থাকিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন ও মন্ত্রীত্বে নিয়োগ।

১৯১৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে আমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। চারমাস বিলাতে অবস্থানকালে আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু তথাপি এবার আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করি নাই কারণ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশের লোক ইংরাজের অঙ্গীকারে বিশ্বাস হারাইয়াছিল এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনসংস্কারের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিল। এইরূপ অসন্তোষের আবহাওয়ায় নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং নূতন ব্যবস্থানুযায়ী প্রথম নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছিল। অসহযোগকারীগণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে ভোট দিতে নিষেধ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মগুরুগণ মুসলমানদের এই নির্ব্বাচনে কোনরূপে অংশগ্রহণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান নেতা যাহাতে নির্ব্বাচনের সময় বর্দ্ধিত করা হয় তজ্জন্য লর্ড রোনাল্ডসেকে (Lord Ronaldshay) অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি অনুরোধ করায় সময় বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল বলিয়া কয়েকজন মুসলমান নেতা কাউন্সিলে যোগদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অসহযোগীদের ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রবেশ পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। অসহযোগনীতির অসাফল্যের জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল। যখন অসহযোগের বিশিষ্ট সমর্থকগণও দেখিলেন যে গঠনমূলক কোন কার্য্যই এই নীতির দ্বারা সাধিত হইল না বরং অশান্তি ও বিবাদ বিসংবাদের সৃষ্টি করিয়া নেতৃবৃন্দকে ইহা ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল তখন অসহযোগের নামে তাঁহারা এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন বটে কিন্তু

তাহা সভায় বাধা ও প্রতিকূলাচরণ দ্বারা সভা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে। প্রথমে সহযোগ, কার্য্যকালে অসহযোগ এবং তাহার ফলে ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্য—এই কৌশলের মর্ম্ম ছিল।

এই কৌশল মধ্য প্রদেশ ও বঙ্গদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্রই বিফল হয়। মধ্য প্রদেশে ইহা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং বঙ্গদেশে ইহা আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে কে জানে? অসহযোগের গোঁড়া ভক্ত কালে হয়ত বিশিষ্ট সহযোগীরূপে দেখা দিবেন।

যাহা হউক, রাজনীতিক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন যখন সাধিত হইতেছিল সেই সময়ে আমি রোটারি ক্লাব (Rotary Club) হইতে এক আমন্ত্রণ পাইলাম। এই ক্লাবটী এক পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাতায় ইহার এক বিশেষ শাখা আছে। এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান হইতে আমন্ত্রণে আমি সম্মানিত বোধ করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণে আনন্দিত হইয়াছিলাম। এখানে আমি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলাম তাহা ক্লাবের সদস্যগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহারা আমাকে অবৈতনিক সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মান করেন। এখনও আমি উক্ত ক্লাবের সদস্য যদিও কার্য্যব্যপদেশে আমি ক্লাবের সভায় সব সময় যাইতে পারি না তথাপি এরূপ একটী পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকা আমি সম্মানের বলিয়া মনে করি। এই ক্লাব ইংরাজ ও ভারতীয়গণের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিয়া ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যের কল্যান সাধন করিতেছে।

আমি বারাকপুর সাবডিভিসনের মিউনিসিপ্যালিটীগুলি হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য পদপ্রার্থী হইয়াছিলাম এবং বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। নির্ব্বাচনের পরে লর্ড রোনাল্ডসের (Lord Rona'dshay) সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি আমাকে মন্ত্রীত্ব দিতে চাহেন এবং কোন বিভাগে আমি কার্য্য করিতে ইচ্ছুক তাহা জানিতে চাহেন।

আমি শিক্ষা ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের নাম করায় তিনি আমাকে জানান যে যে ভাবে কার্য্যের সুবিধার জন্য বিভাগ সকল বণ্টন করা হইয়াছিল তাহাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সহিত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিভাগ মিলিত ছিল। আমি সাময়িকভাবে উক্ত বিভাগ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় গবর্ণর আমাকে ধন্যবাদ জানান। আমার হিন্দু সহকর্ম্মী কে হইবেন গবর্ণর আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি প্রভাস চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নাম উত্থাপন করিয়াছিলাম। মুসলমান মন্ত্রী সম্বন্ধে তিনি আমাকে কিছু বলেন নাই তবে কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি ডাক্তার আবদুল্লা সারওয়ার্দ্দির আমার নিকট সুখ্যাতি করেন। অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ সেই সময় খিলাফৎ আন্দোলনের চাপে অসহযোগ ও সহযোগের মধ্যে কোন নীতি গ্রহণ করিবেন তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না; ঠিক সেই সময় নবাব নবাব আলি চৌধুরী স্বীয় নামে প্রকাশিত একটী পুস্তিকায় অসহযোগের বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তিগুলি প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট মুসলমান নেতার দ্বারা ঐরূপ সময়ে প্রকাশিত উক্ত বিবরণী গবর্ণর বাহাদুরের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। লর্ড রোণাল্ডসে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নির্ব্বাচিত একজন মুসলমান প্রতিনিধিকে মন্ত্রী করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রেরিত নবাব নবাব আলি চৌধুরী সাহেবকে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করিতে দ্বিধা করিলেন না। রাজনীতিতে সাহসিকতা মূল্যবান গুণ এবং নবাব সাহেব সে গুণের অধিকারী ছিলেন। আমি সেইজন্য তাঁহার নিয়োগে আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সচিবরূপে আমার কার্য্য।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি আমরা তিনজন হস্তান্তরিত বিভাগ-গুলির মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। বিশেষ জাঁকজমকের সহিত আমাদের শপথগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমার সেক্রেটারি ছিলেন একজন আইরিস্; কেল্টিক্ জাতির সহানুভূতি তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং তিনি আমাকে আমার এই নূতন কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অনেক ইংরাজের ন্যায় নামে জানিতেন কিন্তু আমি সচিব হইবার পর আমাকে ঠিক মত জানিবার জন্য মিষ্টার ও'মালে (Mr. O'Malley) আমার প্রকাশিত বক্তৃতাবলি পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে তিনি আমার যথার্থ পরিচয় পাইয়াছিলেন। আমরা দুইজনে বিশেষ হৃদ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া-ছিলাম এবং সেইজন্য ১৯২১ খৃঃ অক্টোবর মাসে যখন তিনি লম্বা ছুটী লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার বিদায়ে দুঃখিত হইয়াছিলাম।

সমগ্র বিভাগটীতে ঐ এক সহযোগিতার ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ডাক্তার বেণ্টলি (Dr. Bentley) আমার মন্ত্রীত্বে নিয়োগের পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। বেণ্টলি সাহেবের অনুপ্রেরণায় সমগ্র বিভাগটী নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তথাপি ব্যবস্থাপক সভায় সময়ে সময়ে তাঁহার পদটী তুলিয়া দিবার প্রস্তাব উত্থিত হইত। যদিও আমার চেষ্টায় ঐ সকল প্রস্তাব কার্য্যকরী হইতে পারিত না তথাপি ইহা হইতে বুঝাযায় যে সময়ে সময়ে জনগণের ও জনস্বার্থের প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপক সভায় আসিয়া কিরূপ দায়িত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

পূর্ত্তবিভাগের প্রধান পূর্ত্তবিদ্ মিষ্টার উইলিয়ামস্ (**Mr. D. B. Williams**) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সংকল্পগুলি যথাসম্ভব সমর্থন করিয়াছিলেন। আমার নির্দ্দেশে যখন নদীতীরস্থ মিউনিসিপ্যালিটী-গুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন আমি তাঁহার ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

চিকিৎসা বিভাগের কার্য্যে আমাকে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। আমার আজন্মকালের নীতিই ইহার কারণ ছিল। সে নীতি ভারতীয় করণের নীতি। বিভাগের পারদর্শিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ করা আমার ইচ্ছা ছিল। অবশ্য লর্ড রোণাল্ডসে (Lord Ronaldshay) ও লর্ড লিটন্ (Lord Lytton) আমাকে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত সার্জ্জন-জেনারল (চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী) আমার অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহারাও আমার নীতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি সময়ে সময়ে কার্য্য কালে মতভেদ হইত। যাহা হউক, আমার মন্ত্রীত্ব হইতে বিদায়কালে বাঙ্গালার সার্জ্জন-জেনারেলের নিম্নলিখিত পত্র খানি হইতে ঐ বিভাগের সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝা যাইবে।

২৪৫, লোয়ার সারকুলার রোড্,
৬ই জানুয়ারি, ১৯২৪।

প্রিয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ,

আজ মন্ত্রীত্ব হইতে আপনার বিদায়কালে আপনি আমাকে সার্জ্জন-জেনারেল হিসাবে যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া আমি বিদায় ব্যথা অনুভব করিতেছি। আমরা সমস্ত বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও প্রত্যেক সমস্যাগুলি অকপটভাবে আলোচনা করিয়া একটী সাধারণ অভিমত গ্রহণ করিতে সর্ব্বসময়েই সক্ষম হইয়াছিলাম। আপনার ন্যায় পরিণতবুদ্ধি, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও গঠনমূলক প্রতিভার অধিকারীর সহিত কার্য্য করা আমার জীবনে

স্মরণীয় ঘটনা। আমরা উভয়েই যে দেশকে ভালবাসি সেই দেশের আরও বহুদিন আপনি সেবা করুন ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

ইতি—

আপনার অনুরক্ত

বেন্ এইচ্ ডিয়ার (Ben. H. Deare)

এই স্থানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমার তিনবৎসর মন্ত্রীত্ব-কালে আর কোনও সার্জ্জেনজেনারেলের সহিত আমার এত অধিক বিরোধ ঘটে নাই। পরস্পর সংগ্রামই ইংরাজ-হৃদয় অধিকার করিবার সর্ব্বোত্তম উপায়।

চতুষ্পার্শ্বে একটী বিশ্বাসের পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। আমাদের কার্য্যে আমরা নূতন কিন্তু স্থায়ী কর্ম্মচারীবৃন্দ স্ব স্ব কার্য্যে বিচক্ষণ। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে যে নির্ভরতা ও আস্থার পরিবেষ্টনের প্রয়োজন তাহা সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলাম। হার্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছিলেন "যদি কাহারও হৃদয় অধিকার করিতে চাও তাহা হইলে তাহাকে তুমি ভালবাস এইভাব দেখাও এবং ইহা দেখাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে তাহাকে যথার্থ ভালবাসা।" দায়িত্বশীল প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে আমি দেখাইয়াছিলাম যে আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করি এবং এই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কেহই পরাঙ্মুখ হন নাই।

কিন্তু স্থায়ী কর্ম্মচারীরা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিলেও বাহিরে আবহাওয়া অন্যরূপ ছিল। বাঙ্গালার প্রায় সব সংবাদপত্রগুলি তখন অসহযোগ নীতির ও চরমপন্থার সমর্থক হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেইজন্য আমাদের সকল কার্য্যে উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের মতে শাসনসংস্কার ফাঁকি ও মিথ্যা এবং আমাদিগকে তাঁহারা শাসকসম্প্র-দায়ের অন্তর্ভূক্ত মনে করিতেন। বৃথা আমরা আমাদের কার্য্যের দ্বারা

তাঁহাদের সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কারণ যাঁহারা চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট হইয়াও দেখেন না বা শুনেন না তাঁহাদের নিকট যুক্তিতর্কের অবতারণা বৃথা।

এইরূপ নিরুৎসাহজনক আবহাওয়ার মধ্যে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। বার্ক বলিয়াছেন যে গণবিক্ষোভ দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় জনগণের তুষ্টিসাধন। আমি তাহা চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু বিশেষ সফলকাম হইতে পারি নাই কারণ কোনও রাজনৈতিক দল যখন একটী নির্দ্ধারিত নীতি অনুসরণ করে তখন তাঁহারা যুক্তির বাণীতে কর্ণপাত করেন না। কিন্তু যুক্তি তর্ক ও অনুরোধ উপরোধ ব্যতীত আর কি উপায়ই বা ছিল? আমি দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে সাংবাদিকগণকে আমার সাহায্য করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ১৯২১ খৃষ্টাব্দেব জুলাই মাসে আমি টাউনহলে সংবাদপত্র-সেবীগণের একটী সম্মেলন আহ্বান করিয়া প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম ঃ—

"সরকারপক্ষ হইতে প্রথম এইরূপ একটী সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে এবং এই প্রথম সাংবাদিকগণ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন।"

আমার বক্তৃতার পর আলোচনা হইয়াছিল। সংবাদপত্রগুলিতে সমালোচনা হইয়াছিল কিন্তু চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি কোনরূপ সহযোগিতার চিহ্ন দেখান নাই।

মন্ত্রী হইবার ঠিক দুইমাস পরে অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আমি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণের সহিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধনের জন্য রচিত একটী বিলের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিধির (Act) সংশোধন অনেকদিন হইতে প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। আমি কলিকাতা নগরীর পৌরশাসন ব্যবস্থা এবং সম্ভব হইলে সমস্ত প্রদেশের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে নূতন শাসন সংস্কারের সহিত উন্নত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। এইজন্য কলিকাতা

নগরীর পৌরশাসন ব্যবস্থার জন্য নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর আমি বাঙ্গালার সমস্ত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুসংস্কৃত করিবার জন্য একটী বিল রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় দীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল প্রদেশের পৌর শাসনব্যবস্থা প্রায় এক আইন দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। এই বিলটী রচনার পূর্ব্বেও আমি মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটীগুলির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণকে পরামর্শদানের জন্য একটী সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছিলাম। আমার মন্ত্রীত্বকালে প্রত্যেক আইন রচনার পূর্ব্বে আমি এইভাবে জনগণের প্রতিনিধিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতাম।

আমার কার্য্যকালে আমি জনসাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিতাম। যথাসাধ্য আমি ইহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং আমি ইহাও বলিতে পারি যে যে অপ্রীতিকর পরিবেষ্টনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার উদ্ভব না হইলে আমি আরও সাফল্যের সহিত কার্য্য করিতে পারিতাম। বাঙ্গালার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরে অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়া তথাকার বিশিষ্ট অধিবাসীগণের সহিত স্থানীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির আলোচনা করিয়াছিলাম। স্থানে স্থানে অসহযোগীগণ বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করিলেও তাহা সফল হয় নাই। ঢাকা ডিভিসনের কমিশনার ইমার্স্ন সাহেব আমাদের কার্য্যে যাহাতে বাধা সৃষ্টি না হয় সেইজন্য ঢাকা হইতে বরিশালে আসিয়াছিলেন।

এই বরিশালেই ১৫ বৎসর পূর্ব্বে সেই স্মরণীয় বরিশাল সম্মেলন হইয়াছিল এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জাতির ঐকান্তিক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছিল। তখন আমিই ছিলাম সেই আন্দোলনের কেন্দ্র কিন্তু ১৫ বৎসর পরে যখন আমি পুনরায় সেই স্থানে গিয়াছিলাম—সেখানকার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে—তখন সরকারের তরফ হইতে গিয়াছিলাম বলিয়া জনসাধারণ সেই হিত চেষ্টা অগ্রাহ্য করিল। তখন আমার ভার্জ্জিলের ইনিয়াসের কথা মনে পড়িল। ইনিয়াস

(Aeneas) বলিয়াছিল—'গ্রীকদের উপহারকেও আমি ভয় করি'। অবশ্য সর্ব্বত্র এভাব বিদ্যমান ছিল না। আমার স্মরণ আছে যখন আমি ১৯১৯ খৃঃ বিলাতে মণ্টেগু সাহেবকে বলিয়াছিলাম যে শাসন সংস্কারের জন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "তাহার নিশ্চয়তা দেখি না কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার অস্তিত্ব নাই।" আমি তখন জানিতাম না যে উক্ত উক্তির সত্যতা শীঘ্র আমার জীবনে প্রতিপন্ন হইবে।

বরিশালে আর একটী হাস্যাস্পদ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ১৯০৬ সালে বরিশাল সম্মেলনের সময় মিষ্টার ইমার্সন (Mr. Emerson) ছিলেন সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁহারই আদেশে সেদিন সম্মেলন নিষিদ্ধ ও আমি দণ্ডিত হইয়াছিলাম কিন্তু তিনিই আবার আমাকে সাহায্যদানের জন্য বরিশাল আসিয়াছিলেন।

আমার মন্ত্রীত্বে নিয়োগের পর যখন আমি ঢাকায় যাই তখন কমিশনার ইমার্সন সাহেবের চতুর্দ্দিকে বিশেষ সুখ্যাতি শুনিতে পাই। সেইজন্য ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সভাপতি বোম্পাস্ (Mr Bompas) সাহেবের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর আমি তাঁহাকেই উক্ত পদের যোগ্য মনে কয়িয়াছিলাম। তিনি তাঁহার পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যে সমস্ত স্থানে আমরা যাইতাম স্থানীয় অসহযোগীগণ হরতাল করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কোথাও ইহা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ফরিদপুরে কেহই হরতালের কথা ভাবেন নাই কারণ তখনও ফরিদপুরের জ্ঞানবৃদ্ধ নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় রোগশয্যায় পড়িয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুরে অসহযোগীগণ জনসাধারণকে সভায় আসিতে বাধা দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকলেই স্বাস্থ্যের উন্নতি আকাঙ্খা করিতেন কিন্তু সরকারের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কিছু গ্রহণ করিতে যেন তাঁহাদের দ্বিধা হইতেছিল।

কিন্তু সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহারা অসহযোগ করেন নাই। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে এই সমস্ত সফরের জন্য আমরা বহু অর্থ পাইতাম কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় একটী প্রশ্নের উত্তরে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল যে ইহার জন্য মন্ত্রীগণ কোন অর্থ লইতেন না। পরন্তু ইহাতে আমাদের ব্যয় হইত এবং এই সফরের জন্য আমাদের বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। দিনাজপুরে আমাকে সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করিতে হয় এবং মশার দংশনে আমার যে ম্যালেরিয়া হইয়াছিল তাহা হইতে সারিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল।

আমার বিভাগীয় কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জনগণের সহানুভূতিলাভ আমার নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় এবং জনসভায় আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলাম যে সরকার ও জনগণের যুক্ত সহানুভূতি ও সহযোগ থাকিলে বাঙ্গালা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিক দূরীভূত হইতে পারে। জলপ্লাবন ও জলনিকাশের গুরুভার সমস্যাগুলি সরকার পক্ষ সমাধান করিলে এবং গ্রাম্য স্বাস্থ্য ও জলসরবরাহের অপেক্ষাকৃত লঘু দায়িত্বগুলি স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে সম্পন্ন করিলে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই কার্য্যনীতি আমি বরাবর অনুসরণ করিয়াছি এবং এই নীতি অনুসারেই গবর্ণমেণ্ট প্রথম ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি (Anti-Malarial Co-operative Society) ও কালাজ্বর সমিতি (Kalaazar Association) নামক সেবা প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি জনস্বাস্থ্য উন্নতির প্রধান উপায়। ঐ বিভাগের সচিবরূপে কার্য্যকালে আমি উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দান করিয়া তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। লর্ডমর্লি একসময়ে বলিয়াছিলেন যে অল্প শক্তি ও সামান্য দায়িত্বের জন্য এ দেশের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু করিতে পারে না। আমিও বহুবার সংবাদপত্রে ও জনসভায় প্রচার করিয়াছিলাম

এবং সেইজন্যই সুযোগ পাইয়া ঐ অবস্থার যথাসাধ্য প্রতিকার করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম। প্রথমেই লোকাল্ বোর্ডগুলিকে সরকারের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য সভাপতি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিলাম। যে সমস্ত জিলাবোর্ড ও পৌর প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বে এ অধিকার ছিল না সেগুলিকে নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। ইহা ব্যতীত দুইটী আইন বিধিবদ্ধ করিয়া একটীর দ্বারা কলিকাতা মহানগরীর এবং আর একটীর দ্বারা প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের পৌর শাসনব্যবস্থা উন্নত ও সংস্কৃত করিয়াছিলাম।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের সচিবরূপে জিলা বোর্ডগুলির সভাপতি নির্ব্বাচন আমাকে অনুমোদন করিতে হইত। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় মেদিনীপুরের জিলা বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট অসহযোগী পন্থী ছিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে মেদিনীপুর জিলায় ইউনিয়ন বোর্ডগুলি লুপ্ত হয়। এই ইউনিয়ন বোর্ডই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রথম ভিত্তিস্থল। সেইজন্য তাঁহার নির্ব্বাচনে অনুমোদন প্রদান কালে আমি একটু অসুবিধায় পড়িলাম। সকলেই আমি কি করি দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল। আমি এমন একটী মধ্য পন্থা আবিষ্কার করিলাম যাহাতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার স্বার্থহানি না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জিলাবোর্ডের নির্ব্বাচন অব্যাহত থাকে। আমি শাসমল মহাশয়কে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলাম। তিনি ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের সহিত আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আমাকে আশ্বাস দেন যে সভাপতিরূপে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের বিধানগুলি মানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন এবং পরবর্ত্তী ব্যবস্থাপকসভার নির্ব্বাচনের পর ইউনিয়ন্ বোর্ড গঠন করিতে সহায়তা করিবেন। তিনি এইভাবে তাঁহার কর্ম্মপন্থা প্রকাশ করার পর তাঁহার নির্ব্বাচন অনুমোদন করিতে আমার আর কোনও দ্বিধা রহিল না।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পৌরশাসন সংক্রান্ত আইন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এক্ট আমার কার্য্যকালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পৌর শাসন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপনা। পুরাতন আইনের বিধানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিয়া আমি নূতন আইনটীকে শাসন সংস্কারের মর্ম্ম অনুযায়ী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহা নগরীর পৌরশাসন করদাতাগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের হস্তে ন্যস্ত করিয়া জনসাধারণের বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন যে বিদ্বেষ ও পক্ষপাতের পরিবেষ্টন বিদ্যমান ছিল তাহার জন্যই এই আইনের যথার্থ মর্য্যাদা লাভ সম্ভব হয় নাই। আজকাল প্রায় 'স্বরাজের' কথা শুনা যায় কিন্তু ইহা বোধ হয় বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আজ যাঁহারা স্বরাজের কর্ণধার হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই তখন শিশু ছিলেন যখন আমি প্রথম স্বরাজ সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। সেই বিগত দিনের ইতিহাস পুনরুক্তি না করিয়া কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারতের রাজনীতিবিদগণের মধ্যে আমিই প্রথম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status) দাবী করিয়াছিলাম। কিন্তু কলিকাতানগরীর নূতন পৌরশাসন ব্যবস্থাকে সর্ব্বাঙ্গীন স্বায়ত্তশাসন বলা যায়। বাঙ্গালাদেশের রাজস্বের একপঞ্চমাংশ অর্থ কলিকাতার করদাতাগণ করস্বরূপ প্রদান করেন এবং নূতন আইনে সেই অর্থ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের হস্তে ন্যস্ত হইল। সদস্যগণের পাঁচ ভাগের চারভাগ নির্ব্বাচিত হইবার ব্যবস্থা হইল। প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের ভার সদস্যগণের হস্তে প্রদত্ত হইল এবং পৌর সভার সভাপতি মেয়র মহোদয়কে নির্ব্বাচনের দায়িত্ব সদস্যগণের স্কন্ধেই অর্পিত হইল। করদাতাগণের ভোট প্রদানের অধিকারও অনেকাংশে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

চরমপন্থী সংবাদ পত্রগুলি কিন্তু এ সমস্ত সংস্কারের কোন মর্য্যাদা দেন নাই। তাঁহারা কেবল নূতন আইনে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহারই প্রতিকূল সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু একথা তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না যে আমি যে বিলটী রচনা করিয়াছিলাম তাহাতে এ ব্যবস্থার আভাষ ছিল না এবং আমি এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলাম ও অবশেষে কেবল সাময়িক-ভাবে ইহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে সেই স্বরাজ্য দলই হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বত্র একশত ষোলটী পৌর প্রতিষ্ঠানে এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রার্থনা করেন বটে কিন্তু তাহা সাধনোদ্দেশে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দ্ধারিতভাগে বিভক্ত করিয়া বিভেদের পথ কার্য্যতঃ আরও প্রশস্ত করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেসনে তাঁহারাই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কর্ম্মচারী নিয়োগ আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই ব্যবস্থা যে ভারতের অখণ্ড জাতীয়তা বিকাশের বিশেষ অন্তরায় তাহা সমস্ত জাতীয়তাবাদীরাই স্বীকার করিবেন।

যাহা হউক কলিকাতা মহানগরীর পৌরশাসন সংক্রান্ত আইনটী যেদিন বিধিবদ্ধ হইল সেদিন আমার জীবনের একটী স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। ১৯২১ খৃঃ নভেম্বর মাসে আইনটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার সময় বলিয়াছিলাম ঃ—

"১৮৯৯ খৃঃ ২৭ শে সেপ্টেম্বর আমি ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলাম। তাহার পর ২২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তখন আমি আশা করিয়াছিলাম যে অদূরবর্ত্তী কালেই আমার জন্ম-নগরী এই কলিকাতা পৌরশাসন বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিবে। আজ সে দিন আসিয়াছে ; বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি সে সৌভাগ্য দেখিবার আজ অধিকারী হইয়াছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার জীবনের কর্ত্তব্য এখনও সম্পন্ন হয় নাই। যে বিশ্বাস আমাকে আজীবন শক্তি দান করিয়াছে এবং যাহা এখনও উজ্জ্বলভাবে আমার অন্তরে বিরাজিত তাহা আজ

সার্থক হইল। প্রার্থনা করি সেই বিশ্বাস যেন আমার অসংখ্য দেশবাসীর হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া ধৈর্য্য ও একাগ্রতার সহিত দেশের স্বাধীনতার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে কার্য্য করিতে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে কারণ স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।"

বিলটী উত্থাপন করিয়া বক্তৃতাশেষে বলিয়াছিলাম "ব্যক্তিগতভাবে ইহা আমার জীবনে এক বিশিষ্ট সান্ত্বনা। আমার জীবনের একটী স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি আমার জন্ম-নগরীর স্বাধীন পৌরশাসনের অধিকারলাভের আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি। বিশ্বপিতাকে ধন্যবাদ যে সে কার্য্য সম্পাদন করিতে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিতে পারিয়াছি। এই বিলটী প্রণয়নকালে আমি আমার আজন্ম সঞ্চিত নীতিগুলি কার্য্যকরী করিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া আমি আজ এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি—যে আনন্দ আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত নিন্দাবাদ ও দোষারোপের গ্লানি আমার মন হইতে মুছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। এই আইনটী আলোচনাকালে বহু তীব্র ও কটু বাক্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আশা করি সে সমস্ত আমরা ভুলিয়া যাইব। যাঁহারা আমাদের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা প্রসন্নচিত্তে এই কথাই মনে রাখিব যে আমরা দেশের সেবা করিতে পারিয়াছি (আনন্দধ্বনি)। আমি এই মহানগরীর অধিবাসীগণের নিকট এই আইনটীর সাফল্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি কারণ সফল হইলে ইহা কেবল তাঁহাদের নাগরিক-বৃত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইবে না পরন্তু স্বরাজলাভের যোগ্যতা প্রদর্শন করিবে (আনন্দধ্বনি)। দলগত ঈর্ষা যেন এই পরিণতির পথে অন্তরায় না হয়।"

নগরের উপকণ্ঠস্থিত কিছু স্থান লইয়া কলিকাতা সহরের সম্প্রসারণ বিলটীর অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য ছিল। এই সম্প্রসারিত অংশের অধিবাসীগণ খাস কলিকাতার সুখ, সুবিধা কিছুকালের জন্য পাইবে না বলিয়া তাঁহাদের কর যাহাতে সেই অনুপাতে কম হয় আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সরকার আমার যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া ইহা

অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভাতেও ইহা গৃহীত হইয়াছিল।

নগরীর চতুঃসীমা সম্প্রসারণ ব্যাপারে আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে স্থানীয় অধিবাসীগণের অনিচ্ছায় এবং তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া এই কার্য্য হইতে পারে না। সেইজন্য আমরা একটী সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এড্‌ভোকেট জেনারেল সেই সভার সভাপতি এবং আর দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সদস্য নিযুক্ত হন। জনসাধারণ এই সভার কার্য্য অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছিলাম।

অধুনা স্বরাজ্যদল পৌর সভার অধিকাংশ আসন দখল করিয়াছেন এবং ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে তাঁহারা দলগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের আধিক্যের সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। অবশ্য এরূপ কার্য্যপন্থা স্বাভাবিক এবং ইহার বহু দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যান্য অংশে পাওয়া যায় কিন্তু ন্যায় বিচারের দিক হইতে দেখিলে ইহা সমর্থন করা যায় না। ইহা জনস্বার্থের প্রতিকূল এবং অবশেষে যে দল এই কৌশল অবলম্বন করে সেই দলেরই ইহা অমঙ্গলের কারণস্বরূপ হয়। ইতিহাসের শিক্ষা এইরূপ যদিও কর্ত্তৃত্বাভিমানী নেতা সাময়িকভাবে ইহা বিস্মৃত হইতে পারেন।

চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের মেয়র পদাধিকারের বিষয় দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুবিবেচনার আমি সম্মান করি এবং সেইজন্যই তাঁহার এই কার্য্যে আমি আরও বিস্মিত হই। পৌরকার্য্যে অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ নাগরিকেরই এই পদ উপযুক্ত। গ্লাড্‌ষ্টোন, পামারষ্টোন্ অথবা ডিসরেলির ন্যায় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদগণের জন্য এ পদ নয় পরন্তু পৌর সেবায় অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ নাগরিকেরই এই সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু তাঁহার সে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও কেবল দলগত আধিক্যের জন্য তিনি উক্ত পদ অধিকার করিয়া বসিলেন।

পৌর শাসন ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনা ও কার্য্যকরী বিভাগ দুইটীকে স্বতন্ত্র রাখিবার নীতি সকলেই অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বরাজ্য-দল এই নীতি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। যদিও আইনানুযায়ী পৌর সভার সভাপতি ও প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ দুইটী বিভিন্ন তথাপি কার্য্যতঃ চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় দুইটী পদই অধিকার করিয়াছেন।

পৌর সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক পাঁচজন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন করিবার ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যাল আইনে করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা দ্বারা যে সমস্ত বিশিষ্ট ও প্রবীণ নাগরিক নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দিতায় দাঁড়াইতে অনিচ্ছুক অথচ যাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান পৌরসভার কর্ম্মদক্ষতা ও খ্যাতি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ নাগরিকগণকে পৌর সভায় যোগদানের সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। আচার্য্য জগদীশ বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণ যাহাতে পৌর সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন সেইজন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং ইহাই ছিল উক্ত বিধান রচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বরাজ্যদল আইনের এই কল্যানকর উদ্দেশ্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহাতে আমি নিরাশ হই নাই কারণ যে স্বাধীন শাসনতন্ত্র কলিকাতা নগরী লাভ করিল তাহা সহজে নষ্ট হইবার নয়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটী ব্যবস্থাপক সভায় পাস হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আমি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করিয়া একটী বিল রচনা করিয়াছিলাম। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট আমি ব্যবস্থাপক সভায় বিলটী আনয়ন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালাদেশের পৌরসভাগুলি ইহার দ্বারা যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। সদস্যগণকে যথার্থ ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান উক্ত বিলটীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সচিবরূপে আমার কার্য্য।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীরূপে উক্ত বিভাগটীকে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় করণের নীতি আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। অবশ্য পারদর্শিতা সর্ব্বদাই আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলি এক হইলে ভারতীয়কে নিয়োগ করাই আমি কর্ত্তব্য মনে করিতাম। অনেক সময় আমাকে বাধা পাইতে হইত কিন্তু আমি তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইতাম। কলিকাতা কর্পোরেসনের চেয়ারম্যানরূপে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে নিয়োগ করিবার সময় আমাকে এইরূপ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

চেয়ারম্যানরূপে মল্লিক মহাশয়ের অসাধারণ সাফল্য তাঁহাকে তাঁহার দায়িত্বপূর্ণপদে স্থায়ী হইতে সাহায্য করিয়াছিল। এই পদটী প্রদেশের মধ্যে অন্যতম দায়িত্বপূর্ণ পদ সন্দেহ নাই এবং মল্লিক মহাশয় তাঁহার কার্য্যদক্ষতার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছেন যে এ দেশের লোক উচ্চ শাসনকার্য্য পরিচালনায় সক্ষম। আমি এই নিয়োগের জন্য কর্পোরেসনের জেনারেল কমিটির ধন্যবাদলাভ করিয়াছিলাম এবং সাধারণে এমনকি চরমপন্থী সংবাদপত্র সমূহ আমার কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়াছিল। কিন্তু তাহা সাময়িক।

আমি সচিব হইয়া আমার বিভাগটীকে ভারতীয়করণের নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম তবে এই নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া আমি কোনওদিন পারদর্শিতার অবমাননা করি নাই। আমি কলিকাতা কর্পোরেসনে এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলাম এবং চিকিৎসা বিভাগেও এই নীতি বহু বাধা সত্ত্বেও প্রয়োগ করিয়াছিলাম। যখন আমি এই বিভাগের ভার পাইলাম সেই সময় ভারত সচিব মণ্টেগু সাহেব বাঙ্গালা দেশে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসের চিকিৎসকগণের

সংখ্যা সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিতে চাহেন। আমি জানাইয়াছিলাম যে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত নয় এবং আরও জানাইয়াছিলাম যে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বিষয়টী বিবেচনা করার পর জানাইব। তদনুসারে আমি সার্জ্জেন-জেনারেলের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী কার্য্যপদ্ধতি স্থির করি এবং আমার পরামর্শ সভার নিকট (Standing Committee) বিবেচনার্থ উপস্থিত করি। উক্ত কমিটি ইহা গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে বিভাগটীকে ভারতীয়করণ আমার রচিত উক্ত স্কীমের উদ্দেশ্য ছিল। ভারতসচিব উহা অনুমোদন করেন।

আমার লিপি পাঠাইবার প্রায় দুইবৎসর পরে উক্ত অনুমোদন প্রদত্ত হইয়াছিল। আমার প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ছিল যে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে সংরক্ষিত সদস্যের সংখ্যা যেন চল্লিশ হইতে কমাইয়া চব্বিশ করা হয় এবং মেডিকেল কলেজের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ যেন সংরক্ষিতদের মধ্য হইতে করা না হয়। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। তাহার উত্তরে যে লিপি আমি পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে নিম্নোক্ত কথা বলিয়াছিলাম :—

"সার্জ্জন জেনারেলের ন্যায় আমিও কলিকাতা মেডিকেল কলেজকে একটী আদর্শ শিক্ষায়তনে পরিণত করিতে ব্যগ্র কিন্তু আমার মনে হয় যে সময়ের ও জনমতের সহিত সমান তালে চলিতে পারিলেই তাহা সম্ভব হইবে। স্বাধীন চিকিৎসকগণ—যাঁহাদের প্রভাব ও পারদর্শিতা দিনে দিনে ভারতীয়দের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে—যদি অংশত এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া অধ্যাপনা করিতে পারেন তবেই সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব। কারণ জনগণের প্রতিনিধিরূপে তাঁহারা সরকারের প্রতিনিধিগণের সহিত সহযোগিতা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব রক্ষা করতঃ এই বিদ্যালয়কে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ্যায়তনে পরিণত করিতে সাহায্য করিবেন।"

যাহা হউক, এই নীতি অনুযায়ী আমি স্যর কৈলাশ চন্দ্র বসুকে

এবং মেজর হাসান সারওয়ার্দ্দিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যথাক্রমে অনারারি চিকিৎসক ও অনারারি সার্জ্জন নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারি এবং ডাক্তার কে, কে চ্যাটার্জ্জিকে নিয়োগও উক্ত নীতির দৃষ্টান্ত। মেডিকেল কলেজে সহকারী সার্জ্জেনের পদে ভারতীয় চিকিৎসক নিয়োগ এই প্রথম। এ সম্বন্ধে একটী প্রধান ইংরাজি সংবাদপত্র নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছিল—

"ভারতবর্ষ ভারতবর্ষীয়গণের জন্য" এই নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই"।

সচিবরূপে কার্য্যকালে আমি বাঙ্গালাদেশে চিকিৎসা বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিয়াছিলাম। বাঙ্গালায় এইরূপ শিক্ষালয়ের একান্ত অভাব। এ দেশে অধিবাসীগণের প্রতি চল্লিশ হাজারে একজন ডাক্তার কিন্তু বিলাতে প্রতি আঠারশততে একজন। আমার কার্য্যকালে আর্থিক অনটনসত্ত্বেও মৈমনসিংহে একটী চিকিৎসাবিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল এবং চট্টগ্রাম, বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতে অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়াছিলেন।

মন্ত্রীগণকে এই বলিয়া আক্রমণ করা হইত যে তাঁহারা জড় ও অক্ষম এবং এমন সমস্ত কার্য্যের জন্য তাঁহাদের দায়ী করা হইত যাহার দায়িত্ব কোনমতেই মন্ত্রীদের ছিল না। টাউনহলে একটী সভায় রাজবন্দীদের অন্তরীণ করার জন্য মন্ত্রীদের আক্রমণ করা হয় কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। আসাম হইতে আগত ধর্ম্মঘটকারী কুলীরা চাঁদপুরে যখন এক উৎকট অবস্থার সৃষ্টি করে তখনও আমাদের দোষ দেওয়া হয়। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে চাঁদপুরে যাইতে বলেন। আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্যর হেনরি হুইলারের (Sir Henry Wheeler) সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে যেহেতু তিনি চাঁদপুরে যাইতেছেন সেই জন্য আমার যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি সেখানে গিয়া কয়েকদিন অবস্থান করতঃ

ব্যাপারটীর বিশদ তথ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সদস্য কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয় আমাদের এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে জনগণের প্রতিনিধি হইয়াও আমরা শ্রমিকগণের দুঃখ-নিবারণের কোন ব্যবস্থা করি নাই। তিনি এই কথা বলিবার পর আমি যখন জানাইলাম যে চাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের নিকট হইতে কলেরার প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাইবামাত্র আমি ছয় সহস্র মুদ্রা ও নয়জন চিকিৎসক প্রেরণ করিয়াছিলাম তখন তিনি এই বলিয়া বসিয়া পড়েন যে তিনি উক্ত সংবাদ জানিতেন না।

এই সূত্রে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উত্তর বঙ্গের এক বিশাল ভূখণ্ডের উপর বন্যার ভয়াবহ লীলার ফলে বহু জীবন ও অর্থ সম্পদ নষ্ট হইয়াছিল। আমি তখন দার্জ্জিলিংএ ছিলান। এ ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট বিভাগটী আমার অধীন ছিল না। সেবা ও চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল বটে কিন্তু আমি বন্যাপ্রপীড়িত স্থানটী দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম এবং ভাবিলাম যে আমার উপস্থিতি সেবাকার্য্যে প্রেরিত লোকদিগকে উৎসাহিত করিবে।

এই স্থির করিয়া কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরদিন যাত্রা করিলাম। প্রখর রৌদ্রে আমরা বিশ মাইল ট্রলি গাড়ীতে করিয়া যাইতে লাগিলাম—রেলের উভয় পার্শ্বে পশ্বাদির মৃতদেহ বারিরাশির উপর ভাসিতেছিল। সে করুণ দৃশ্য দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম।

পরদিন দার্জ্জিলিংএ ফিরিয়া গিয়াই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির একটী সভায় যোগদান করি। এই পরিশ্রম আমার দেহ সহ্য করিতে পারে নাই এবং তাহার ফলে আমি দারুণ জ্বর ও ফুসফুসের প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হই। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক স্যর নীলরতন সরকার প্রভৃতির সেবা ও যত্নে সেযাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি একদল সংবাদপত্র আমার কার্য্যে

কোনরূপ জনসেবার স্পৃহা দেখেন নাই যদিও ঐ জন্য আমি প্রায় মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

এই স্থানে স্যর নীলরতন সরকারের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা তাঁহার জনসেবার স্পৃহারই পরিচয় দেয়। তিনি কেবল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক নহেন পরন্তু একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ, জননায়ক, সমাজসংস্কারক ও দেশীয় শিল্পপ্রসারের অগ্রণী। তাঁহার জীবনী হইতে সকলেরই শিক্ষার বিষয় আছে। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে তিনি মেডিকেল কলেজে আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী উজ্জ্বল রত্নরূপে পরিগণিত হন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বৈত-শাসন।

নিজের প্রচার কার্য্য অপেক্ষা শাসন সংস্কারকে সমর্থন করিবার জন্যই আমি আমার মন্ত্রী থাকাকালীন কার্য্যাবলির বিশদ আলোচনা করিয়াছি। ব্যবস্থাপক সভায় ও বাহিরে প্রায়ই শুনা যাইত যে শাসন সংস্কার অর্থহীন। নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব হইতেই চরম-পন্থী সংবাদপত্রগুলি ইহার তীব্র প্রতিকূলতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সেই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নূতন সংস্কারানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। মেষ্টন ব্যবস্থা (Meston Award) সুষ্টুভাবে কার্য্য করিবার পথে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল এবং অর্থ নৈতিক অসচ্ছলতার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পসংক্রান্ত বিষয়ে নূতন কল্যানকর পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। ব্যবস্থাপকসভার প্রথম মিয়াদকাল উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় এই প্রচার কার্য্য চালান হইতে লাগিল যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা সফল হয় নাই। নূতন শাসন ব্যবস্থার প্রধান বিষয় ছিল এই দ্বৈতশাসন। অতএব উহার অসাফল্যের অর্থই ছিল নূতন্ শাসন পরিকল্পনার বর্জ্জন। ইহার বর্জ্জনের পর সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশীল শাসন অথবা পূর্ব্বের ন্যায় বিভাগতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা বিলাতের পার্লামেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছিল।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদিও ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল তথাপি একেবারেই পরিপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন শাসন প্রবর্ত্তন পার্লামেণ্টের নীতির অন্তর্ভূক্ত ছিল না। ব্যবস্থাপক সভায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া পার্লামেণ্টকে সেই নীতি হইতে বিচ্যুত করা সম্ভব নয় বলিয়া আমার মনে হয়। ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে এইরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি যদি বাহিরে বিদ্রোহ সৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ হয় তাহা হইলে একরূপ বুঝা যায় কিন্তু কেবলমাত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত থাকার কোন অর্থই হয়

না। এইরূপ বাধাদ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পতন হইবে না বরং ইহার ফলে পুরাতন স্বৈর শাসন পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে আমরা কোনদিন দ্বৈত শাসন পদ্ধতিকে আদর্শ শাসন-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করি নাই বরং অনেকেই ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। আমরা ইহাকে স্বায়ত্তশাসনের প্রথম স্তর রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং সেইজন্যই ইহা সমর্থন করিয়াছিলাম।

যাঁহারা দ্বৈতশাসনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মতে ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অর্থহীন হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় বাঙ্গালাদেশে ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। ইহা আরও অধিক সফল হইত যদি অর্থনৈতিক অসাচ্ছল্য না থাকিত। মেষ্টন ব্যবস্থা ও রাজস্ব বিভাগের জন্য আমার বিভাগে বহু জনহিতকর কার্য্য সম্ভব হয় নাই।

মেষ্টন ব্যবস্থা বাঙ্গালাদেশের আয়করের অর্দ্ধভাগ হইতে দেশকে বঞ্চিত করিয়া এবং পাট করের সমস্ত কেন্দ্রীয় তহবিলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া এই দেশের উপর সত্যই এক অবিচার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। বাঙ্গালাদেশে শাসন সংস্কারের সফলতার সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হইতে পারিতেন না যদি আমাদের অর্থসাচ্ছল্য থাকিত এবং জাতীয় গঠনমুলক বিভাগগুলিতে আরও অর্থ ব্যয় করিতে পারিতাম। নদীতীরস্থ কতক-গুলি মিউনিসিপ্যালিটীতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল কিন্তু অর্থের অভাবে সেগুলি কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

অন্যান্য বিষয়ে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা অথবা চাকুরীতে নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা আমাদের কার্য্যে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে নাই। সভাপতি নির্ব্বাচনের ক্ষমতাসম্পন্ন পৌরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটিগুলির গঠনতন্ত্রের উন্নতিবিধান করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী বিল আনীত হইয়াছিল।

স্থানীয় বোর্ডগুলির গঠনতন্ত্র প্রসারিত করা হইয়াছিল এবং তাহারা সকলেই এক্ষণে বেসরকারী সভাপতি নির্ব্বাচনের অধিকারী। যখন আমি কার্য্যভার গ্রহণ করি তখন পাঁচটী জেলাবোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ছিল না। শীঘ্রই সে সুবিধা অর্পিত হয়। কলিকাতা পৌরশাসন সংক্রান্ত বিধান আমার কার্য্যকালে এক অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা। অন্যান্য বিভাগেও যথাসম্ভব উন্নতি করা হইয়াছে। বৃক্ষ ফলের দ্বারা পরিচিত হয়। এই সমস্ত ঘটনাসত্ত্বেও কি ভাবে বলা যায় যে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা সফল হয় নাই ?

অবশেষে আমার সচিবত্ব গ্রহণের স্বপক্ষে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি আমার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের তীব্র নিন্দা করিতে থাকে এবং চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় নির্ব্বাচন দ্বন্দে এই মন্তব্য তীব্রভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমার অপরাধ আমি সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলাম। এই প্রতিকূল সমালোচনার উত্তরে আমি ইহাই বলিতে চাই যে আমি আজীবন স্বায়ত্তশাসনের জন্য চেষ্টা করিয়াছি। ভারতবর্ষে যখন কেহ ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই তখন হইতে আমি এ বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। কেন্দ্রীয় পরিষদে মাত্র দশবৎসর পূর্ব্বেও আমাকে অধীর আদর্শবাদী বলা হইয়াছিল। আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সরকারের সে মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সক্ষম হয়। ২০শে আগষ্ট তারিখের প্রচার আমাদের সাফল্যেরই নিদর্শন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী যে জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছিলাম তাহারই সাফল্যের জন্য যখন সরকার পক্ষ আমাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিলেন তখন সেই যথার্থ ও ঐকান্তিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবি নাই। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে তাহা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইত। সেইজন্য অকপটে আমি সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহাই প্রায় বলা হইত। কিন্তু সত্যই আমাদের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

সরকারই সময়ের চাপে স্বীয় পুরাতন মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। আমাদের ও সরকারের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে যেরূপ দ্রুততার সহিত নবীন ভারত তাহার চিন্তাধারা ও আশা আকাঙ্খার পরিবর্ত্তন ও অগ্রগতি সাধন করিতেছিল সরকার পক্ষ তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

আমার কয়েকজন বন্ধু এই গ্রন্থে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনলাভের উপায় সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও এখন আমার স্বাস্থ্য ভালই আছে। স্বাস্থ্যরক্ষা জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য কারণ অন্য সমস্ত বিষয় এই স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। দেহযন্ত্র ঠিক না থাকিলে অন্য কোন কার্য্যই ইহার দ্বারা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই অল্পবয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ এবং অন্যান্য মণীষীগণ অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। "দেবতারা যাঁহাদের ভালবাসেন তাঁহারা শীঘ্র পরলোক গমন করেন"—এই প্রাচীন লাটিন প্রবাদ বাক্যটী তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দেশবাসীগণ কত অধিক লাভবান হইতেন যদি এই সমস্ত মণীষীগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও পরিণত বুদ্ধি দ্বারা দেশের সেবা আরও অধিক দিন করিতে পারিতেন।

নিয়মিত ব্যায়াম দীর্ঘ ও সবল স্বাস্থ্য লাভের প্রধান উপায়। আজীবন, এমন কি এখনও, আমি প্রাতঃকালে অর্দ্ধঘণ্টা ও বৈকালে ৪০ মিনিট কাল ব্যায়াম চর্চ্চা করি। আমার মতে ভ্রমণ শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। যৌবনে ইহা ব্যতীত আমি dumb-bell ও মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিতাম।

মিতাচার ও সংযম দীর্ঘজীবন লাভের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ভোজনের ও নিদ্রার সময় ঠিক থাকা প্রয়োজন, কারণ দেহ একটী যন্ত্র এবং সময়মত সেই যন্ত্রের প্রয়োজন পূর্ণ না হইলে তাহা বিকল হইবার সম্ভাবনা। আমার জীবনে আমি অধিক রাত্রে ভোজন ও উৎসবাদি পরিহার করিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছি। 'প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ও

সকাল সকাল শয়ন' করিবার নীতি যাহা আমি বাল্যকালে টডের 'Students' Guide' নামক পুস্তকে পড়িয়াছিলাম তাহা আমি চিরকাল অভ্যাস করিয়া আসিতেছি।

অধিক রাত্রি না করিয়া শয্যাগ্রহণ আমার জীবনের অভ্যাস এবং আমার স্বাস্থ্যের ইহা একটী কারণ বলিয়া মনে করি। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ সম্বন্ধে আমি তত অধিক নিশ্চিত নহি। আমি সাধারণতঃ আট ঘণ্টা নিদ্রা যাই—সময়ে সময়ে নয় ঘণ্টা এমন কি দশ ঘণ্টাও নিদ্রা যাই। নিদ্রা আমার একটী বিশেষ ভোগ এবং ইহা আমার পরিবারের একটী বিশেষত্ব। যখন আমি নিদ্রা যাই তখন আমি সাংসারিক চিন্তার বিষয় সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই এবং গাঢ় নিদ্রার ইহা একটী কারণ। প্রথমে ইহার জন্য মানসিক শক্তির প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু কালক্রমে ইহা অভ্যাসে পরিণত হয়। আমার মনে হয় অত্যধিক মস্তিস্ক পরিচালনা শরীরের কোন ক্ষতি করিতে পারে না যদি ইহার জন্য গাঢ় নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না হয়। বরং ইহাতে শরীর ভাল হয়।

খাদ্য সম্বন্ধে আমি কিছু বলি নাই। মাদক ও ধূমপান স্বাস্থ্যের বিরোধী। আমি এই দুইটী হইতে বিরত থাকিয়াও জীবনে বিশেষ অসুখ অনুভব করি নাই। জলবায়ু ও জাতীয় বিশেষত্বের উপর আহারের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। ইউরোপবাসীগণ মাংসাশী, ভারতীয় নিরামিষাশী। বাঙ্গালীরা মৎস্য ভোজন করে। জাপানী ও বাঙ্গালীর মধ্যে আহার সম্বন্ধে ঐক্য দেখা যায়। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম আহার গ্রহনীয়।

সবল দেহ ও সুস্থ মন শ্রেষ্ঠ পার্থিব সম্পদ। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে স্বচ্ছ বিবেক, দুশ্চিন্তা, ঘৃণা ও অসূয়া পরিহার এবং মানসিক শান্তি ও সকলের প্রতি প্রীতির একান্ত প্রয়োজন। শরীর ও মন পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং একটী অপরকে শক্তি দান করে।

আমার জীবনস্মৃতিতে আমি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। দেশের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ইহাতে বলি নাই। ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কারককে যে দৈবী শক্তির সহিত লড়াই করিতে হয় তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক খাটে না। পুরুষানুক্রমে যে ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা দূর করা অত্যন্ত কঠিন। এই সকল সামাজিক প্রথা যাহা স্বর্গীয় আদেশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহারা কেবল ভগবানের প্রেরিত অবতার স্বরূপ মহামানবগণের নিকট সঙ্কুচিত হয়। ঐ সমস্ত মহামানবগণ যখন ঐরূপ প্রথাগুলির নিন্দা করেন তখন সাধারণ নরনারীরা তাঁহাদের বাণী পুরাতনের বিদায় ও নূতনের আবাহনরূপে গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ অবতার ছিলেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় তিনিও জাতিবিভেদ বিরুদ্ধে তাঁহার অবিনশ্বর বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি পুরাতনের বিনাশ সম্ভব হয় নাই এবং এখনও নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব এ দেশে চলিতেছে। সামাজিক ব্যাপারে উন্নতি ধীরে ধীরে হইতেছে কারণ মহৎ লোকের সংখ্যা অধিক নয়।

প্রত্যেক হিন্দু পুরুষানুক্রমে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে তাহার ফলে সে যে কিছু পরিমাণে গোঁড়া ধর্ম্মভাবাপন্ন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম আছে। ব্রাহ্ম সমাজের যে সমস্ত সদস্য তাঁহাদের জীবনে সামাজিক ব্যাপারে পুরাতন ব্যবস্থাগুলিকে বিদায় দিয়া নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন নাই তাহারা সকলের নমস্য। আমি কিন্তু কোনও দিন ব্রাহ্ম সমাজের নূতন ভাবগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঐ সমস্ত ভাবগুলি ক্রমে ক্রমে গ্রহণীয় বলিয়া আমি মনে করি।

এইস্থানেই আমার জীবনস্মৃতি সমাপ্ত করিতেছি। আমাদের সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ পড়িয়া রহিয়াছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এখনও মরুপ্রান্তর আমরা অতিক্রম করি নাই। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা

আমার সহযাত্রীদের উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি এই জীবনস্মৃতি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমার এই জীবনস্মৃতি হইতে কি শিক্ষণীয় আছে ? এই সূত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কয়েকটী কথা মনে পড়িতেছে। বরোদার প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন "এক পুরুষের মধ্যে আমরা কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিলাম এবং এই পরিবর্ত্তন সাধনে আপনার দান কত অধিক !" বাস্তবিক ইহা এক রক্তপাতহীন বিপ্লব।

হিন্দুরা বিপ্লব পরিহার করিয়া ক্রমিক বিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে আমরা প্রকৃতির নিয়মে চালিত হই। মানবজীবনে যেরূপ ক্রমিক বিবর্ত্তন দেখা যায় সেইরূপ অন্যান্য বিষয়েও ঐ নীতি কার্য্য করিতেছে।

অসহযোগ আমাদের নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিতে পারে বটে কিন্তু ইহা আমাদের পৃথিবীর অন্যান্য অংশের শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে অবস্থায় আনয়ন করিবে তাহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের জাতীয় জীবনে অগ্রসর হইতে হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু এই যাত্রাকালে আমরা যেন চতুষ্পার্শ্ব হইতে অপরের সভ্যতা ও কৃষ্টির সারাংশ গ্রহণ করিতে না ভুলি।

সমাপ্ত।

Supplement to

THE NATION IN MAKING

মহাজাতি গঠন-পথে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের

জীবন-স্মৃতির

পরিশিষ্ট ।

CONTENTS.

AN EPITAPH.

He was a born orator, the like of him India has seldom seen. He may truly be styled the hero of thousand platforms. He roused such enthusiasm, response and devotion for the cause he pleaded that people made it their own and they followed him like one man. His mission in life was to secure political freedom for his motherland. He maintained that this could only be done by promoting unity and an intense feeling of nationalism amongst the diverse people of India. To that end he dedicated his life. His achievement in this respect may be summed up in the tribute paid to Bengal in the hey-day of Sir Surendranath's career that " What Bengal thinks to-day, the rest of India thinks to-morrow."

He was the friend, philosopher and guide of the student community from the beginning of his career. He led an examplary life for their sake and was a non-smoker and total abstainer all his life.

He was lionized all his life and often styled an uncrowned King, but he was the simplest and meekest of men. He never gave himself any airs.

Even princes and high personages sought his company but he was the happiest in the company of co-workers and colleagues in humble stations of life with whom he could talk freely and laugh heartily. He often disarmed his opponents by the goodness of his nature, cordiality of his manners and affability of his speech.

By his long and devoted services to his motherland, his self-sacrifice, courage and love of liberty and freedom and selfless and lifelong work for the promotion of unity and nationalism amongst his countrymen, he would take rank in history as one of the great nation-builders of the world.

The Late Sir Surendranath Banerjea.

(From the Calcutta Weekly Notes, 10th August, 1925.)

Sir Surendranath Banerjea is dead. But the inspiration of his public utterances, the example of his life-work will live for ever to guide the future generations of India in the path of duty to their motherland and fellow beings. Like Rammohan Roy and Iswar Chandra Vidyasagar he was one of the makers of modern India. Each one of this immortal trio drew much enlightenment, culture and inspiration from what is best in modern civilization, blended them with what was best in our own and dedicated their lives to uplift their motherland to the high pedestal that she once occupied in the ancient world. Sir Surendranath's life is so crowded with events that it is impossible to give even a brief resumé of it in our columns. In the recently published reminiscences of his life which has been styled by his publishers "A Nation In Making," he has said very little about himself. It would take volumes to give an account of this nation-builder who made the political emancipation of his people the sole mission of his life. No man in India has worked so hard and worked so long and so selflessly and ceaselessly for the accomplishment of his ideals. On one side of his death-bed lay the plain silver watch which was the constant companion of his life-time and which had helped him to regulate every minute of his day's work including the taking of periodic rest, relaxation, recreation and meals for renovating him for further work all through his long and eventful career. His public career is too well-known to require recapitulation. Like Mazzini his dream from early life was to see India united by a common bond of nationalism. But as a keen student of English history and constitution he preferred the path of reformation to revolution. He honestly believed that if India made an united demand for Self-Government on Dominion lines, England would never be able to refuse the

demand. He began his political career by promoting a unity movement all over India and the Indian National Congress furnished him with a congenial platform for popularizing his political ideals. His unity movement had to undergo the severest test during the Partition of Bengal and testified to the triumph of his lead and guidance after prolonged trial and severe ordeals lasting over seven long years. From 1905 and 1912 he brought about such unity in Bengal that the Partition, which was repeatedly declared by the Executive in India and England alike to be a "settled fact," was unsettled. The Reforms of 1919 were largely the fruits of his life-long labours. He used to regard it as a half-way house and he fully believed that the day we could do away with dissensions amongst ourselves we shall be masters in our own house.

He has been much abused for having accepted the Ministry. But he was in honour bound to work out the Reforms, which he had accepted as a provisional measure after prolonged negotiations. As a minister he made the District Boards and Municipalities autonomous bodies in Bengal. He gave the Calcutta Corporation a democratic constitution. He fought hard to do away with communal representation. He had his way in appointing an Indian for the first time as the Chairman of the Calcutta Corporation against stubborn official opposition. In the face of like opposition he gave a number of appointments in the medical department, which was formerly the preserve of the I. M. S. recruited from England, to well-qualified Indian medical men, and that proved to be as unqualified a success as the former. No body can lay charge against him of having jobbed any appointment in his gift. During the Chandpur cooly exodus, he went out of his way to help the poor sufferers, though such relief did not fall within the scope of his department. During the North Bengal flood he trollied all over the worst affected parts in the burning sun in indifferent health, which likewise was no concern of the department in his charge, and

went back to Darjeeling with high fever and broncho-pneumonia. After alighting from train in such a state of health, he attended a Select Committee meeting on the Calcutta Municipal Bill and that prostrated him and shattered his health for good. He was all this time the victim of misinformed misrepresentation but he never complained. Work and duty in life was his religion. He used to say, even before his closing days, that he knew of none higher. In his retirement when his health had broken down, it was his strength of mind and buoyant spirit that kept him up. His mind, intellect and memory were as keen as ever. Though his body had failed, his spirit and faith in the future were never wanting. He often used to say that he would like to live another ten years, not to cling to life, but to see the consummation of his life-work; to see India united once again and see her firmly established in the path of Self-Government. He often repeated to the visitors that if we closed in our ranks no earthly power could resist our just demands and he could not comprehend what good would come out of creating bad blood amongst ourselves and between us and England. He was, however, a robust optimist and believed that the present dissension and division amongst us was but a passing phase of our national life and that our people would soon be convinced that united we would rise, and divided we would fall.

The closing chapter of his life when it comes to be written will reveal all that was sublime and beautiful in a man. All through life he has been a people's man. Be it in the Bengalee Office or in the Minister's Chamber in the Secretariat, be it in the days of dire adversity or of later prosperity, the highest or the lowest, the richest or the poorest were equally welcome to him. He would never turn away a man who had a grievance, or a man who had suffered for his country. Leakat Hussain, for instance, who knows neither English nor Bengalee, and has during the last two decades led procession of boys and given ex-

pression to his thoughts and ideas in Urdu which the boys only imperfectly understood and who since the days of Partition has been more than half a dozen times imprisoned or bound down for political offences, who has led a life of want and poverty and lived on precarious voluntary gifts, occupied always a soft corner in Surendranath's heart and he has assigned him a place of honour in his reminiscences. Surendranath's attire and habits often brought on him the ridicule of his old bearer who predeceased him and he used to enjoy a hearty laugh over his ideas of propriety and impropriety. He used to crack jokes at him or make fun of him when he wanted some diversion after hours of hard work and he never got reconciled to the loss of this devoted companion of his. With all his fund of fun and frolic he would, however, brook no disturbance from even the best of his friends or nearest or dearest of his relatives when he was at work. But when he wanted relaxation he would be jovile like a child and few men had keener sense of humour and could laugh more heartily. He never bore anybody any malice.

Popularity and fame came to him unsolicited because he devoted all his energy, talent, command over language, power of expression and the rare qualities of head and heart with which God had endowed him in the service of his country and people. But he never hunted for it. Honesty and regard for truth were the guiding principles of his political career. He used to say that he would never knowingly give his people a wrong lead or mislead them and he would always say what he believed to be to their best interest even at the risk of getting unpopular. In his retirement he had freed himself from all passions, desires and vanities of life and had made up his mind to continue to work to the best of his powers for the fulfilment of the ideals of a life-time till his end came and he religiously kept to his determination till his strength failed him. As Rammohan Roy was the apostle of the spiritual and social emancipation of modern India so Surendranath was the

apostle of India's political rebirth and he set her children on their feet to march on in the path of modern ideals for taking an honoured place amongst the progressive nations of the world. The educated community of to-day may not be all followers of the faith founded by Rammohan Roy but who amongst them is there who would deny its potent influence in the enlightenment of our thoughts, ideas and culture. In the same sense Surendranath, more than anybody else, has been a maker of modern India. In the last days of his peaceful life he never desired to have any hysteric or histrionic demonstration over his services to his motherland. He was in perfect peace of mind in the faith that he had done his duty to God and man and that it is through work (*karma*) alone that a man as also a nation can attain salvation. Work to him was the sole *dharma* of his life. He used to say that his ashes would float down the Ganges, on the bank of which he lived and find their eternal resting place in the body of his dearly beloved motherland and his spirit would hereafter find its most congenial home in the mind of his fellow-beings through which alone God reveals himself to mankind. On the evening of the 6th of August, the eve of the inauguration of the *Swadeshi* movement 20 years ago, his flaming funeral pile lit up the sky above and the brimful bed of the Ganges below adjoining his lovely garden and villa, when the western sky was aglow with the rays of the setting sum. His mortal remains were then washed away by the rising tide and the smouldering embers of the funeral fire were quenched by a welcome shower, and thus Mother Nature amidst a scene of sublime beauty and pathos dropped the curtain of nightfall on a great and glorious career. (29 C. W. N. cxcvii.)

Speeches of Sir Tej Bahadur Sapru and Mrs. Sarojini Naidu.

DELIVERED ON 31ST AUGUST, 1941.

(*Reproduced from the Amrita Bazar Patrika, 1st of September, 1941.*)

In unveiling the statue of Sir Surendranath Banerjea, Sir Tej Bahadur Sapru said:—

"It is a unique privilege which Bengal has conferred on me. In coming to Calcutta on this occasion I have felt that my visit is really in the nature of a pilgrimage, pilgrimage undertaken by one who looked upon Surendranath Banerjea as his 'Guru.' I am free to confess that he was the inspirer of my youth. In my college days when I was reading at Agra it was his speeches on Indian unity, on Mazzini and on various other subjects which produced an indelible impression on my mind. I began to think seriously of politics as a means for the liberation of India of which Sir Surendranath Banerjea in his life-time was the greatest pioneer and the torch-bearer.

To the younger people who may be here I will venture to say that his autobiography is one of the most valuable documents full of lessons for them. Barely had he passed the Civil Service examination in England he had to face difficulties and adversities. Who does not know that after having passed the examination,—the Civil Service examination in the end of the sixties was very different from what it is to-day—having gone away 6,000 miles away from his own country, having taken leave of his father whom he never saw again—having passed the examination he was ruled out on a technical ground that his age was more than that permitted by the rules. But Surendranath was not the man who

knew to submit without a struggle to adversities. It was then and there he took the matter to the Court of law in England and got a decision in his favour. That was his first victory against personal adversities in life. He had been barely four or five years in the service when he was turned out of the Civil Service on a charge which his accusers should have felt ashamed to bring against him and indeed they did feel ashamed. Even then he did not take that lying down. He struggled to justify himself, to vindicate his character. He went to England again in order to fight for his honour. But as ill luck would have it, he failed.

SURENDRANATH'S ADVERSITIES.

Any person with a less stronger personality, with a less stronger determination would have succumbed to it and the world would have heard no more of him. But while he carried on with the adversities Surendranath laid, and I use the word deliberately, the foundation for that great career of patriot and orator which was awaiting him.

How many young men are prepared to face the adversities in the prime of their life and then prepare themselves for the public service in the manner Surendranath Banerjea prepared himself? He came out to India and raised certain issues which in the present-day politics would perhaps bring smile on the lips of our advanced politicians. Little they do realise that the man was struggling against those forces of adversities not in the year 1941 but in the seventies of the last century.

You of the present generation have no right to judge him by the standard which has come into vogue 60 years later. I have already said that he was the pioneer and the torch-bearer of India's freedom. He took the torch from Calcutta to Allahabad, from Allahabad to Aligarh where the great Sir Syed Ahmed presided over

his meeting. He preached Indian unity. He never thought in terms of Hindus or Mussalmans, Bengalees or Hindusthanis or Punjabis. To him India was India, —an indivisible motherland. That was the spirit in which Surendranath Banerjea lived and worked all his life.

FATHER OF NATIONALISM.

I do not claim perfection for his work. He might have many faults and shortcomings. But when you judge of the career of Surendranath Banerjea, do not forget that he was the father, a very true father of that nationalism by which you swear to-day. He saw the vision of the future which perhaps has not yet been realised but when that is realised do not forget that it was Sir Surendranath Banerjea who first saw that vision, who spoke in terms of that vision, who brought the convention nearer and nearer every day to the realisation of that vision. It is all very well for us, the present generation, in the pride of our power and influence, with the wealth of the slogans which we have invented to run down a career like that of Surendranath who lived in sixties, seventies, eighties and nineties of the last century and carried on the struggle up to the time of his death when many of the present-day leaders were not born or at any rate were not born to their present fame. It would be sheer ingratitude on the part of you to dismiss him with the shrug of shoulder or smile as if Surendranath Banerjea does not count for anything in the evolution of our national life. I venture to think that when the true history of India is written and written not in a propagandist spirit, not with a view to enhance some reputation and to submerge other, but, when the history of India is written with a proper desire to assess the contributions of various men who have led to the building of its life, Surendranath Banerjea's place will be very high and will be very secure.

SURENDRANATH AND GOKHALE.

"I confess that Surendranath Banerjea had the completest hold over my mind. I confess that I have drawn such inspiration in practical politics as I have been able to do from men like Surendranath Banerjea and later from men like Gopal Krishna Gokhale. Yet, to-day when I find these men being relegated into the limbo of obscurity I wonder to myself what the next generation of men would like to think of the men who are now shining in the bright light of the present-day politics. And yet it seems to me that there are some whose reputation may suffer eclipse for the time being but in the long run their position in the history of the country is absolutely safe. I venture to say that 30 or 50 years hence when the present controversies have died down and when we have recovered an impartial frame of mind, a rational method of judging men and measures, we shall then say that this was a great patriot, that this was great a man who saw the vision and put us on the path to the realisation of that vision.

"I would, therefore, ask you not to take up individual matters connected with the life of Surendranath Banerjea, not to think too much of his withdrawal with 26 other members from the Calcutta Corporation or to think of the thousands of meetings which he addressed in Bengal in the days of the anti-partition agitation which ultimately led to the unsettling of what was then called a settled fact. But I would ask you to remember the spirit which filled all his works. Apart from that there was one aspect of his life to which I shall particularly invite your attention. If you read his autobiography you will find constant and repeated references to the youths of Bengal. He did not hesitate to say that even in his old days he re-invigorated himself by the company of the youth. The youth of the country was to him like children; he took personal interest in them, stirred them, inspired them and fired their imagination.

A LIFE OF SACRIFICE.

"Surendranath Banerjea to my mind has left a very rich legacy for us, his countrymen behind, a legacy of a noble example of a life lived in the services of the country, a life of sacrifice, a life which made no distinction between one section of the population to another. That is the lesson which you can to-day draw from his life. Do not imagine of one thing or two things or three things which he did. They all recede into the background when you take a view of his life in its proper perspective.

"You are now raising a statue to him. I think that is the least which you can have done. Frankly speaking I think it is not a minute too soon that you have realised your responsibility in this matter or that you have made up your mind to discharge the highest obligation to the memory of the greatman. It was my privilege to have been associated with Surendranath Banerjea in the old Imperial Council, and let me here refer to an instance. When the Rowlatt Bill about which there was so much excitement in Bengal was introduced in the Legislative Assembly of the old days, Surendranath Banerjea and I were working hand in hand. It was one afternoon that Sir George Lowndes, the then Law Member, came into the committee room in which both of us were working and begged us to go with him to his place. I am disclosing this fact after nearly 25 years. The Law Member discussed the Rowlatt Bill with both of us. Surendranath Banerjea said that on the question of policy he had a decided view. Then he added that he should not commit himself to anything except that he was going to oppose it tooth and nail in the Assembly. On the question of law, Surendranath Banerjea told the Law Member that he left it to the speaker. He and I met together and we then decided that we have got to oppose and we must oppose the Bill.

If you read the speeches of those days in the Assembly you will find that among the staunchest opponents of that Bill was my friend Mr. Jinnah and myself led by Surendranath Banerjea. I shall not mention here the name of the newspaper which came out with a report within two days of our visit that Surendranath Banerjea and Tej Bahadur Sapru and Mr. Srinivas Sastri had been bought over by the Law Member and they had been given at least two launches. I was a youngman in those days and felt that criticism very keenly. I spoke to Sir Surendranath: "This was simply disgraceful." He said: "My dear boy, you have yet to grow and get accustomed to this. You will flourish on this." I do not mind saying that Surendranath was right. Therefore it would be a mistake to suppose that Surendranath Banerjea was merely a lover of popularity or popular fame. He knew where to face the populace and when to incur unpopularity and when he did court unpopularity, he had the moral courage to stand by his conviction rather than shine in the glaze of mere popularity.

A CONSTITUTIONAL THINKER.

Surendranath was not a politician in the sense that agitation was the breath of his nostril. He was a builder, he was an architect, he was a constitutional thinker. It was in this spirit that he worked. No one of his size, of his stature, was attacked in later years more than Surendranath Banerjea by that press, by those followers which swore by him a few years before. Yet when I saw him in the Bengal Secretariat I did not find a trace of bitterness in his face. He said and these were his exact words. "My dear boy, things would right themselves. Don't worry."

In conclusion Sir Tej Bahadur said: I am not going to flatter, you, Bengal friends, when I say that the record of greatmen Bengal had produced in every walk of life from Raja Rammohan Roy,—and let me tell you that

although I am not a Bengalee, I am far more familiar with Bengal's history and Bengal's movement than you probably imagine,—the record of greatmen that Bengal has produced from the time of Raja Rammohan Roy up to the time of Rabindranath Tagore, has been continuous, great, and unrivalled. Bengal 20 years ago, 25 years ago was the leader among the provinces. What Bengal thought one day was reflected the next day all over India. But have you ever thought why it was so during the last 50 years? It was mainly because of Surendranath Banerjea. You in Bengal scarcely know what an asset he was to you and to the rest of India. He was probably Bengal's greatest asset in Bengal's leadership for the regeneration of India.

It was such a man for honouring whose memory we have assembled to-day. I therefore tell you out of sincerity of my heart that you are doing nothing more than what your duty simply requires. I do say once again that whether you have erected this memorial to Surendranath Banerjea or not, the future historian who would write the history of India's struggle for the recovery of freedom and political regeneration, would give Surendranath Banerjea a place very high on the top of the page.

Mrs. Sarojini Naidu's Tribute.

Mrs. Sarojini Naidu said:

That it was a very great privilege that she had been stampeded into saying a few words to-day. They observed that her name was not in the printed programme but she was one of those exploited people of India and on an occasion like this, a most willingly exploited in a good cause.

Referring to the statue which had been unveiled, she said that they could only see the lower part of that gigantic statue in the orator's pose with one leg forward, a pose in which many of them had se m year after year at great assemblies he used to with his oratory. She remembered one occasi at a great banquet given by the great patriot, haraja of Mahmudabad at Lucknow at the c of the Congress session of 1916. She had tl to sit next to Surendranath and the speech he had made at the Congress was ringing in her ears. She said to him, what a marvellous voice he had. He returned to her with a smile and said: Do you not know, Mrs. Naidu, that Bengal's gift to you and to me is the gift of oratory. It was addressed to one who was trying to follow in his footsteps but it was the confirmation of his great debt that was his heritage from this land of Bengal.

Sir Tej Bahadur Sapru has reminded us of the various things in his own inimitable fashion that it was not the number of meetings he addressed at the partition of Bengal, it was not the withdrawal from the Municipality of Calcutta, it was not things of these incidental details of life that matters; it was the man and the great spirit that counted. If for a single moment there has been a feeling of non-recogni-

tion of that supreme greatness in our midst, it has been but the passing folly of the young generation; it had no deeper significance than that. Because , after all what we are to-day in our generation is the rightful evolution of what he taught. He sowed the seed and we are the harvest. We are his children; we are his pupils; we are the substance of the fulfilment of his dream. If we in this new generation seem to go in different mode, seem fashioned in different image, it was only because we are fashioned in the image of our time but are the direct descendants of that great ancestor who taught us and proclaimed for us the great prophecy of freedom. When I think of all that he meant to the young generation, when I think how we hung upon his words, and when I was older and there [illegible] as the generation younger than myself, all seated [illegible] he beach of Madras, crowded in huge rooms in [illegible] Bombay, Lahore, Lucknow and in your own [illegible] hanging upon the golden voice that shed golden [illegible] posterity. I thrill still, though I am past [illegible] and yet I remember with the same thrill I had [illegible] s 16, 20 or 26, those golden words, of golden flame which burnt our heart, never to perish.

SURENDRANATH'S DREAM.

We are the children of his dream; things of his vision. So let it not be felt by any that any generation can forget him. It is true that models change; fashions change in political expression, but the ideal remains immutable. What for the sixties, seventies, eighties or nineties of the last century seemed to be valid and legitimate fashion for those years might not be deemed sufficient and adequate mode of expression, perhaps in our time; but who will dare say in our time that our different mode and policy have a greater ideal than what he preached? He said, Dominion Status. We expanded the interpretation of the word to our modern needs. We say, Independence. Do you think that Surendranath

Banerjea who taught us to love freedom would have said: No, I refuse independence to my nation. He would have said: Be strong and create your own independence. Do not ask for it; do not take it from others; do not sell your birthright, but create your own freedom, your own unity, your own courage, your own knowledge and your own sacrifice. That was his great message to us.

We have been reminded that there was not one weapon in our modern armoury that has not been forged by him long ago. All the great and good things that we use to-day originally belong to his armoury, and all that he practised as one individual. He was the prophet of the practice of the whole generation to come. Let them not feel that there has been a break in the evolution from Surendranath Banerjea to Mahatma Gandhi. We are all his children and not the greatest of us will but feel proud to pay homage to the man who taught us what real nationalism is, not the narrow nationalism in isolation from the great countries on earth, not exclusion,—never but it is the patriotism of the great and the fearless that is what he created for India, to rise to the height of its own stature. He would not compromise with honour merely for the sake of passing fashion. He said: You create; do not imitate. You adopt; do not copy. You must not take wholesale from foreign countries; what is right you can take from countries,—you can take the ideal, but mould upon it in your own fashion, to your own needs and circumstances. That was the statesman.

IDEAL OF CONGRESS.

I would like to say this only: I am a servant of the Indian National Congress of which he was one of the great founders. The ideal of the National Congress has been the freedom of united India and my great and illustrious predecessors in the office of the Congress Presi-

dents laid down the ideal and tradition which every succeeding President has tried in his or in her own fashion to follow. Our interpretation may be individual, our exposition may be personal, but the spirit of the substance of all we had tried to do, which we may have failed in doing, but which certainly we shall succeed one day in achieving, has been laid down for us by the great and brave and self-sacrificing patriot who was our great fore-runner of freedom. Let us honour him and all the great compatriots. They were the fore-runners without whom we could not have existed. They were the great prophets who made prophecy that you and I have a duty and privilege to fulfil.

Every time men come from outside to Calcutta, they will see this domin[illegible] figure still presiding over the destiny of Bengal. And when you will walk morning, noon and evening, from this maidan you will see this figure and you will lift, not your head, but your heart in salutation, and say, " Hail Mother! Hail Son of the mighty Mother."

Manchester Speech of Surendranath Banerjea.

(REFERRED TO AT P. 266 IN HIS NATION IN MAKING AS GIVEN IN THE APPENDIX BUT NOT GIVEN.)

(Reproduced from 'India,' June 25th, 1909.)

My Lord Mayor, Ladies and Gentlemen, on behalf of my brother delegates, as well as on my behalf, I desire to thank you very heartily for the kind terms in which the toast has been proposed and the cordiality with which it has been accepted. From the moment we set foot here as the guests of the Committee of the Imperial Press Conference and in a wider sense of the British public, we have been overwhelmed with an effusion of kindness and hospitality which, so far as I am concerned, has produced an indelible impression on my mind. The cordiality of our reception , and that by all parties, irrespective of political differences, and the splendour of the hospitality which has been extended to us will be among our most grateful recollections. And, speaking as an Oriental, possessed of the warm susceptibilities of our race, I will say this: that, so far as I am concerned, these pleasing memories will endure so long as life endures. To one as an Indian delegate, a special measure of consideration has been shown, for which I am deeply grateful. May this feeling of personal kindness deepen into a widespread and enduring sentiment of sympathy for the great and ancient race to which I am so proud to belong, and whose destinies you now control. Speaking at Manchester, I permit myself to entertain this hope with some measure of confidence, for I remember that Manchester has always been the home of progressive ideas, that it is associated with the honoured names of Cobden and Bright, and that it is the cradle of that school of politicians whose principles may now be challenged, but whose achievements in the past cannot be questioned. For the last few days at

the sittings of our Conference we have been talking of the Empire and of Imperial considerations. No theme could be more appropriate for an Imperial Press Conference; and here let me press for the preferential treatment of the claims of my country; not indeed commercially, for Manchester would scout the idea, but in a political sense. For India, in the words of a late Viceroy, is the pivot of the Empire, and she is undoubtedly the brightest jewel in the Crown of England. May she long continue to be so, through the justice of British laws, the righteousness of British administration, the operation of that kindly and practical sympathy which more than laws and edicts bring the people nearer to their rulers and bind them both in the golden chains of an indissolube union. Great anticipations have been formed of our Imperial Conference by responsible persons; great results are expected to flow from its sittings. Whether these anticipations will be realised or not, it is impossible to say; for the future is in the lap of the gods, and I will not embark upon the venturesome task of unravelling its mysteries. But this I will say—and here I stand upon firmer ground, free from the perils and embarrassments of prophecies and even of intelligent anticipations that never was the sense of Imperial unity more forcibly demonstrated. It is a unity which extending from the heart of the Empire, embraces the most distant units of the Imperial system, and includes not only the self-governing states which have sprung from the loins of the present-country, but the remote dependencies which have not yet attained to that political status. In the orderings of Providence, for good or for evil—for good as I verily believe—the destinies of three hundred millions of my countrymen, not savages or barbarians, but the representatives of a great and ancient civilisation—have been entrusted to the care and keeping of the people of these islands. Never was a nobler trust or a more sacred function assigned to a great and Imperial race. God grant that this solemn

trust, this awful responsibility may be so discharged as to conduce to the permanent benefit of India and the lasting glory of England.

We have heard in these festive gatherings the strongest notes of loyalty struck by the delegates who have come from beyond the seas. Canada, Australia, New Zealand, the representatives sometimes of a culture and civilisation different from those of the Mother Country, have expressed their fervent devotion to the Empire and their unflinching determination to stand by the flag in the hour of emergency and danger. The history of these islands has been a history of great and unexampled prosperity and happiness; may it long continue to be so. For England has been the guide, the leader, the instructress of mankind in the difficult art of self-government. But should ever a crisis arise—I will not say disaster—I desire to say on behalf of my countrymen—and I am entitled to speak with authority in their name—that we in India will not be wanting in our duty by the Empire. An ounce of fact, they say, is worth a ton of theory; and let me here refer to an incident—not drawn from the domain of the imagination, or the debatable land which separates truth from fiction—which will strongly confirm the view I am endeavouring to put forward. There occurred in 1885 what is known as the Penjdeh incident. Penjdeh is a small town on the Afghan frontiers. There in 1885 a brush took place between an Afghan outpost and some Russian soldiers. The incident, trivial as it is, threatened to involve England and Russia into war. For some time the rumours of war were persistent. At this juncture, I will not call it a crisis, the Indian Press—that section of it which I have the honour to represent at this Conference—appealed to our countrymen to offer themselves as volunteers for the defence of their hearths and their homes. In response to this appeal five hundred young men of Calcutta, all of them in positions of respectability, some of them in positions of light and leading,

applied to the Government to be enlisted as volunteers. I myself was an applicant; and about that time, addressing a public meeting of my countrymen, I used language which I will, with your permission, reproduce now as illustrative of the sentiment which then prevailed amongst us. I said: "Let the Russians come, if they please. They will find behind the serried ranks of one of the finest armies in the world the multitudinous races and peoples of India, united as one man, resolved to die in the defence of their hearths and homes, and for the maintenance of the honour and dignity of the Empire." Such was the feeling in 1885; such would substantially be the feeling now if their was a repetition of the Penjdeh incident. But it will be said: "Oh, there are the Anarchists and there have been anarchical developments in Bengal." I desire to repeat what I have said more than once, here and in my own country—and I re-echo the sentiments of the vast majority of my countrymen—that we deplore these anarchical incidents and have condemned them with the utmost emphasis. The mind, the judgment, the conscience of the country are arrayed against them. I regard them as a passing phase of excitement which will disappear under the soothing effects of progressive and conciliatory measures.

May I pause for a moment to enquire into the secret of that wonderful loyalty and devotion of the Colonies to the Empire, which is one of the most pleasing features of the Imperial system? The secret is told in one word—it is self-government. Self-government is the cement of the Empire; it is not inconsistent with the paramountcy of British rule in India. On the contrary, in my opinion, and in that of my countrymen's, self-government will make that rule permanent—it will broad-base the Empire of the King on the gratitude, the contentment, and the affections of a vast and multitudinous people. India wants self-government suitable to the development of the ideals that have grown up under the fostering care of

the British people. That is our first and last request. And is there any Britisher, here or outside these walls—and in the term Britisher I include his kinsmen over the seas—who will not sympathise with an appeal which is in such entire consonance with his own instincts, with the justice of the case, with the orderings of Divine Providence, who has assigned to each nation in the grand and progressive evolution of affairs, the full, the free, the absolute, the unfettered control of its own destinies? India in the enjoyment of the blessing of self-government,—India prosperous, contented and happy—will be the most valuable asset of the Empire, the strongest bulwark of Imperial unity. And the Empire thus knit together upon the basis of common civic rights and obligations may bid defiance to the most powerful combination that may be formed against it, and may gaze with serenity and confidence upon the vicissitudes which, as all history tells us, have wrecked the fortunes of States and thrones which relied upon the security of physical force rather than upon the paramountcy of those moral laws which represent the index-finger of Divine Providence in the dispensation of human affairs.

Nativity of the Indian National Congress.*

SPIRITUAL AWAKENING PRECEDES POLITICAL.

To appreciate the national awakening in India one must look back to the movements that preceded the political awakening. It need hardly be said that such awakening is the result of the contact of the East and the West. It seems inscrutable, none-the-less it is a fact, such awakening, like the rising of the sun, first dawned in the deltaic plains of Bengal. Ram Mohan Roy may truly be said the father of the renaissance movement in India. Brahmin by birth, deeply versed in the eastern and western lore alike, he was the first amongst our country-men, to fight against the dark forces of prejudice and superstition, imbibe the spirit of modern civilization and foresee that to maintain our national existence we must beat back the inroads of a militant western civilization by its own weapons taking care at the same time not to be denationalized. It is not for me to recount his contributions to the spiritual, social and political uplift of India as they are too well-known. The spirit of reform or rather revolt against the existing order of things, initiated by him was taken up after him by Iswar Chandra Vidyasagar in the sphere of culture and social reform, by Maharsi Debendra Nath Tagore and Keshav Chandra Sen in the sphere of religion and by Surendra Nath Banerjea in the sphere of politics. We gathered our ideals and inspirations of life from such stalwarts, who may truly be called super-men. I did not know then of any such movements of national awakening outside Bengal. I shall now indicate how the nationalist movement that sprang up from the soil of Bengal gave birth to the Indian National Congress.

* [This was written by me for publication in the Congress Jubilee Numbers of the Calcutta Municipal Gazette at the request of its editor but unfortunately that number was not published. So I have thought fit to publish it as a historical sketch by way of a supplement to the Bengalee version of Nation in Making.—J. Chaudhuri].

THE IDEAL OF THE NATIONAL UNITY.

In our student days there was great ferment amongst our elders for founding an organisation of the educated middle class. The British Indian Association was an association of the bigger zemindars. The late Sisir Kumar Ghose, the distinguished editor of the *Amrita Bazar Patrika*, was for founding an Indian League. Surendranath Banerjea, who was then much younger, was for founding an Indian Association. His outlook from the very start of his political career was to found an All India Organisation of the educated middle class. In fact he opened a branch of the Indian Association in Lahore. He did not rest satisfied with the founding of such local associations. In the weekly addresses that he used to deliver to the Students' Association at the Albert Hall on Fridays, he used to exhort us on the supreme importance of Indian unity. He used to give us discourses on the life and work of Mazzini in promoting Italian unity that led to her political salvation. Both in his public addresses and his private conversation he used to tell us of his day dreams of seeing one day the sons of Aryabarta, the Punjabis, the Maharattas, the Madrasees, the Parsis, the Hindus, the Mahomedans, irrespective of caste, creed or religion, all gathered together on a common platform and participate in deliberations for the political emancipation of India. For the purpose he made periodical tours in different provinces of India. Although the ostensible purpose of such tours was some such timely topics as the recording of united protest against the reduction of age of the Indian Civil Service Examination for excluding Indian youths competing for it, yet he availed himself of the opportunity of delivering discourses on Indian unity, the replacement of bureaucratic rule of the Indian Civil Service by a representative form of government. He appealed in eloquent terms to all to forget the differences of caste, creed and religion and unite as children of our common mother-land and work together in a selfless man-

ner for the political salvation of India. It was he who raised the cry that "We are Indians first and Hindus and Moslems thereafter." His message of nationalism roused a wave of patriotism in the minds of his countrymen all over India.

THE INDIAN NATIONAL CONFERENCE OF 1883.

The soil being thus prepared, he decided to call a national conference for laying the foundation of an all India organisation. When he was is communication with some of the leading men of other provinces, he was committed to prison for contempt of Court by the Calcutta High Court for publication in the *Bengalee* newspaper, of which he was the editor, of a comment on the order of Mr. Justice Norris for the production of a Hindu idol in Court. This roused great indignation all over India and enhanced his popularity and influence immensely. On release from prison he resumed the work for calling an Indian National Conference at Calcutta during the Christmas holidays of 1883. The Conference met and was attended by many prominent men of other provinces as delegates.

Mr. Wilfred Blunt, a distinguished Englishman, who was present at the Conference, described it in his work "India and Ripon," as the "first stage towards a National Parliament," and recorded regarding Surendranath Banerjea's speech on the occasion as "quite as good a one as ever I heard in my life and entirely fell in with my views in the matter."

THE DEMANDS OF THE NATIONAL CONFERENCE.

The Conference for the first time in India made a public demand for

(1) Representative Legislature and Self-Government for India;

(2) For the spread of education;

(3) The separation of the Executive and Judicial functions in the administration of criminal justice;

(4) The wider employment of Indians in responsible positions in the public services.

THE INDIAN NATIONAL CONFERENCE OF 1885.

The Indian National Conference again met at Calcutta during Christmas in 1885. It was attended by delegates from different parts of India.

MESSAGE OF NATIONALISM CARRIED AMONGST THE MARTIAL RACES OF INDIA.

The nationalist movement inaugurated by Surendranath Banerjea, as it gathered strength and volume, it caused great flutter in bureaucratic official dovecots all over India. They twitted its supporters as the dupes of Bengali agitators and alleged that the movement would not find any support from the more sturdy and martial races of Upper India and the Punjab. Surendranath at once decided to explode this myth. He had then already come to be regarded as a tribune of the people through his previous political tours, his nationalist propaganda and his unique oratorical powers throughout the length and breadth of India. After the Indian National Conference of 1883, he decided to undertake a political tour amongst the martial races of Upper India during the ensuing summer and gather them round the Nationalist Camp. As he used to earn his living as a teacher and an educationalist, he undertook his tour in the middle of May which is the hottest part of the year even in Bengal when all the colleges and schools remained closed. In the gruelling summer heat of the Upper India and the Punjab he visited and addressed public meetings in the principal cities from Bankipur (Patna) up to Multan. His eloquent appeals for the political unity of all classes and races of the Indian people found unique patriotic response everywhere. The scheme of an all India political organisation was thus matured and consolidated.

NATIONALIST FEELING ROUSED DURING RIPON REGIME.

The chief event that absorbed public attention during 1884 was the giving of a fitting farewell to Lord Ripon for his sympathy with Indian aspirations, the introduction of local self-government and his attempt to do away with racial discrimination between Europeans and Indians in the administration of criminal justice. It is difficult to realize now the storm that was raised over the Ilbert Bill, especially by the non-official Europeans in India. The question of racial discrimination was also a sore point with Indians as well and Indian public opinion supported Lord Ripon's policy with no less zeal and unanimity. It was in reply to an attack by an Anglo-Indian leader that Lal Mohan Ghose made his memorable Dacca speech and rose to fame as an orator. Feelings between Europeans and Indians became so very strained that the European organs and organisations freely talked of rising in revolt in opposition to the measure. The European opposition triumphed and Lord Ripon's measure failed. This convinced the politically minded Indians all over the country of the supreme necessity of an all India organisation for the protection of their rights and liberties for their political advancement. In spite of Lord Ripon's defeat he gained immense popularity amongst Indians. So when his time for retirement from India arrived, the people of India decided to give him such a public farewell as has never been given to any Viceroy before or since.

The events I have narrated all contributed to the conception of the Indian National Congress and its birth in the year of grace 1885 during the auspicious days of nativity of the divine spirit who assumed human form for the deliverance of mankind from tyranny and all its incidental evils.

True it is that no Congress or Conference met during Christmas of 1884, but in the months preceding it, farewell demonstrations like that in Calcutta were made at

all other centres of light and leading all over India as a mark of appreciation by the people of the honest endeavour of a truly Christian Viceroy for the discharge of his duties in the best interest of the people.

NATIONAL DEMONSTRATION AND FLUTTER IN OFFICIAL DOVECOT.

The sum total of these simultaneous and wide-spread demonstrations in favour of the policy of justice and fair-play which was anathema to the Anglo-Indians, opened their eyes to this national upheaval and they gazed in amazement and groped in bewilderment to comprehend what it all meant. Sir Aucland Colvin, the then Finance Member of the Viceroy's Council, gave expression to this feeling of bewilderment amongst the official hierarchy, who lived in isolation and in blissful ignorance of the feelings, sentiments, the aims and aspirations of the people, in a pamphlet styled "If it be true what does it mean?" It meant the national awakening of the intelligentia all over India and the birth of the Congress in the following year.

LORD DUFFERIN AND DEMAND FOR REPRESENTATIVE LEGISLATURE.

It may not be out of place to mention here that on the Christmas Eve of 1884, a deputation of Bengal nationalists under the leadership of Surendranath Banerjea waited on Lord Dufferin who succeeded Lord Ripon and in an address to him repeated the demands for Representative Legislature for the Provinces.

Lord Dufferin was a great diplomat. Surendranath Banerjea was already well-known to him. He remembered him as the young man who had got out a mandamus from the King's Bench Division of the High Court of Judicature in England against the Civil Service Commissioners for restoring his name amongst successful candi-

dates for appointment in the Indian Civil Service. On coming out to India he must have been told of his chequered career since and that he was then a political fire-brand and the leader of the nationalist movement which, as Sir Aucland Colvin put it in the picturesque language of the scriptural text, had the effect that "The dry bones of the open valley had become instinct with life."

In 1885 Surendranath Banerjea was active in organising the Indian National Conference to meet again during the Christmas holidays of 1885. Although Surendra Nath Banerjea's ideal was to obtain self-government for India on the line of the free and democratic parliamentary institutions of Europe and America, especially of Great Britain and the Dominions, he was no demagogue. His ideal of a National Assembly or Parliament was that it should be representative of all classes, from the prince to the peasant. So in organising the Indian National Conference he approached and obtained the co-operation of the British Indian Association, which represented the landed aristrocracy in Bengal, the Indian Association, representative of the educated middle class and the Central Mahomedan Association, representative of the cultured Moslem community of which Mr. (later Rt. Ron'ble) Ameer Ali was secretary. The other presidencies and provinces were circularised to send delegates.

THE PROMOTERS OF THE FIRST SESSION OF THE INDIAN NATIONAL CONGRESS.

When his plan and scheme were mature he obtained a communication from the distinguished Bombay lawyer, Mr. Kasinath Trimbak Telang, who later on became a Judge of the Bombay High Court, for sending him an account of the Indian National Conference of 1883, as it was proposed to organise a meeting of the first Indian National Congress in Bombay during the Christmas

Holidays. Mr. W. C. Bonnerjee who was nominated to preside over the sittings of the Indian National Congress which was to meet in Bombay on the 28th of December, 1885, requested Surendra Nath Banerjea to attend the first meeting of the Congress. But as the meeting of the Indian National Conference had been fixed to meet at Calcutta on the 25th of December and as delegates from the different provinces including Bombay were also going to meet at the Conference, Surendra Nath Banerjea expressed his inability to attend the Congress which was meeting almost simultaneously.

I have heard it suggested in Congress circles in those days (but never by Surendra Nath Banerjea himself) that there had been some official wire-pulling at the inauguration of the Indian National Congress. Surendra Nath Banerjea in those days was regarded not only as a political fire-brand but in official circles as no better than a rebel. As I have already indicated, his political activities, his propaganda for national unity amongst the people of different races and creeds of India and demand for the free, representative and self-governing institutions of the West, was viewed with suspicion and alarm by the bureaucracy. So, it was said the high officials including the Viceroy were disposed to view with favour a national organisation founded and controlled by safer and more reliable leaders.

ALLEN HUME.

Mr. Allen Hume, a retired member of the Indian Civil Service, was really the founder of the Indian National Congress. He was a very sincere and well-wisher of India, and was quite in earnest for her political advancement. But he was a thorough constitutionalist and his ideal was to secure the political progress of India by criticism and representations to the Government of India and the British Parliament. He was the organising Secretary of the Indian National

Congress and received encouragement in his work from Lord Dufferin who was then the Governor-General of India.

W. C. BONNERJEE.

Mr. W. C. Bonnerjee was selected to preside over the first sittings of the Indian National Congress because he was the most distinguished Indian lawyer at the time and a Bengalee too. He commanded great respect both of the Bench and Bar and of the general public, both official and non-official. Even Lord Sinha, in the hey-day of his practice at the Bar, did not command the position that Mr. W. C. Bonnerjee once did. He was a man of commanding stature and of very dignified presence and impressive both in his speech and bearing. But great and distinguished, as he was, in the profession, he had hardly ever taken any part in public affairs of the country, much less in the political movements of the time. I may mention here what I had heard from political circles of those days in this connection. A vacancy in the Indian Legislative Council occurring during the Viceroyalty of Lord Ripon, Mr. W. C. Bonnerjee's name was suggested, but Lord Ripon remarked "he may be a great lawyer but he has no record in public life" and his name was passed over.

That Mr. W. C. Bonnerjee was selected to preside over the first sittings of the Indian National Congress in 1885, just a year after the retirement of Lord Ripon, lends some colour to what was talked about at the time, that the idea of the original founders of the Indian National Congress was that the Nationalist movement inaugurated in Bengal and which had gathered momentum during Lord Ripon's Viceroyalty, should be put under the control and guidance of a safe and sober man of light and leading.

THE OBJECTS OF THE INDIAN NATIONAL CONGRESS.

The objects of the founders of the Indian National Congress of 1885 were much more limited than those of the Indian National Conference that met at Calcutta in 1883 and 1885. They were explained by the President to be:—

(1) to promote friendly feeling amongst co-workers in the country's cause in the Empire:

(2) to remove racial, provincial and religious prejudices amongst our country-men and consolidate the spirit of national unity made manifest during the regime of Lord Ripon's Viceroyalty:

(3) to record the considered opinion of the educated classes on the more important social questions:

(4) to determine the line and methods by which it is desirable for Indian politicians to work in public interest in the ensuing year.

It may be said the outlook of the first Congress was much more social than political.

THE INDIAN NATIONAL CONFERENCE OF 1885.

The Indian National Conference of 1885 met at Calcutta during Christmas in 1885. It was attended by delegates from different parts of India including Bombay, which was represented by the Hon'ble Mr. V. Mandalik, then a member of Indian Legislative Council. It reiterated its demands of the previous conference including that for self-government and Representative Legislature.

THE CALCUTTA SESSION OF THE INDIAN NATIONAL CONGRESS OF 1886.

The next session of the Congress was fixed to be held in Calcutta. With Surendra Nath Banerjea, the country's interest was always supreme and nothing was more repugnant to him than to create any division in our national camp. He at once accepted the call of the Congress, joined it and decided to merge with it his scheme of Indian National Conference and worked whole-heartedly to make the Calcutta Session of the Congress a success. Surendra Nath Banerjea was a people's man and in questions affecting the interest of the land-holders and raiyats (tenants) his sympathies were with the latter. But as a leader of nationalist movement he used to say that such difference of opinion in matters of detail should never stand in the way of promoting national unity amongst all classes and sections of the people for securing our political emancipation. His view was that when we get our self-governing representative legislatures, we might promote further or guard people's interest by legislation, but we must first of all sink our differences and act together, in disregard of our class or sectional interest and it is by team-work alone that we can reach our goal.

RAJAH RAJENDRA LAL MITRA AS CHAIRMAN OF THE RECEPTION COMMITTEE.

So Surendra Nath Banerjea approached and appealed to all the men of light and leading, the young and the old, the rich and the poor, to join hands in making the Calcutta Session of the Congress a phenomenal success. The educated middle class enthusiastically responded to the call. The British Indian Association representing the big land-holders of Bengal no less warmly promised co-operation. Surendra Nath Banerjea was always averse to pushing himself to the front as an office-bearer

to any public organisation. He as a rule, preferred to put men of light and leading in prominent positions and do them the honour that was their due. He got Rajah Rajendra Lal Mitra, the great archeologist and savant, elected as Chairman of the Reception Committee. Rajendra Lal Mitra by his researches and as a scholar had acquired a world-wide reputation. He was a commoner, a self-made man, independent and public-spirited. The title of Raja was conferred on him as a personal distinction. But it made no difference to him as by his intellectual eminence he was more than a prince amongst men. He was a fine speaker and a brilliant writer. He used to take an active interest in public affairs. He was the friend, philosopher and guide of Kristo Das Pal, the Secretary of the British Indian Association, and the leader of the landed aristrocracy and veteran editor of the *Hindu Patriot.* Rajendra Lal often contributed to the editorial columns of this paper. He was a member of the Calcutta Corporation and though advanced in years he warmly sympathised with the nationalist movement.

In his speech as Chairman of the Reception Committee, he gave expression to the public sentiment that was uppermost in everybody's mind. He said that it had been the dream of his life that the scattered units of the race would some day coalesce, that instead of living merely as individuals, the people might so combine as to be able to live as a nation.

So was the foundation of the Indian National Congress well and truly laid as the premier political and nationalist organisation of India.

ALL COMMUNITIES COMBINE AND CO-OPERATE AND CONGRESS BECOMES A TRULY NATIONAL ORGANISATION.

The motion for the election of the President of the Congress was very appropriately moved by Babu Joy

Krishna Mukherjee, the 79 years old Nestor of the Bengal land-holders. The young and the old, and the rich and the poor thus fraternised together in their thousands for the fitting celebration of the birth and baptism of our new national life.

Dadabhai Naoroji who presided over the Congress, needed no introduction as he was even then on the front rank of Indian public men. He was a distinguished educationalist who by his scholarship and original researches in the field of Indian economics had already risen to great fame.

SURENDRA NATH BANERJEA AS SPONSOR OF THE CONGRESS.

As regards Surendra Nath Banerjea, I have already said, he was very unassuming and simple in his manners and bearing and preferred always to push people of light and leading or talent in positions of prominence rather than himself. But the rare gift of eloquence and the power of moving the human heart and of rousing human enthusiasm that he possessed made him the centre of attraction and the apple of the people's eyes and from then and for the next thirty years, he came to be regarded as the very life and soul of the Congress. His watch-word during this period and after was, Indian unity and the outlook all through his long political career was the welding of the Indian people into one nation and lead them on to *Swaraj*, which was one of the last gifts to this great city of his birth, the sphere of his devoted service to its civic welfare and the centre of his life-long activities in the cause of Indian Nationalism.

As a chronicler of the nativity of the Congress, it will be foreign to my present theme to make any comparison between the earlier and later activities of the Congress. I may, however, say here that if I have recorded the birth and growth of nationalism in India round

the personality of Surendra Nath Banerjea as its sponsor, it is because it is a historical fact within my personal recollection and that of some of my senior and more worthy co-workers in our country's cause, like Krishna Kumar Mitter and others who were still alive. when this was written.

DECLINE AND FALL OF BENGAL LEAD IN THE CONGRESS.

Bengal has now fallen on evil days and evil tongues. I am talking of times when Bengal was the queen amongst Indian provinces. When Iswar Chandra Vidyasagar, Keshab Chandra Sen, Ram Krishna Paramhansa, Rajendra Lal Mitra, Surendra Nath Banerjea kept burning the torch of enlightenment lit by the immortal Ram Mohan Roy, the spiritual father of modern India. I often wonder how it was that Bengal produced in the course of one generation such a galaxy of orators such as Keshab Chandra Sen, Protap Chandra Mazumdar, Surendra Nath Banerjea, Lal Mohan Ghose, Kali Charan Banerjea and Bepin Chandra Pal. Any country would have been proud of possessing a couple of such eloquent exponents of her spiritual and national aspirations. I account for this unique phenomenon to the spiritual and cultural forces of the time that enabled these gifted men to rise above the petty hum drum of life and sore to the serene heights of idealism in their respective spheres. When people engage in petty personal quarrels they cannot possibly work for the high ideals of national unity on which superstructure of the Indian National Congress was raised fifty years ago. With the passing away of our leaders of old, the Congress lead is dead, at any rate in Bengal. May the Congress live long and we as a people unite and march on to our common national goal.

Tilak and Surendranath.

TILAK AT THE SIXTH SESSION OF THE INDIAN NATIONAL CONGRESS.

It was at the sixth session of the Indian National Congress, held in 1890 at the Tivoli Gardens (Ballygunge) Calcutta, that I first saw Bal Gangadhar Tilak. I prefer to call all really great men by their common names which are household words to their country-men. At that time I knew little about him. I had then just come out of college and attended the Congress as a helping hand to our late leader Surendranath Banerji and not as a delegate. Amongst the thousands of people assembled at that Congress it was Tilak who made a profound impression on my mind. When he got up to speak I saw a bright light beaming from his eyes which showed the fire of patriotism that burnt within his soul. I do not remember the speech at this distance of time. But I remember a sentence that made such an indelible impression on my mind that, whenever I have thought of him later on, it has been the one thing that has risen uppermost in my mind. I have regarded it as the key-note of his political career. Referring, I believe, to the capacity of the Indian people to defend and govern their own country, he said, "Remember, that it was not so very long ago that we planted our banner at Attak." Although I am not a Mahratta, I often recall to mind the glories of the Maharashtra history and in moments of despondency, persuade myself to believe, that split up though we are at present, some day we shall be able to sink our sectarian, communal, and party differences and unite and organise ourselves on the broad, democratic basis of an Indian Nationality and thus found a great Commonwealth of India. Tilak was too cultured and sensible to dream of a restoration of the

Mahratta Empire, but in common with us believed that it is the inherent birth-right of every people to organise and carry on the government of their own country.

When I first saw him, he was in the prime of his life and I was struck by his impressive personality. He was dark for a Mahratta, had an Aryan nose and very remarkable and brilliant eyes. The dark-red turban that he used to wear, set off his complexion admirably. He was not an orator. He had a rather husky voice which he could not raise to a very high pitch. But he spoke very impressively. He expressed himself in plain and simple words and although his language had no literary flavour about it, he spoke always very forcibly and effectively. It was his earnestness and plain talk that always carried the audience with him.

POONA CONGRESS.

After the Calcutta Congress I heard nothing more about him for some years, because of my absence in England. After my return, I went to Poona to attend the Indian National Congress in December 1895. At that time there was no party feeling in Bengal. Surendranath Banerji, the President-Elect, was then at the height of his popularity. He was looked upon, not only in Bengal but throughout India, as the People's Tribune. There was a very large and distinguished gathering at Poona. The merchant princes of Bombay, the Deccan Sirdars, and eminent leaders from every province were there. I have attended most of the Congress sittings since then, but I have never seen before or since such an impressive sight as was presented by the gathering at the Poona Congress pandal. The variegated turbans of the Deccan delegates differing in shape, colour and size according to rank, caste, position and occupation and the no less impressive headgear of delegates from North, West and Central India, made the assembly look rarely artistic and pic-

turesque. I imagine that the assembly at Rajasuya Jajna must have been something like it.

When the Congress commenced its sittings, one general regret amongst the delegates was that Tilak was not there. We understood that some differences had arisen between the Congress Committee and Tilak and his followers. But on enquiry we learnt that Tilak with all his differences with the local Congress Committee, not only would not hamper the Congress work but actually lent all his moral support for the success of the Congress sitting. So far as I can recollect, Tilak entered the Congress pandal, after the President of the Reception Committee had finished his speech and received a tremendous ovation from the assembled delegates. Then followed the Presidential address. It took Surendranath Banerji four hours and a half to deliver but he never referred to the printed copy of his speech, never faltered, halted or dropped a single syllable. Indeed those who listened to him, thought that he was delivering the whole speech *ex tempore.* I mention this fact because Tilak, though not an orator, had a wealth of intellect which was perhaps, even more marvellous and to which I shall refer later on.

TILAK'S FIRST SEDITION TRIAL IN BOMBAY.

In 1897 I had occasion to come to know Tilak more intimately and take a true measure of his great ability and character. The occasion was his prosecution for sedition by the Government of Bombay for a poem published in the *Kesari* newspaper. Prosecution for sedition in those days was rare. Prosecution of such an eminent leader of public opinion like Mr. Tilak, for sedition, shocked the whole of India.

INDIGNATION IN BENGAL.

In Bengal it roused great indignation. We took counsel of our leaders, and it was decided that we should raise the necessary funds and engage some eminent counsel

from the Calcutta Bar to defend Mr. Tilak in Bombay. The Calcutta Bar had then the reputation of being the ablest and the most independent Bar in the whole of India. A committee was formed composed of some patriotic gentlemen and they paid very handsome contributions to the Tilak Defence Fund. But since the most important part of the work was to engage one or more eminent counsel, it was largely composed of lawyers and amongst them the names of the late Sir Ashutosh Chaudhari, then a rising junior at the Bar, the late Mr. Bhupendranath Basu and Mr. Hirendranath Datt, deserve special mention. We decided to engage Mr. William Jackson, nicknamed Tiger Jackson, because he was a terror to prevaricating witnesses, magistrates and judges with executive leanings. The trial was to take place in September when the Calcutta High Court would be closed for long vacation and Mr. Jackson was unwilling to accept any engagement during the vacation. All possible pressure was put upon him but to no purpose. At last we approached Surendranath Banerji to get Babu Ganesh Chandra Chunder, the then leading Indian Solicitor, who had great influence on Mr. Jackson, to induce him to take up Tilak's defence. But Mr. Jackson, once he had made up his mind, would not change it. In vacation time it is difficult to get leading counsel to accept engagements. But Mr. L. P. Pugh and Mr. William Garth were then to leave for England *via* Bombay and we persuaded them to take up Tilak's defence on their way home. Messrs. Bhaishankar and Kanga were Mr. Tilak's Bombay Solicitors. Mr. Bhupendranath Basu and Mr. Hirendranath Dutt, Calcutta Solicitors, were in communication with the Bombay Solicitors. The Calcutta Solicitors after engaging Mr. Pugh and Mr. Garth, undertook to pay them their fees. It must be said to their credit that these leading members of the Calcutta Bar did not make any bargain with us about their fees and in accordance with the best traditions of the Bar, left it entirely to us to pay them

any honorarium we pleased. I believe that at the conclusion of the case we paid Rs. 10,000|- to Mr. Pugh and Rs. 5,000|- to Mr. Garth.

As Mr. Pugh and Mr. Garth were both strangers to the Bombay Solicitors and to Mr. Tilak and his friends, I was asked by Mr. B. N. Basu and Mr. H. N. Datt at about 2 P. M. on the day that they were to start for Bombay to accompany them as their junior for helping them and also for carrying on communications with the Calcutta Solicitors and the Tilak Defence Committee. The Bombay Plague scare was then in full swing in Calcutta. But we left cheerfully at the call of our self-imposed duty.

PERMISSION TO SOME COUNSEL TO DEFEND TILAK, REFUSED.

On arrival at Bombay we were told by Mr. Tilak's Solicitors that we should have to apply to the High Court of Bombay for permission to appear. We did so. Permisssion was given only to Mr. Pugh to appear and refused even to Mr. (afterwards Sir William) Garth. The reason assigned was that Mr. Pugh was senior in standing to any other member then available at the Bombay Bar. but as there were many barristers of Mr. Garth's and my standing in Bombay, who might preferably be engaged, we were refused permission. I might observe that such denial of courtesy to members of the English Bar who had moreover been professionally engaged and gone all the way from Calcutta was most extra-ordinary. Such permission had never been refused to Barristers of other High Courts coming to Calcutta by the Calcutta High Court, no matter whether they were juniors or seniors to the members of the local Bar. Mr. Garth was a most powerful cross-examiner. Our plan was that Mr. Pugh would deal with the law, and address the Court and Mr. Garth would concern himself with the witnesses. This plan fell through for the reason stated above.

UNROBING OF CALCUTTA COUNSEL IN COURT.

Mr. Tilak's solicitors engaged Mr. Davar (afterwards a Judge, who convicted Mr. Tilak at a subsequent trial), as Mr. Pugh's junior. We were, however, allowed to sit next to Mr. Pugh for taking notes and instructing him when necessary. When Mr. Garth and myself took our seats at the opening of the trial in our professional robes, we were subjected to a further indignity at the instance of a member of the Bombay Bar. Attention of Mr. Justice Strachey was drawn by him to our sitting at the Bar in our robes and his Lordship was asked whether we were entitled to sit at the Bar with our robes on, when we had been refused permission to appear and Mr. Justice Strachey asked us to take off our robes. Some one from behind helped me in unrobing and I never saw the sight of my gown again. Mr. Garth had also to unrobe, but he put his gown in his bag.

CONSULTATION WITH MR. TILAK.

Before the trial commenced, we had long consultations with Mr. Tilak. At these consultations Mr. Pugh, Mr. Garth, myself, Mr. Tilak and his solicitors were present. Mr. Pugh and Mr. Garth were greatly impressed with the great ability, keenness of intellect, strong common sense, spirit of independence, and the remarkable knowledge of law that Tilak displayed in course of the consultation. They were at once convinced that their client was no ordinary man. Cultured Englishmen always admire a man when they find elements of greatness in him, although they may not always fall in with his views.

One of their questions to Mr. Tilak and the answer that he gave them, are still fresh in my memory. His counsel asked him "Surely, Mr. Tilak, you desire Self-government for India and not absolute independence." Tilak laughed, as he often did when any awkward question was put to him, and answered, "Desire for indepen-

dence on the part of a subject people is nothing dishonourable and is no crime." He quoted from memory some passages from some English writers as also legal dicta in support of his views. Then he laughed again and told his counsel that they might take it that Self-government for India was his present political aim and absolute independence was then beyond the range of practical politics.

HIS VIEWS ON SOCIAL QUESTIONS.

Apart from these formal consultations, I used to meet him sometimes in the mornings and evenings in Daji Abaji Khare's house. He was a great friend of Tilak's and although formally he did not take any part in our consultations, or at the trial, yet he discussed the case with Tilak and me and gave us advice. When discussing the case in Mr. Khare's house, I found Mr. Tilak always very cheerful and we very often freely and frankly exchanged our views about social and political questions generally. I shall mention one instance when I drew out from him his social views. Mr. Khare suggested to me one day that we two should dine one evening at the Victoria Terminus railway restaurant, which had then the reputation of serving excellent dinners. When we made this engagement at Mr. Khare's house, I knew that Mr. Tilak would not join us but just for the fun of it, I told him that I would order vegetarian dishes and he might join us at the dinner. He laughed the proposal out, as I well knew he would. Then somewhat seriously I asked him, "Surely, Mr. Tilak, a cultured man like you, does not think there is anything wrong in taking food cooked by non-Brahmans or non-Hindus in a clean and sanitary manner?" He too replied rather seriously, "No, but you see my work is amongst the people of Maharashtra; I must respect their prejudices and try to make the humblest of them feel that I am one of them. If I adopt the heterodox ways, I would not be in a position to in-

fluence them to the same extent as I could do by keeping to my orthodox ways." I thoroughly appreciated his point of view and was convinced that at heart he was free from petty prejudices regarding "untouchability" which we had largely got rid of in Bengal.

In one matter, however, he scored over me. While discussing social questions, Mr. Khare asked me whether our ladies did not observe *purda* in Bengal. I replied that the orthodox people did, in big towns, but in the mofussil, especially, the villages, the system was not very strict. I admitted that in the Maharashtra country the women were much freer and Mr. Tilak seemed to be pleased at my candid confession and laughed as usual. It also gave him great pleasure to discuss with me the *Swadeshi* movement as a means of encouraging patriotic spirit and at the same time promoting industrial development amongst the people at large, in which I was greatly interested.

TILAK'S TRIAL AND THE BOMBAY PUBLIC.

I must say that I was rather disappointed to find that the Bombay public and the local political leaders of the day did not take the same interest that we did in Bengal in Tilak's Sedition trial. I saw Mr. Wachha (now Sir Dinshaw) with a letter from Surendranath Banerji, but Mr. Wachha told me that some Bhatia friend of Mr. Tilak was helping him in his defence and that it was very patriotic of us to come to his help, but that no public body in Bombay was taking much interest in the trial. It seemed to me that the Congress party in Bombay as in Poona belonged to a different camp from that of Mr. Tilak and his party. Mr. Tilak was then regarded as an extremist although the term "moderate" had not then come into common use. The two terms were popularised by Anglo-Indian journalists later on for encouraging dissension amongst us. At the commencement of the trial I was very disappointed to find that there was no

large crowd present outside the Court and the Court-room also was not over-crowded. There was besides, a nervousness that supporters of Mr. Tilak might get into the bad books of the police. Some members of the Detective Staff did me the honour of calling on me at the Watson's Hotel, but I told them that the company of criminals would be more congenial to them and that I did not consider them to be suitable company for me.

THE TRIAL.

At the trial our case was that the vernacular poem and other writings published in the *Kesari* taken as a whole, would not support any charge of sedition against Tilak and that a systematic campaign had been carried on against Mr. Tilak by the bureaucracy and particularly in the columns of the *Times of India*, because Mr. Tilak's political views and political activities were unpalatable to them. In support of our view the attacks on Mr. Tilak in the columns of the *Times of India* and Mr. Tilak's rejoinder to them, were read before the Court and copies of the *Times of India* containing the attacks, were put in. I do not know what impression Tilak's rejoinders made on Mr. Justice Strachey. Evidently not a very favourable one, judging from the result of the trial. But I know this much that both Mr. Pugh and Mr. (afterwards Sir William) Garth expressed great admiration for Tilak's command over the English language, and the close and logical reasoning by which he controverted the charges brought against him and his political activities. Mr. Garth was a Conservative in politics, and his interest in other things seldom went beyond his profession and horses. Yet he got so enthusiastic over Mr. Tilak's correspondence in the columns of the *Times of India* that he obtained some extra copies for taking them home so that he might show them to his father, Sir Richard Garth, the ex-Chief Justice of the Calcutta High Court. He told me several times that he might not agree with Tilak's

politics but there was no question that he was a very remarkable man.

ABSENCE OF AFFECTION FOR GOVERNMENT, IS SEDITION.

The result of the trial is well-known. The interpretation put on the word "disaffection" by Mr. Justice Strachey as "absence of affection" towards government which according to the learned Judge, would amount to sedition, became at the time a laughing-stock amongst the leaders of the Calcutta Bar, including Sir Charles Paul, the then Advocate-General of Bengal. On my return to Calcutta after the trial, Mr. William Jackson for sometime used to chaff me about the Bombay canons of interpretation and ask me why I did not ask my leader to tell the Bombay Judge that "distension" might as well mean "absence of tension."

The Bombay Jury did not strike me as particularly intelligent or independent. Following the interpretation of the law, given to them by Mr. Justice Strachey they, by a majority of six to three, returned verdict of guilt against Tilak and the Judge convicted him. Mr. Tilak received the verdict and sentence smilingly.

AFTER THE TRIAL.

After the trial we decided that we should move the Bombay High Court for leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council. It was arranged with Mr. Pugh and Mr. Garth that I, in company with the solicitors of Mr. Tilak, would see them with a transcript of the Judge's charge at the Byculla Club at about 9 A. M. next day and then the petition for leave would be drawn up in consultation. It was also arranged that as Mr. Tilak might have some instructions to give, a messenger should see him in the morning and bring his suggestions to the club. On arrival at the club we sat down for reading the transcript of the Judge's charge to the Jury

and before we had finished it, the messenger from Mr. Tilak arrived with a bundle of papers with a lot of writing on the sheets in pencil. After we had finished reading the Judge's charge, Mr. Pugh opened the bundle of papers that had been sent by Mr. Tilak from jail. Mr. Garth and I who were seated on either side of Mr. Pugh, to our unspeakable surprise, found that it was a draft of the petition for leave to appeal to the Privy Council that we had met to draw up. Mr. Pugh with great delight went through it from top to bottom, handed it over to Garth and said that we could not possibly have done it better. Both Mr. Pugh and Mr. Garth said that they could put it in form and settle it by tinkering with it here and there but could not possibly add to or improve upon it. Their appreciation of Tilak's ability and intellect, which was already very high, now matured into great admiration and they said that during their professional experience, they had not come across any layman or even a lawyer who could draw up a petition of appeal so accurately and exhaustively after having only heard a charge or judgment delivered by the Judge in Court and without reference to any notes. Such a man was Tilak.

TILAK AND SURENDRANATH, THE TWO NATIONALIST LEADERS, HOW THEY HAD DIFFERED TO AGREE?

I have, during my long public life, known only one other man who could approach Mr. Tilak in such wonderful feats of intellect and who was no less an earnest patriot and indefatigable worker. It was his contemporary and co-worker in the same field, Surendranath Banerji. I have already referred to the Presidential speech at the Poona Congress which covered 90 pages in print and which he delivered *extempore* without dropping a single syllable and that without any reference to notes. That was in the prime of his life. Another feat of his, akin to that of Tilak, was the speech that he delivered in introducing into the Bengal Council the Calcutta Municipal

Act by which he gave *Swaraj* to the Calcutta Corporation and the citizens of Calcutta. He was then about 75 years of age, feeble in health and of failing eye-sight with cataract in both eyes. He got up, introduced a Bill of 558 clauses in Council in a speech extending over an hour in which he referred to and quoted the material provisions and clauses without reference to a single scrap of paper.

I look upon Surendranath and Tilak as the makers of modern India. In ability, courage, strength of character and conviction, energy, devotion, capacity for work, steadfastness to the missions of their long and dedicated lives, they were unrivalled amongst their contemporaries in the political field of India.

TEMPERAMENTAL AND CULTURAL DIFFERENCE BETWEEN THE TWO LEADERS.

Surendranath and Tilak were temperamentally somewhat different and that was due to their respective types of culture. Surendranath from his early life, both by education and environment, acquired more of the spirit and idealism of the West. The freedom movement in our spiritual, social, intellectual and even political life which was inaugurated by Rammohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Ram Gopal Ghose—an intrepid public leader, Harish Chandra Mukherjee—the fearless editor of the *Hindu Patriot* during the Sepoy Mutiny, Rajendra Lal Mitra—the great savant, archaeologist and leader-writer in the *Hindu Patriot* and Keshab Chandra Sen had influenced him more powerfully than the oriental spirit. During his student days in England, the liberty movement in Italy and Austro-Hungary and the political careers of Mazzini, Kossuth and Garibaldi, idolised as they then were in England, had profoundly influenced him and made him dream of a free, self-governing and democratic India. So his ideals about the future of his motherland

were, cast on the European model of the last century. It is no wonder, therefore, that all through his political career his ideal was to secure for India the Parliamentary Constitution of England which was considered to be a model for the world and under which a British citizen enjoyed the inestimable boon of personal liberty and freedom.

Tilak on the other hand, was born a Mahratta and he could not possibly forget that all India had been brought under the sway of the Mahratta but a few generations ago. Soldiers and statesmen of his own race had ruled all India which, in the chequered chronicles of Indian history, seemed only to be events of yesterday. He would not be human, if he could forget so soon the part that had been played by his own people and their achievements in recent Indian history. Tilak did not certainly dream of any restoration of the Maharashtra Empire; but remembering the Mahratta rule, he believed that the Indian people were surely capable of assuming the responsibilities of governing and defending their own country, provided they were given or could obtain suitable opportunities. He did not care much for the form of the constitution but believed that as opportunities presented themselves, Indians would unquestionably prove equal to the task of managing their own affairs and develop a constitution that would suit the requirements of the country.

With all their temperamental differences, Tilak and Surendranath were both idealists, but with all their idealism, both were hard-headed men of strong commonsense.

WORKING OF REFORMS.

In one matter they were both agreed and that was that whenever any concessions were made by Government or powers were ceded to the people of the country,

they should take the full advantage of them and make the best use of their opportunities. They were both for working the Reforms for what they were worth. They, like soldiers, would not cede an inch of ground that they had gained by fighting, but would stand to the ground and make a determined effort to make further advance and thus lead their people and cause to victory. They were not vain enough, as Surendranath's Poona Congress speech would show, to believe that they would be able to achieve victory in their life-time, but they persisted in their campaign and died at their posts after a life-long fight in the country's cause in the faith and expectation that their people would be able to follow up their life-work to victory.

PARTIALITY FOR PRACTICAL PROGRAMME.

Both of them were intensely nationalistic but both were equally free from all kinds of fad. They never gave themselves any airs or posed as very superior persons. The ordinary man in the street felt quite at home with them. They never placed before their people any impracticable programme. Idealists though they were, they were no less of rationalists and they looked hard facts boldly in the face and tried to combat them to the best of their ability. They always relied more on practical methods for overcoming obstacles than on mere pious sentiments.

PASSIVE RESISTANCE.

This is why they did not hesitate to resort to passive resistance when other methods had failed, and there was occasion for it. The Boycott movement in Bengal during the Partition which arose out of the *Swadeshi* movement, of which Mr. Tilak was such a warm advocate, is an instance in point. Surendranath Banerji threw himself heart and soul into it so far as it was rational and practical. The other Congress leaders hummed and hawed

about it. Mr. Tilak, however, came over to Bengal and lent his warm support to the movement. There were people then too who spared no pains to divide us into two rival camps. But Surendranath presided over a mass meeting held in an open field near the Vidyasagar College, and convened for Tilak to express his views on *Swadeshi* and Boycott, and thus the sinister attempt was frustrated.

SURAT FIASCO.

I was present at the Surat Congress and I can speak from personal knowledge that Tilak was no more personally responsible for its break-up than Mr. Khaparde was for the fiinging of the Mahratta slipper at the president, of which he was talked about at the time as the reputed owner.

It will serve no useful purpose to dwell on the controversy now dead and buried.

COMMUNAL QUESTION.

I shall conclude by referring to Tilak's views on the Hindu-Mahomedan question. I have said before that his work was chiefly amongst the Mahratta Hindus. He, therefore, seldom turned his attention to communal questions which are, besides, chiefly of later growth. As it was the educated Hindus who took a genuine interest in the political future of India, he assumed that when the Mahomedans took an identical interest in politics, they would have to march hand in hand with the former. Would the Mahomedans fall in with the Hindus in this march readily? Tilak believed that if Hindus went on organising themselves into a powerful party exerting itself ceaselessly for the country's freedom, Mahomedans, when they too had advanced to the nationalistic ideas, would naturally see the advantage of uniting their forces with the Hindus and work in concert.

Communalism was incompatible with nationalism. Surendranath Banerji, always firmly adhering to this faith, was over-solicitous of infusing a spirit of nationalism amongst the Mahomedans. He was never tired of reminding them of the famous saying of Sir Syed Ahmed, "We are Indians first and Hindus or Mahomedans afterwards." During the anti-Partition agitation in Bengal a large number of cultured and broad-minded Mahomedans were his devoted colleagues and co-workers. Although Bengal had been partitioned with the avowed object of making Eastern Bengal and Assam a Mahomedan Province, yet hardly any Mahomedan leader of education, culture or wealth, barring a few who expected to derive immediate benefit from it, made common cause with Government and opposed us actively. As for the Mahomedan masses, except in places where they were incited by interested leaders, they were favourably disposed towards the *Swadeshi* movement which put money into the pockets of Mahomedan weavers and other artisans and operatives. Communal riots were then few and far between and wherever they occurred, were the result of direct incitement by interested persons. In short, the communal feeling was by no means, so common or bitter at that time, although the local Government had declared the Mahomedans to be the favoured class and the Partition had been avowedly effected in their interest.

But the bitterness of communal feeling between Hindus and Mahomedans has cast a gloom over the political future of India. It is said to be the outcome of the Montagu-Chelmsford Reforms. But those who maintain this view, do so with a purpose that no further substantial instalments of Reforms might be granted to India.

But a little reflection will remind us that this communal strife is a legacy of the Great War. Mahomedan feelings in India were embittered by the European peace treaties and mandates affecting Moslem countries. The

Khilafat movement was a direct outcome of that bitterness. Had we been satisfied with expressing our sympathy with our Mahomedan fellow-subjects, as our old Congress leader did, everything would have gone on as before.

Our new leaders however, made a very serious mistake in exploiting the Khilafat movement for political purposes. Neither Tilak nor Surendranath viewed with equanimity any propagandist movement which was bound to fan into flame the ex-territorial patriotism amongst our Mahomedan fellow-countrymen. They held themselves aloof. They knew that once such anti-nationalist sentiments are roused, communal bitterness is bound to enter into every sphere and phase of our public and private life.

Others thought differently. They sowed the wind and are now reaping the whirlwind.

I am not a pessimist. Men and their leaders are apt to make mistakes. We suffer for a time for our mistakes. But it is the error of our ways that always points to the right path. I believe with our leaders, who are no more, that after the bitter experience of communal strife and our internal dissensions, we shall before long come to our senses and close our ranks. When we have thus succeeded in restoring unity in the country, *Swarajya* will be ours without our begging or even asking for it.